তিন কুড়ি দশ

প্রথম চব্বিশ বছর

১৯১৭-৪০

অশোক মিত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

আমার নাতনী অম্বার জন্যে

মুখবন্ধ

আত্মজীবনীর এই প্রথম পর্ব শুরু করার আগে বায়রনের ডন জুয়ানের লাইন দুটি বারবার মনে পড়ছিল :

সত্যি কথা বলতে, কোন সংকল্পই আগে থেকে করিনি,
শুধু মুহূর্তকাল মস্করা করাই ছিল উদ্দেশ্য।

আমি লিখতে চেয়েছিলুম বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি শিশু এই শতাব্দীর বিশের দশকে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় কীভাবে শৈশব ও কৈশোরের স্বাদ পেয়ে, ত্রিশের দশকে যৌবনে পা দিয়ে, কলকাতা মহানগরীতে এসে, আজকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির আওতায় বড় হয়ে, অবশেষে ১৯৪০ সালে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আশা করি পাঠক এই বিবরণীতে বিশ ও ত্রিশ দশকে উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতার, কিশোর ও যুবকের চোখে দেখা, প্রাকৃতিক, নাগরিক ও সাংস্কৃতিক ভূগোলের একটি সংক্ষিপ্ত মানচিত্র পাবেন।

এই আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পর্ব আমাদের নিয়ে যাবে ১৯৪০ থেকে ১৯৫৫ সালের শেষ পর্যন্ত। আজকের দিনে মানুষের স্মৃতিতে আই-সি-এসরা অতীত কালের লুপ্ত জীবের সামিল হতে চলেছেন। ১৯৪০ সালে মোটামুটি এক হাজার আই-সি-এস এখনকার ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ, সাধারণ ভাষায় যাকে বলে, 'চালাতেন'। তার মধ্যে প্রায় চারশ' জন ছিলেন ভারতীয়। অন্য দুর্নাম যাই থাক, একটি সুনাম ছিল, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র বলে। একদিকে সরকারের শাসননীতি পদ্ধতির প্রতি আনুগত্যের গ্লানি, অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ ও আশা, বৃটিশ, ভারতীয় নির্বিশেষে এই দোটানা তাঁদের অনেকের মনে কী ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতো, সে-বিষয়ে সাধারণের সুস্পষ্ট ধারণা থাকার কথা নয়। বিশেষত, ভারতীয় আই-সি-এসদের রচনায় দৃষ্টান্তসহ এই দ্বন্দ্বের বর্ণনা বা আলোচনা যখন বেশী নেই। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে অবিভক্ত বঙ্গদেশে আর পশ্চিমবঙ্গে কী ধরনের অবস্থা ছিল তা লোকে শীঘ্রই ভুলে যাবে। ১৯৪৭ সালে হঠাৎ-আসা নতুন জীবনের একদিকে উল্লাসময় অন্যদিকে সমস্যাপূর্ণ যে-সব অবস্থা এল, বৃটিশের অধীনে যাঁরা চাকরিজীবনে ঢোকেন তখন যে-সব সমস্যার কথা আশার কথা, তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না, সে-সবের আলোচনা ভারতীয়, বিশেষত পূর্বভারতের, আই-সি-এসদের রচনায় খুব কমই

আছে। স্বাধীনতা আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎ নীতি পদ্ধতি নির্ধারণ, দেশের পুনর্নিমাণ ও প্রগতির যাত্রাপথে যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকপাল তথা স্বাধীনোত্তর শাসনের ভার নিলেন, তাঁদের নেতৃত্বে ও সংস্পর্শে এসে আই-সি-এসরা কীভাবে নতুন ব্রতে প্রবৃত্ত হলেন, তার আলোচনাও থাকবে।

আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ডে আমরা ১৯৫৬ থেকে আশির দশকে পৌঁছব। এই যুগে, বিশেষত নেহরুর তিরোধানের পর জাতীয় জীবনে নতুন নতুন প্রশ্ন ও সমস্যা কীভাবে এবং কেন দেখা দিল, তার আলোচনা থাকবে।

বর্তমান খণ্ডটি আমার ইংরেজি 'থ্রি স্কোর এণ্ড টেন্: দি ফার্স্ট স্কোর এণ্ড থ্রি'র বাংলা সংস্করণ। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত'র প্রেরণাতেই আমি অনুবাদ এবং কিছু কিছু নতুন সংযোজনা হাতে নিতে ভরসা পাই। প্রথম খসড়ার কিছু কিছু ক্রটিবিচ্যুতিও তিনি সংশোধন করে দেন। প্রকাশনার ব্যাপারে স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীঅশোক গুপ্ত [বিক্রমাদিত্য] ও দে'জ পাবলিশিং-এর আগ্রহ আমাকে উৎসাহিত করে। মুদ্রণ ও প্রুফ থেকে শুরু করে, ছবি, বানান এবং নাম, খুঁটিনাটি-উক্তি ও তথ্যের নির্ভুলতা নির্ণয়-বিষয়ে ও নির্ঘণ্ট তৈরির জন্য শ্রীসুবীর ভট্টাচার্যের কাছে আমি বিশেষ ঋণী। এঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা আমার জানাই।

৫০৫ যোধপুর পার্ক, কলকাতা ৭০০০৬৮

অশোক মিত্র

ছেলেবেলা

১৯১৭ সালে শীতলা ষষ্ঠীর দিনে আমার জন্ম। ঐ তিথিতে জন্মালে লোকে নাকি দীর্ঘজীবী হয়। তার আগের তিথিতে, অর্থাৎ শ্রীপঞ্চমীর দিনে জন্মালে আমার ভাগ্যে হয়তো সরস্বতীর কৃপালাভ হতো। সত্তর বছর যখন পূর্ণ হল, মনে হল মা ষষ্ঠী কৃপা করেছেন। তখন খেদ হল, আহা যদি আমি শ্রীপঞ্চমী ও ষষ্ঠীর সন্ধিক্ষণে জন্মাতুম, তাহলে হয়তো দুজনেরই কৃপা সমানভাবে পেতুম! আবার মনে হয়, হয়তো সন্ধিক্ষণে জন্মালে দুজনেরই কৃপা থেকে বাদ পড়তুম। বিদ্যা হোক না হোক, এই সত্তর বছরে যা দেখেছি, অন্য কোন যুগে জন্মালে, আমার দীর্ঘ জীবনে মানুষের যে সব কীর্তি সম্ভব হয়েছে, তার সিকির সিকিও দেখার ভাগ্য কপালে জুটত কিনা সন্দেহ। আমার ভাগ্য ভাল স্বীকার করতে হবে।

জ্ঞান হওয়া অবধি বাবা মার কাছ থেকে প্রায়ই শুনেছি, যদিও তাঁদের পূর্বপুরুষেরা কোন কালে ধনী বা গণ্যমান্য ছিলেন না, তবুও তাঁদের ছিল অটুট সততা ও আত্মসম্মানবোধ। উভয়কুলের পূর্বপুরুষরা ছিলেন যাকে বলা যায় গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। উভয়কুলেই জমিজমা ছিল অল্প। তার আয় থেকে সচ্ছলভাবে সংসার চলা শক্ত, অতএব হয় শিক্ষকতা না হয় চাকুরির উপার্জনের উপর নির্ভর করতেই হতো। জাতিতে কায়স্থ, লেখাপড়াই পেশা, হাল ধরা ছিল বারণ, অতএব কৃষির উন্নতিতে মন ছিল না। আমাদের বংশের ভিটে ছিল হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া থানার চাকলই গ্রামে। সতেরো শতকে পাণ্ডুয়ার মুসলমান মনসবদারের সেরেস্তায় চাকরি করে আমার পূর্বপুরুষরা কিছু জমি লাখেরাজ হিসাবে দান পান। আমার মায়ের পূর্বপুরুষরা একই কারণে বর্ধমানরাজের কাছ থেকে প্রায় একই যুগে বর্ধমানের ভাতার থানার বড়বেলুন গ্রামে কিছু জমি পুরস্কার পান। দুই কুলে কারোরই গ্রামে প্রতিপত্তি বা সম্পত্তি বাড়ানোর দিকে বিশেষ মতি ছিল বলে মনে হয় না। বাবাদের বংশ বিষয়ে আমার বাবা, আর মায়েদের বংশ বিষয়ে আমার মায়ের খুড়তুতো বড় দাদা, রাঙামামার কাছে শুনেছি দুপক্ষেরই অন্য শরিকরা তাঁদের পিতৃপিতামহদের সম্পত্তি থেকে পুরুষানুক্রমে কিছু কিছু বঞ্চিত

করেন, ফলে তাঁদের কপালে স্বাধীন পেশা বা চাকুরিই হয় প্রধান সম্বল। ১৯৩১ সালে আমি রাঙ্গামামা আর আমার নিজের মামাবাবুর সঙ্গে একবার তাঁদের গ্রামে যাই। বড়বেলুনে শুধুমাত্র ভিটে বাড়ি আর সংলগ্ন একটি ছোট পুকুর আর সামান্য সব্জি খেত দেখেছি বলে মনে পড়ে। চাষজমি তাঁরা দেখাননি। ১৯৫৭ সালে আমি বাবার সঙ্গে প্রথম আমাদের গ্রাম চাকলইতে যাই। আমাদের ভিটের অবস্থা দেখি আরো খারাপ। ভিটে বাড়ি প্রায় পড়ে গেছে, ভিটে সংলগ্ন পুকুর আর বাগান আমার বাবার খুড়তুতো ভাইরা ভোগ করছেন। না আমার মামারা, না আমার বাবা, কোন পক্ষেই গ্রামের সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্যে কোন চেষ্টা করেছেন বলে দেখিনি, যদিও যে-কালের কথা আমি বলছি তখন বাবা-মা উভয় দিকেই মামলা করে সম্পত্তি উদ্ধারের মতো সঙ্গতি তাঁদের ছিল।

আমার প্রপিতামহ অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে কাশীর এক মঠে চলে যান। ১৯৩১ সালে সিমলা থেকে বর্ধমানে ফেরার পথে আমার বাবা আমাকে নিয়ে কাশীতে নেমে আমাকে সে মঠ দেখাতে নিয়ে যান। প্রপিতামহ যখন সন্ন্যাস নেন, তখন আমার পিতামহ সর্বেশ্বর মিত্রের বয়স মাত্র চোদ্দ বছর, শ্রীরামপুর কলেজে এণ্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র। কলকাতার ডাফ কলেজের রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ ছিলেন কলেজের পরিদর্শক। পরিদর্শনের কাজে একবার এসে তাঁর চোখ ঠাকুর্দার ওপরে পড়ে। ফলে তাঁকে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে নিজের কলেজে ভর্তি করে দেন। ডাফ সাহেবের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল, ঠাকুর্দামশাই খ্রীস্টান হন। আমার বাবা যোগেশচন্দ্রের কাছে শুনেছি কেমন করে ঠাকুর্দামশাই খ্রীস্টান হতে হতে শেষ মুহূর্তে মত বদলে হিন্দুই রয়ে গেলেন। তখন শিক্ষিত সমাজে চলছে নিরীশ্বরবাদের হাওয়া, ফলে ঠাকুর্দামশাই সারা জীবন নিরীশ্বরবাদীই থেকে গেলেন। এ বিষয়ে বাবা একটি মজার ঘটনা প্রায়ই বলতেন। ডাফ কলেজে পড়ার সময় ঠাকুর্দা মাঝে মাঝে এক জোড়া মুরগীর ডিম সেদ্ধ করে গঙ্গার ধারে গিয়ে, আধগলা জলে নেমে, ডিম দুটি ভেঙে খেতেন। হিন্দুদের পক্ষে মুরগীর ডিম ছিল নিষিদ্ধ, যদিও তা গোমাংসের পর্যায়ে পড়ত না। এই ধরনের বিধর্মী কাজ তিনি মা গঙ্গাকে অপবিত্র করার উদ্দেশে করতেন, না মুরগীর ডিম খাওয়ার পাপস্খালনের জন্যে করতেন, বাবা কারণটা কোনদিন ঠিক পরিষ্কার করে বলেননি। একদিকে শাস্ত্র অমান্য করার ঝোঁক, একই সঙ্গে সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলা, এটা বোধহয় চিরকালই বাঙালীর মজ্জায় গেঁথে আছে।

এফ-এ বা ফার্স্ট আর্টস্ পাশ করার পর রেভারেণ্ড ডাফের সুপারিশে ঠাকুর্দা চুঁচুড়ায় সরকারী অফিসে কাজ পেলেন। জমির আয় এবং চাকরির মাইনে থেকে

মোটামুটি সাচ্ছল্য আসায় ঠাকুর্দা তাঁর বড় ছেলে সুরেশচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি-এ এবং রিপন কলেজ থেকে বি-এল পাশ করালেন। পাশ করে সুরেশচন্দ্র আবগারি বিভাগে ইন্‌স্পেক্টরের চাকরি পেয়ে পাবনায় কাজে যোগ দিলেন। লালগোলার মহারাজা আর নিমতিতার চৌধুরীবাবুরা তখন তাঁদের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির শিখরে। দুই ঘরেরই মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় ছিল অধিকাংশ সম্পত্তি, ফলে জঙ্গীপুর মহকুমার দেওয়ানি আদালতে তাঁদের মামলা-মোকদ্দমা লেগেই থাকত। বড় জ্যাঠামশায়ের সন্ধান পেয়ে সরকারি চাকরি থেকে তাঁকে ইস্তফা দিতে রাজি করিয়ে তাঁরা সুরেশচন্দ্রকে জঙ্গীপুর আদালতে ওকালতি শুরু করায় উদ্দীপনা দিলেন। তাঁদের সব মামলার ভার বড়জ্যাঠামশাই পেলেন।

আমার বাবার জন্ম হয় ১৮৮৫ সালে। বাবার বয়স যখন তেরো, তখন বড়-জ্যাঠামশায়ের পসার বেশ জমে উঠেছে, কারণ ঐ তল্লাটে উনিই ছিলেন একমাত্র বি-এল। তাঁর সাহায্যে মেজজ্যাঠামশাই সতীশচন্দ্র, মেডিক্যাল কলেজে এম-বি পড়া প্রায় শেষ করে এনেছেন, এমন সময়ে ঠাকুর্দামশাই কাশীবাসী হয়ে চাকলই ত্যাগ করলেন। ফলে বড়জ্যাঠামশাই চাকলই গ্রামের পাট উঠিয়ে সকলকে জঙ্গীপুরে নিজের তৈরি পাকা বাড়িতে তুললেন। ১৮৯৮ সালে বাবা জঙ্গীপুর হাইস্কুলে ভর্তি হলেন। মেজজ্যাঠামশাই যে-সময়ে এম-বি পাশ করেন তখন বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসের পত্তন হয়েছে। তখন এত কম লোক এম-বি পড়ত, যে পাশ করেই মেজজ্যাঠামশাই সরাসরি মেডিক্যাল সার্ভিসে স্থান পেলেন।

চাকলই সম্বন্ধে বাবার বরাবর খুব মমতা ছিল। চাকলই-এর কথা উঠলেই তাঁর চোখ দুটি জলজল করে উঠত। প্রায় সারা বছর ধরে ম্যালেরিয়ার পালাজ্বরে নাস্তানাবুদ হওয়া সত্ত্বেও সে-স্মৃতি কখনও ম্লান হয়নি। প্রাইমারি স্কুলের হেড পণ্ডিত মশাই বাবাকে খুব স্নেহ করতেন, যদিও বাবা প্রায়ই ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মাঠে ছাগল চড়াতেন, না হয় আমগাছ পেয়ারাগাছের খোঁজে ঘুরতেন। আমি যখন বিশ বছর বয়সে লুকিয়ে সিগারেট ধরি, বাবা জানতে পেরে বললেন, আমাকে তিরস্কার করার মতো মুখ তাঁর নেই, কারণ তিনি নিজেই সাত বছর বয়সে লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুর্দামশাইয়ের হুঁকো খেতে আরম্ভ করেন। একবার কী করে গ্রামের ওঝা তাঁর পিসিমার ভূত ছাড়াল সে-গল্প তিনি রসিয়ে বলতে ভালবাসতেন। ঝাড়ফুঁকের ফলে ভূত যখন পিসিমাকে ছাড়ল, তখন প্রমাণ হিসেবে সে নাকি বাড়ির হাতার নিম গাছের একটা প্রকাণ্ড ডাল সশব্দে মটকিয়ে ভেঙে মাটিতে ফেলে চলে গেল। এতখানি বলার পর বাবা বেশ কিছুক্ষণ ইচ্ছা করে চুপ থেকে বলতেন, ডালটা পরে যখন ভাল করে দেখা হল, তখন লোকে দেখে সেটা আগে থেকেই কে যেন বেশ

খানিকটা কুড়ুলে কুপিয়ে কেটে রেখেছিল। এইটেই হল বাবার কথার মাঝে চুপ করে থাকার তাৎপর্য।

বাবা জঙ্গীপুর হাইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করার পর বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে এফ-এ ক্লাশে ভর্তি হলেন। এফ-এ পাশ করে এই শতকের গোড়ায় প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ ক্লাশে ভর্তি হলেন। তখন বি-এতে দুটি ধারা ছিল। প্রথমটি এ-কোর্স অর্থাৎ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি। দ্বিতীয়টি বি-কোর্স, অর্থাৎ বিজ্ঞান। বি-কোর্স পাশ করে বাবা শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষি বিভাগে ভর্তি হলেন। তখনকার দিনে কৃষি এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি পেলে লোকে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে ভর্তি হতে পারত। যিনি এই বিষয়ের পরীক্ষায় প্রথম হতেন, তিনি যেতেন বেঙ্গল সার্ভিসে, অর্থাৎ সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চাকরিতে স্থান পেতেন। যিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন তাঁর ভাগ্যে জুটত সাবডেপুটিগিরি। বাবা দ্বিতীয় হলেন। ফলে সাবডেপুটির চাকরি পেলেন। ১৯০৬ সালে, একুশ বছর বয়সে বাবার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল।

বাবাদের যুগ ছিল আদর্শবাদিতার যুগ। উনিশ শতকের সব ভাল আদর্শের প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ। তার সঙ্গে ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগের আত্মবিশ্বাস। মানুষের ভাগ্যের যেন সবটাই তার নিজের হাতে। বিদ্যার প্রতি ছিল প্রগাঢ় ভক্তি এবং আসক্তি, আত্মোন্নতির জন্যে ছিল আপ্রাণ চেষ্টা, ইউটিলিটেরিয়ানিজ্‌ম্ ও পজিটিভিজ্‌মে ছিল একান্ত আস্থা। স্বনির্ভরতা ছিল জীবনের বীজমন্ত্র। ছিয়াশি বছর বয়সেও বাবা নিজের হাতে স্নানের ঘর, পায়খানা পরিষ্কার করতেন, নিজের কাপড় নিজে কাচতেন, জামায় বোতাম বসাতেন, রোজ অন্তত সাত থেকে আট ঘণ্টা পড়াশোনা এবং মস্তিষ্কের কাজ করতেন। একদিকে বৃটিশ শাসনের দাসত্ব ও কুফল সম্বন্ধে মনে মনে যেমন বিদ্বেষ ছিল, অন্যদিকে তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের মধ্যে দেখেছি ইংরেজদের কর্তব্যপরায়ণতা, নির্ভীকতা, ন্যায়বোধ, পাণ্ডিত্য এবং এদেশ সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানের অকুণ্ঠ তারিফ। সবসময়ে স্বীকার করতেন নানা বিষয়ে ইংরেজচরিত্রের কাছে তাঁরা যতখানি ঋণী, স্বদেশবাসীর কাছে তাঁরা ততখানি পাননি।

বিয়ের পাত্র হিসেবে বাবাকে দেখতে যাবার গল্প রাঙ্গামামা এত রসিয়ে বলতে পারতেন যে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যেত। এ বিষয়ে শেষবার তিনি গল্প বলেন ১৯৬৫ সালে। দিল্লীতে আমাদের ১৫ পণ্ডিত পন্থ মার্গের বাড়িতে বাবা, রাঙ্গামামা, রাণ্টুমামা আর সকলে দুপুরে খাবার পর বাগানে গোল হয়ে বসে আছেন। বাবার বয়স তখন আশি, রাঙ্গামামার পঁচাত্তর, রাঙ্গামামার পরের ভাই রাণ্টুমামার

আটবট্টি। রাণ্টুমামার ভাল নাম ছিল ডাঃ কালীপদ বিশ্বাস। ছিলেন বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ, এককালে শিবপুর বোটানিকাল গার্ডন্‌সের ছিলেন ডিরেক্টর, পরে ভার নেন বোটানিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার, এবং ভারতীয় বনৌষধি বিষয়ে হন সরকারের উপদেষ্টা। বাবার বিয়ে হয় ১৯০৬ সালে। আমার মা, শ্রীমতী উষাবতী, সাতচল্লিশ বছর বয়সে ১৯৩৯ সালে মারা যান। অতএব বিয়ের সময়ে তাঁর বয়স ছিল চোদ্দ। বাবা থাকতেন অক্রুর দত্ত লেনের এক মেসে। জঙ্গীপুর থেকে বড়জ্যেঠামশাই এলেন বাবার মেসে আমার দাদামশাই এবং তাঁর পঞ্চম ভাই, নতুনদাদামশাইকে পাত্র দেখাতে। তাঁদের সঙ্গে এলেন রাঙ্গামামা। রাঙ্গামামা বল্লেন, "আমরা বসার পর, তোমার বড়জ্যেঠামশাই আপ্যায়ন করলেন আমাদের, তারপর তোমার বাবাকে ডাকলেন। খুব ফর্সা, সুপুরুষ, বলিষ্ঠ এক যুবা, মাথাভর্তি চুল, সারামুখে ভাল করে ছাঁটা চাঁপ দাড়ি আর গোঁফ; ঘরে সলজ্জ পায়ে ঢুকে, গম্ভীর মুখে গুরুজনদের একে একে প্রণাম করলেন। প্রথমে নিজের বড় দাদাকে. তারপর তোমার দাদামশাইকে, তারপর আমার বাবাকে। প্রণাম করে নিঃশব্দে হেঁটে দেয়ালের দিকে মুখ করে, গুরুজনদের দিকে আড়াআড়ি পিছন করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাদামশাই, নতুন দাদামশাই যে দু একটি প্রশ্ন করলেন, সেগুলির অতি সংক্ষেপে, ঈষৎ ঘাড় নেড়ে, আজ্ঞে হাঁ, আজ্ঞে না, উত্তর দিলেন। দাদামশাই, নতুন দাদামশাই যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে বাবা প্রশ্ন বুঝতে পারেন, উত্তরও ঠিকমত দিতে পারেন, ভদ্রসন্তানের উপযুক্ত হাবভাব, সহবৎ ও বিনয়ও আছে, তখন তাঁরা সস্নেহে বাবাকে ভিতরে গিয়ে পড়াশুনা করার অনুমতি দিলেন। বাবা যেন ঠিক বারো তেরো বছরের ছেলে।" রাঙ্গামামা এমন মজা করে, অঙ্গভঙ্গী ও গলার স্বরের নকল করে গল্পটি বলতেন, যে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে যেত।

দাদামশাইয়ের বাড়ি ছিল বালিগঞ্জের ১০ নম্বর লাভলক প্লেসে। সেখানে তিনি সব ভাই ও তাদের পরিবারদের নিয়ে থাকতেন। দাদামশাই, অম্বিকাচরণ বিশ্বাস বড়বেলুন গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় পড়তে আসেন। এফ-এ পাশের পর আর বেশী পড়েননি। এফ-এর পরেই তিনি ভারত সরকারের কমিসারিয়েট দপ্তরে চাকরি পান। চাকরিতে তিনি ধাপে ধাপে উন্নতি করেন। সব ভাইকে একে একে স্কুল কলেজে পড়িয়ে সরকারি চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন। দাদামশাই যে কাজ করতেন তাতে যতদিন কলকাতা রাজধানী ছিল, অর্থাৎ ১৯১১ সাল পর্যন্ত, প্রতি বছর তাঁকে কলকাতায় শরৎ-হেমন্ত-শীতের ছয়মাস এবং সিমলাতে বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষার ছয়-মাস কাটাতে হতো। ভারত সরকারের তখন তাই ছিল নিয়ম। বাবার কাছে শুনেছি দাদামশাইয়ের গায়ে ছিল ভীষণ জোর। খুব বলিষ্ঠ ছিলেন। একবার নাকি

কানপুর স্টেশনে একজন ফিরিঙ্গি টিকিট-পরীক্ষক ট্রেনের কামরায় ঢুকে মাতলামি করায় তিনি তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

আমার মামাবাবু শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের শোবার ঘরে মাথার শিয়রে দাদামশাইয়ের যে ফোটো দেখেছি তাতে বেশ বোঝা যায় তাঁর শরীর কত বলিষ্ঠ ছিল, মেজাজও ছিল খুব রাশভারি, অথচ চোখের চাউনি ছিল নরম। আমার বড় জ্যেঠামশাই আর মেজজ্যেঠামশাইয়ের ফোটোতে তাঁদের সম্বন্ধে যে রকম ধারণা হয়, দাদামশাইয়ের ছবিতে কিন্তু একেবারে অন্যধরনের আভাস পেতুম। বড় জ্যেঠামশাইকে দেখে মনে হতো অতি সজ্জন, ঋজুচরিত্র অথচ মৃদু স্বভাবের ব্যক্তি। উকিল বলতে সাধারণত যেরকম মারপ্যাঁচের, অর্থাৎ ঘোরালো লোক বুঝি, তা মোটেই নয়। তিন ভাই সকলেই ছিলেন সুপুরুষ, তার মধ্যে আবার মেজজ্যেঠামশাই ছিলেন সবচেয়ে সুপুরুষ। তাঁর ছবি দেখেই মনে হতো খুব মিশুকে, স্নেহশীল, বন্ধুবৎসল, আলাপপ্রিয়। আর সত্যিই, তিনি গল্প করতে খুব ভালবাসতেন। বাবার গানের গলা ভালই ছিল, কিন্তু বাবার মতে সত্যিকারের ভাল গলা ছিল মেজজ্যেঠামশাইয়ের। শুধু যে ভাল গাইতেন তা নয়, তবলা আর এসরাজ দুয়েই ছিলেন ওস্তাদ। পূর্ণিয়ায় যখন তিনি সিভিল সার্জন, মা'র প্রসব সময় আসন্ন হল। মেজ জ্যেঠামশাই পীড়াপীড়ি করে দাদামশাইয়ের কাছ থেকে মাকে পূর্ণিয়ায় আনিয়ে নিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে ১৯১৭-র মাঘ মাসে প্রসব করালেন। বাবাকে টেলিগ্রাম পাঠালেন, 'বৌমার নির্বিঘ্নে প্রসব হয়েছে। এবার পুত্রসন্তান। দুজনেই ভাল আছে।' আমার অভিজ্ঞতায়, পুরুষ ডাক্তাররা বেটাছেলে প্রসব হলে সাধারণত এমন ভাব দেখান যেন তাঁদেরই হাতযশ। ১৯৭৭ সালে আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে যখন আমার দৌহিত্র ভূমিষ্ঠ হয় তখন প্রসূতিঘর থেকে ডাক্তার বেরিয়ে এসে আমার স্ত্রীকে চেঁচিয়ে বলেন, ছেলে হয়েছে। আমার হাতে শুধু ছেলেই প্রসব হয়। মজা দেখুন একবার !

আমার জন্মের কিছুদিন পরে মেজজ্যেঠামশাই মারা যেন। তখন তাঁর চাকরি থেকে অবসর নিতে অনেক বাকি ছিল। বাবা তাঁর মেজদাদার পরিবারের সমস্ত ভার নিলেন ; অর্থাৎ মেজজ্যেঠাইমা, তিনজন নাবালক পুত্র, চারজন অবিবাহিতা কন্যার। একে একে সব ছেলেকে স্কুলে আর কলেজে পড়ালেন। মেয়েদের সকলকে সম্বন্ধ করে বিয়ে দিলেন। সব কিছুই তিনি নিজের রোজগার থেকে করলেন, মেজজ্যেঠামশাই যা কিছু সঞ্চয় রেখে গেছলেন, তার এক কপর্দকও স্পর্শ করেননি। উল্টে, সে সঞ্চয়ের এবং তার সুদের প্রতিটি পাই-পয়সা দিয়ে তাঁর মেজবৌদির নামে ভাল ভাল কোম্পানির কাগজ কিনে দিতেন। যতদিন বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

চালু ছিল, বাবা নিজে কোনদিন বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি ছাড়া পরেননি। কেন না বঙ্গলক্ষ্মী মিলে মেজজ্যেঠামশাইয়ের কিছু শেয়ার ছিল। বড় জ্যেঠামশাই প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়সে মারা যান।

মায়েদের বংশের গল্প বাবার কাছে মাঝে মাঝে যা শুনেছি এবার তার কিছুটা বলি। আগেই বলছি, বাবার বিয়ের সময়ে দাদামশাইয়ের বাড়ি ছিল লাভলক প্লেসে। বেশ বড়, দোতলা বাড়ি। চারদিকে হাতা ছিল বিস্তৃত, তার একপ্রান্তে ছিল সার সার লোকজনদের থাকার ঘর, পাশে আস্তাবল। দেউড়ি আর বাড়ির মাঝখানে ছিল বড় বাঁধানো চত্বর। দোতলায় ছিল বেশ চওড়া দক্ষিণমুখী ঢাকা বারান্দা। দোতলার সেই ঢাকা বারান্দার মাঝামাঝি মায়ের ঠাকুরমার আসন পাতা থাকত। সেইখানে বসে তিনি পূজো সেরে কুঁড়োজালির মধ্যে হাত পুরে মালা জপতেন। একদিকে তাঁর হাত মালা জপার কাজ করে যাচ্ছে, অন্যদিকে তিনি সকলকে একে একে ডেকে সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটির খবর নিয়ে বিধান দিয়ে যাচ্ছেন। রোজ সকালে অফিসে যাবার আগে দাদামশাই এসে তাঁকে টিপ করে প্রণাম করতেন। বাবা নাতজামাই হয়ে এসে, তাঁকে প্রণাম করে, একটু দূরে পাতা আসনে বসলেন। মার ঠাকুরমা তাঁকে আশীর্বাদ করে, কাজের কথা জিগ্যেস করলেন। বাবা উত্তর দেবার পর বল্লেন, 'তা ত বুঝলুম, বলি উপরি-টুপরি কিছু আছে?' বাবা ত হতভম্ব! থতমত খেয়ে, ঢোঁক গিলে, বিড়বিড় করে বল্লেন, আজ্ঞে না। বৃদ্ধা শুনেই ত খাপ্পা। বাবা লোকের গলা ও হাতপা নাড়া এত ভাল নকল করতে পারতেন যে আমাদের পেটে খিল ধরার দাখিল হতো। ফোকলা দাঁতে উপরি-টুপরি শব্দটি দারুণ মজার শোনা। বাবার উত্তর শুনে, গলা তুলে মার ঠাকুরমা নাকি বল্লেন—যা ভেবেছি তাই। যেমন হতভাগা বাউণ্ডুলে আমার ছেলে, তেমনি জুটিয়েছে নিষ্কর্মার ঢেঁকি এক বড় জামাই! এ বংশে কোন দিন কিছু কি হবে!

মায়ের বিয়ের আগেই তাঁর ঠাকুরমার সবকটি দাঁত পড়ে গেছল। তা হলে কি হয়, সংসারে পান থেকে চুনটি খসার উপায় ছিল না, তাঁর আদেশ ছাড়া। কেউ কুটোটি পর্যন্ত এখান থেকে ওখানে নড়াতে পারত না। যেমন ছিল কড়া মেজাজ, তেমনি গলার দাপট। তাঁর আদেশমত রোজ সন্ধ্যাবেলা সব নাতি-নাতনীকে সমুখে লম্বা করে বিছানো মাদুরের উপর বসে উচ্চৈঃস্বরে পড়া করতে হতো, বিশেষত নামতা পড়ার সময়ে। পাশের বাড়িতে থাকতেন গ্রেগরী বলে এক আর্মেনিয়ান সাহেব। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ক্যান্সারের রুগী। নিশ্চিত মৃত্যু যখন আসন্ন তখন গ্রেগরী সাহেব কাতর অনুরোধ লিখে জানালেন, দশ নম্বরের ছেলেরা সন্ধ্যায় যদি ক'টা

দিন একটু গলা নিচু করে পড়াশোনা করে। ঠাকুরমাকে বলায় তিনি যা বল্লেন, বাবার গলায় তা না শুনলে তার কোন মজাই পাঠককে বোঝানো যাবে না। তবুও বলি। ঠাকুরমা নাকি চেঁচিয়ে বলেন, কি কথা বলেছে? মুখ বুজে আমার বাছারা পড়বে? আমার বাড়িতে আমি নটী নাচাবো, বাইজী গাওয়াবো, গেরে-গারি ব্যাটার কী বলার আছে তাতে? এত বড় আস্পর্ধা। দাদামশাই বহু কষ্টে, নানা ফন্দি এঁটে তাঁর মাকে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত, যতদিন না মিসেস গ্রেগরী মারা গেলেন, সে ক'দিনের জন্য চেঁচিয়ে পড়া বন্ধ করান।

দাদামশাই মারা যাবার পর তাঁর তিন ভাই, আমার নতুন, ফুল ও ছোট দাদামশাই ভিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা সংসার পাতলেন। রাঙ্গামামার বাবা, নতুন দাদামশাই ১৭ নম্বর ভবানীপুরে বেলতলার শ্যামানন্দ রোডে বাড়ি করলেন। মামাবাবু ১৩।১ শ্যামানন্দ রোডে একটি বাড়ি নিলেন। পরে সমুখে ১৩ নম্বর জমির উপর নিজে দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। বাড়িখানি এখনও আছে। রাঙ্গামামা নিজের তিন ভাইকে পর পর মানুষ করেন। আমার মামাবাবু তাঁর তিন বোনের একে একে বিয়ে দিলেন। সবচেয়ে ছোট বোনের অর্থাৎ আমার ছোট মাসিমার অনেকদিন পর্যন্ত ভাল সম্বন্ধ আসেনি বলে অনেক বয়স পর্যন্ত নিজে অকৃতদার ছিলেন। রাঙ্গামামার নিজের কোন বোন ছিল না। সারা যৌথ পরিবারে আমার মা ছিলেন প্রথম মেয়ে এবং সবচেয়ে সুন্দরী, ছিলেন রাঙ্গামামার চোখের মণি। আজীবন রাঙ্গামামা তাঁকে কুঁড়ি বলে ডেকেছেন। ১৯৬৫ সালের কথা লিখেছি, তখনও আমার মার উল্লেখ করেছেন কুঁড়ি বলে, গলার স্বরে মনে হতো যেন সযত্নে গোলাপের কুঁড়িতে আঙুল ঠেকাচ্ছেন। কুঁড়ির ছেলেমেয়েরাও তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ছিল। মাও তাঁকে ভীষণ ভালবাসতেন। রাঙ্গামামার কথা ছিল তাঁর কাছে বেদবাক্য। ফলে বাবার কথা ফেলে মা যখন দাদার কথামত মাঝে মাঝে কাজ করতেন, তখন বাবাকে সময়ে সময়ে বেশ ক্ষুণ্ণ বোধ করতে দেখেছি।

রাঙ্গামামা আর মামাবাবু দুজনেই ছিলেন লম্বা, বলিষ্ঠদেহ, সুপুরুষ, একহারা চেহারাই বলা যায়। পোশাক দেখে সম্ভ্রম হতো। সাদাসিধে, সাদা কালপেড়ে কাঁচি ধুতি তার সঙ্গে সাদা লংক্লথের পাঞ্জাবি, ধোপদুরস্ত, পরিপাটি। চাদর বা শালে সামান্য একটু রঙিন পাড়, তাতেই তাঁদের মার্জিত রুচির পরিচয় ফুটে উঠত। আমার চোখে এবং মনে এখনও তাঁদের স্মৃতি, ভদ্রতা ও সততার পরাকাষ্ঠা হিসেবে বিদ্যমান। রাঙ্গামামা যখন মারা যান আমি তখন বিদেশে। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৮৯ বছর বয়সে মামাবাবু মারা যান। মারা যাবার আগে শেষ ইচ্ছা লিখে রেখে যান। মানুষের কাঁধে তুলে তাঁর দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

শবের উপর ফুলমালা সাজানো চলবে না। ইলেকট্রিক চুল্লিতে দাহ করতে হবে। ছেলেমেয়েরা কেউ অশৌচ পালন করবে না, মাথা কামাবে না. আত্মার মুক্তিকল্পে চিরাচরিত শ্রাদ্ধাদি কাজ আদৌ করবে না। শুধুমাত্র, মৃত্যুর পর তেরো দিনের দিন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করে গান ও সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট হবে।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯২০-২১ সালের আগের স্মৃতি কিছু মনে আসে না। এমন কোন চিঠিপত্রও নেই যাতে বুঝতে পারি রাণাঘাটের স্মৃতি আগের না রাঁচির। ১৯২০ সালে রাঁচি বিহার প্রদেশের গ্রীষ্মকালের রাজধানী ছিল, এখন ত বিরাট শিল্পাঞ্চল, বিরাট বিরাট কারখানার শহর। রাণাঘাট পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার মহকুমা শহর, বড় রেল লাইনে কলকাতা শহর থেকে প্রায় ৪৬ মাইল উত্তরে। রাণাঘাটের স্মৃতি এখনও বেশ স্পষ্ট ; রাঁচির স্মৃতি ছেঁড়া ছেঁড়া, অস্পষ্ট। ১৯২০—২১ সালে রাণাঘাট বড় জোর এখনকার দিনের তুলনায় বড় একটি গ্রাম ছিল। গ্রাম থেকে যা তফাৎ ছিল তা হচ্ছে মহকুমা অফিসগুলি সবই ছিল, আর ছিল হাইস্কুল, একটি ছোট হাসপাতাল, রেলের জংশন, আর অনেক ইটের বাড়ি। নামে মাত্র মিউনিসিপ্যালিটি ছিল, তবে মিউনিসিপ্যালিটির সুখ-সুবিধা বিশেষ কিছু ছিল না। অন্তত আমার মনে পড়ে না। রাস্তাগুলি অধিকাংশই কাঁচা, সরু, অলিগলির মতো ঘুরে ঘুরে গেছে।

রাণাঘাটে বাবা একটা দোতলা বাড়ি ভাড়া নেন। দোতলায় অর্ধেকটাতে ছিল ঘর, বাকি অর্ধেকটা ছিল খোলা ছাত। নিচে ঘিঞ্জি সরু রাস্তা। ছেলেবেলার স্মৃতি অনুযায়ী বাড়িটা আমার বেশ বড় মনে হতো, কিন্তু ১৯৪১ সালে যখন আবার রাণাঘাটে যাই, দেখি বাড়িটা বেশ ছোট। সে যুগে মোটর গাড়ি ছিল না বললেই হয়, তবে ভোর থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত রাস্তায় সবসময়ে ভিড় থাকত। প্রায় একই বাঁধা ক্রমিকে প্রথমে আসত একের পর পর বিভিন্ন রীতিতে গায়কের দল। গান গেয়ে ভিক্ষা চাইত। হাতে নানা রকমারি তারের যন্ত্র, সঙ্গে ছোটবড় খঞ্জনি, করতাল। গাইয়েরা মোটামুটি তিন শ্রেণীর : কীর্তনীয়া, বাউল, রামপ্রসাদী। তার মধ্যে কীর্তনীয়াদের গানে ছিল সবচেয়ে বেশী ভাব ও গাইবার রীতির বৈচিত্র্য। তার পর বাউল, তার পর রামপ্রসাদী। শরৎকালের গান আগমনী—যে গানে মাঠে মাঠে ভরা ধানের হিল্লোলের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গে মা দুর্গার আগমনের আনন্দ দুলে উঠত—সে গান আমি রাণাঘাটে শুনিনি। তার কারণ বোধ হয় রাণাঘাটে আমরা কোনদিন পূজার সময়ে থাকিনি, কলকাতায় যেতুম। এমন কোন বাঙালী

মা বাবা বোধ হয় নেই—বিশেষত যাদের একমাত্র কন্যা পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকে—যাঁদের শঙ্খনির সঙ্গে গাওয়া প্রথম আগমনী গান শুনে মন হু হু করে ওঠে না, চোখে জল আসে না :

যাও যাও গিরি
আনো হে গৌরী
উমা নাকি মোর কেঁদেছে।

এখন যেভাবে রাণাঘাটে দিন শুরু হয়, সেকালে অন্যরকম ছিল। পুরুষদের মধ্যে বেকারত্ব ছিল অনেক কম। অন্য দিকে খুব কম মেয়েই পড়তে অথবা কাজ করতে ঘরের বাইরে যেত। পুরুষরা খুব সকালে জলখাবার শেষ করতে না করতেই ভিক্ষার গান শুরু হতো। গৃহিণীরা তখন ঘরকন্নার কাজে চোখে কানে দেখতে পাচ্ছেন না, স্কুলের ছেলেমেয়েদের আর অফিসের ভাত দিতে হবে। সুতরাং সদর দরজায় ছুটে গিয়ে ভিক্ষের চাল গায়কদের ভিক্ষার ঝুলিতে ঢেলে দেবার কাজ ছিল বাড়ির ছোট মেয়েদের। বেলা ৯টা নাগাদ গান গাওয়া ভিক্ষুকের দল আচমকা শেষ হয়ে রাস্তা হয়ে যেত হঠাৎ চুপচাপ, নিস্তব্ধ। বেলা ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত গৃহিণীদের আর নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকত না। স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্নান করিয়ে, কাপড় পরিয়ে, ভাত খাইয়ে স্কুলে পাঠানো ছিল প্রথম কাজ। তারপর আসত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে বড়দের খাইয়ে অফিস পাঠানো। ঐ সময়ে প্রত্যেক বাড়িতে পড়ত ভীষণ হুড়োহুড়ি, জিনিস আনা-নেয়া, মাজা, ধোয়া, ঝাঁট দেওয়া, পরিষ্কার করা, আসন পেতে থালা বেড়ে ভাত ধরে দেওয়া, যতক্ষণ না ছেলেমেয়েরা ১০টার মধ্যে স্কুলে যায়, আর বাড়ির কর্তারা ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে অফিসে রওনা হন। সুতরাং ৯টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে ভিক্ষা চাইতে এলে অথবা ফেরিওলা জিনিস বিক্রি করতে এলে নিরাশ হতে হবে ; কারোর তখন সেদিকে মন দেবার সময় নেই। সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বাড়ির গৃহিণীরা একটু দম ফেলে বাঁচতেন। চুল খুলে, কুলিয়ে, চুলে তেল মাখিয়ে আঁচড়াতেন, গায়ে তেল মেখে স্নানের জন্যে যেতেন কুয়াতলায়। সাড়ে ১১টার সময়ে গৃহিণীরা স্নান সেরে, মুখে জলখাবার দিয়ে একটু যখন হাঁপ ছাড়তেন, তখন আসত দোরগোড়ায় ফিরিওলার কাছ থেকে ভাঁড়ারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার পালা। সাড়ে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টার মধ্যে একের পর এক পুরুষ ফেরিওলা নিজস্ব সুর করে অথবা ঘণ্টা বাজিয়ে আসত। চটপট কেনাবেচাও হতো যথেষ্ট। দর কষাকষি চলত খুব, তার অধিকাংশই অবশ্য স্রেফ মজা করার জন্য ; শেষ হতো ফেরিওলারা হতাশ সুরে এখানে এক পয়সা ওখানে এক আধলা দাম

কমিয়ে দেবার পর। ১২টার মধ্যে আবার সব নিস্তব্ধ। দুপুরের আহারের পর ঘুম। বেলা সাড়ে ৩টার সময় শুরু হতো মেয়ে ফেরিওলাদের পালা। তাদের মাথায় বা কাঁখে ঝুড়ি চুপড়ি, তার মধ্যে রাজ্যের কাঁচের চুড়ি, প্রসাধন ও মনোহারী সামগ্রী, কাঁসার বাসন। চুড়ি, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি হস্তান্তর হতো নগদ পয়সার বিনিময়ে, কাঁসার বাসন বিক্রি হতো পুরনো কাপড়ের বদলে। মেয়ে ফেরিওয়ালাদের হাঁকে বয়সনির্বিশেষে সদর দরজায় হতো বাড়ির মেয়েদের ভিড়। কাঁসার বাসনের খদ্দের হতেন বাড়ির বয়স্থা গৃহিণীরা। কাঁচের চুড়ি, শাঁখা, টিপ, আলতা, সিঁদুর, সাবানের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত ছোট ছোট মেয়েবৌরা। মায়েরা দরদস্তুর করে তাদের সওদার পয়সা দিতেন। কেনাবেচার সাথে সমানে চলত পাড়ার সকলের হাঁড়ির খবর জোগাড় করা। ফেরিওলীরা রাণাঘাট, তার সঙ্গে সারা পৃথিবীর, খবর জোগাত। সেই সঙ্গে বাড়ি বাড়িতে আগামী কয়েক মাসে কী কী সওদা লাগবে তার মোটামুটি বায়না ও হিসেব।

অবশেষে বেলা গড়িয়ে রোদ ঢলে পড়ত। আমার জ্যেঠতুত দাদাদের স্কুল থেকে ফেরার সময় হতো। তাঁদের কাছে একটু পাত্তা পাবার জন্যে আমি কাঙ্গালের মতো পিছুপিছু ঘুরতুম। কিন্তু তাঁরা তখন ফেরিওলার কাছ থেকে এক আধ পয়সার চানাচুর, নকুলদানা কেনার জন্য ব্যস্ত, আমার জন্যে সময় কোথা? ইতিমধ্যে নাপিত বৌ এসে হাজির। ছাতে তখন সূর্য ঢলে পড়েছে, ছায়া লম্বা হয়েছে। জল দিয়ে ছাত ধুয়ে বাড়ির ঝি ছাতে মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে। আমি নাপিতবৌয়ের সঙ্গে ছাতে যেতুম। আমার জ্যেঠতুত দিদিরা, আমার দুই দিদি, নাপিত বৌয়ের কাছে একে একে নখ কাটিয়ে, পায়ে আল্‌তা পরে, তাকে দিয়ে মাথার খোঁপা ঠিক করিয়ে নিচ্ছে। শেষে আসত আমার পালা। নাপিত বৌ নিজের কোলে আদর করে বসিয়ে বোঁ করে শূন্যে হাত ঘুরিয়ে আমার পায়ের দুই পাতার উপর এবং দুই হাতের পিঠে আঙুল দিয়ে টিপ টিপ করে চারটি লাল আল্‌তার টিপ বসিয়ে দিত। আমি আহ্লাদে খিলখিল করে হেসে যেতুম। বহু পরে, আমার মেয়ের বয়স যখন তিন কি চার, তখন তাকেও আমি মাঝে মাঝে ঐভাবে আল্‌তার টিপ পরিয়ে দিতুম এবং সেও আমার মতো খিলখিল করে হেসে উঠত।

অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেত। তখন অন্য শব্দ ভেসে আসত, প্রায় এক মাইল দূরের রেলস্টেশন থেকে। স্টেশনের বাইরে দূরে পাশাপাশি লাইনের উপর এঞ্জিনগুলি শোঁ শোঁ শব্দে অলসভাবে নিঃশ্বাস ফেলত, যেন কতই ক্লান্ত। মাঝে মাঝে জোরে বাঁশি বাজিয়ে ঝুগঝুগ করে এ-লাইন থেকে ও-লাইন বদল করত। আরো রাত্রি হলে সারা শহরের মাটি, আমাদের

বাড়ির ভিত কাঁপিয়ে মেল ট্রেনগুলি রাণাঘাটে না থেমে বেগে চলে যেত। দূর থেকে তাদের বাঁশি, উঁচু থেকে আরো উঁচু গ্রামে বেজে এগিয়ে এসে যখন স্টেশন পেরিয়ে দূরে চলে যেত, তখন ক্রমশ. নিচু গ্রামে নেমে যেত। এই সব শব্দ আজও আমার মনে গেঁথে রয়েছে।

কিন্তু এসব ছিল যাকে বলা যায় পটভূমি। আসলে প্রতি সন্ধ্যায় আমি অপেক্ষা করতুম কখন ছাতে মাদুরের উপর বিছানা পাতা হবে, আর খাওয়াদাওয়ার পর সেই বিছানায় আমরা ডিগবাজি খেয়ে গড়াগড়ি দেব। তার পর কখন মা এসে পাশ ফিরে শুয়ে আমার মাথাটা তাঁর হাতের উপর রেখে আমার শরীর তাঁর বুক আর পেটের বাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে চেপে ধরবেন। সারাদিন ধরে ছোট বলে মার বকুনি কপালে যা পড়ত, এই স্বর্গসুখ পেয়ে সব ভুলে যেতুম। সারাদিন ধরে মায়ের কাছে খেতুম শুধু বকুনি, বিধি-নিষেধ অথবা মার, এটা করো অথবা ওটা করোনা ইত্যাদি। এর পরে ঘটত আশ্চর্য ব্যাপার। রোজ সকালে দেখি রাত্তিরে যেখানে শুয়েছিলুম সেখানে আমি আর নেই। শোবার ঘরে মশারির তলায় বিছানায় আমি একা। কী করে যে এরকম হতো বুঝতে পারতুম না।

একদিন রাত্তিরে হঠাৎ উদ্বেগের কারণ ঘটল। গভীর অন্ধকারে তলপেটের নিচে গরম আরামের মতো অনুভূতিতে নড়ে চড়ে যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি সে গরম, আরাম বোধ আর নেই। তার বদলে তলপেটের নিচে ছোট পাজামাটা কেমন যেন ভিজে আর বিশ্রী ঠাণ্ডা। আমি সবসময়ে মা আর বাবার মাঝখানে শুতুম। ডান দিকে মা, বাঁদিকে বাবা। ডাইনে বাঁয়ে থাকত দুটি ছোট্ট পাশ বালিস। তার কারণ. আমি নাকি ঘুমের মধ্যে হাত পা ছুঁড়তুম. পাশ বালিস থাকত বলে মা বাবার গায়ে আমার লাথি কম লাগত। জেগে উঠে চোখ খুলে দেখি আমার বাঁদিকের বিছানা খালি। তবে কি আমার ভিজে পাজামার ছোঁয়া লেগে বাবা উঠে গেছেন! ওপাশ ফিরে দেখি মার অপর দিকে বাবা শুয়ে আছেন, দুজনেই ঘুমোচ্ছেন।

বাবার সব কিছুই আমার ভাল লাগত। বিশেষত অফিস থেকে ফিরে তিনি যখন আমাকে দু হাতে তুলে শূন্যে লুফে আবার দু হাতে খপ করে ধরতেন। কিন্তু তিনি যখন আমার মুখের উপর তাঁর সযত্নে ছাঁটা গোঁফ আর সারাদিনে গজানো দাড়িশুদ্ধ মুখ ঘষে আদর করতেন, তখন আমার গালে লাগত। দুজনকে পাশা-পাশি শুতে দেখে আমার ভয় হল, এইরে ঘুমের ঘোরে মায়ের গালে হঠাৎ যদি বাবার গোঁফ আর দাড়ি ঘষে যায়, তাহলে মায়ের নরম গালে ত বড় লাগবে! বেশ দুশ্চিন্তা হল, তবে মুহূর্তের জন্যে মাত্র, পরক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লুম। সকাল বেলা

উঠে ভিজে পাজামার দরুন ব্যাপারটা মনে পড়লেও মাকে জিগ্যেস না করাই সমীচীন মনে করলুম, পাছে আমার নিজের কুকর্ম ধরা পড়ে। আমরা যা ভাবি তার অনেক আগেই মানুষের আত্মরক্ষার সদ্বুদ্ধি গজিয়ে যায়।

রাঁচির কথা বিশেষ কিছু মনে নেই। শুধু মনে আছে ভোরবেলা বাবা মার সঙ্গে লাল কাঁকরের রাস্তা ধরে বেড়াতে যেতুম। রাস্তার দুপাশে থাকত লাল কাঁকরের উঁচু পাহাড়, বোধ হয় ফুট পাঁচ ছয় উঁচু হবে। তার মাথায় চড়ে মনে হতো যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় উঠেছি। একদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন মোরাবাদী পাহাড়ে সকলে মিলে গেছি মেলা দেখতে। পাহাড়ের মাঝ বরাবর উঠে দেখি একটি ছোট্ট সাদা মিনার। উঁচু ইটের বেদীর উপর চারদিকে চারটি সাদা থাম, উপরে ছোট্ট গম্বুজ করা ছাত। তার মধ্যে একটি সাদা বেতের চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মাথাভর্তি সাদা চুল। যতদূর মনে আছে বাবা বললেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নতুনদাদা। বাংলায় জ্যোতি কথার মানে তখন আমি শিখেছি। কথাটা খুব যথার্থ মনে হল, কারণ অস্তগামী সূর্য তাঁর চুলে আর মুখে পড়ে তাঁকে সত্যিই জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল।

তার পরের ঘটনাবলী, যতদিন না আমার পাঁচ বছর পূর্ণ হল, ভাল করে মনে নেই। শুধু আবছায়া মতো মনে আছে আসানসোলের দু-একটি কথা। বিরাট স্টেশনের কাছে ব্যারাকের মতো একটা লম্বা বাড়ির দোতলার একটি অংশে আমরা থাকতুম। রাত্তিরে দূরে রেলের ইয়ার্ডে খুব জ্বলজ্বলে সার্চলাইট জ্বলত। আমার একজোড়া নতুন জুতো হয়েছিল, সে-জোড়া আমি বাড়িতে শোবার সময়ে মাথার কাছে বালিশের পাশে রেখে শুতুম। বাবা আজকালের মতো একটি স্কুটার কিনেছিলেন, স্কুটারের সমুখে পাটাতনের উপর বাবার দুই হাতের বেষ্টনের মধ্যে আমি দাঁড়াতুম, বাবা আমাকে চালিয়ে নিয়ে ঘুরে আসতেন। তার পর আমরা শিলিগুড়িতে কিছুদিন ছিলুম। বঙ্গদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা হল দার্জিলিং। সেই জেলার শিলিগুড়ি মহকুমাটি শুধু সমতলভূমি, বাকি সব পাহাড়। শিলিগুড়ি মহকুমার সদর হচ্ছে শিলিগুড়ি শহর। বর্তমানে শিলিগুড়ি শহর বড় অগোছালো, ছড়ানো কিন্তু ঘিঞ্জি শহর, তার অধিকাংশই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এলোমেলো, বস্তির মতো অস্থায়ী বাড়িতে ভর্তি। কিন্তু ১৯২২ সাল নাগাদ শিলিগুড়ি ছিল একটি বড় গ্রাম। অধিকাংশ বাড়িই ছিল কাঠের রণপা'র মতো উঁচু উঁচু খুঁটির উপর তৈরি। রাস্তাগুলি ছিল সরু আর কাঁচা। তবে শিলিগুড়ি ছিল ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের উত্তর প্রান্তের ঘাঁটি। সেখান থেকে শুরু হয়েছে ছবির মতো আশ্চর্য দার্জিলিং

হিমালয়ান রেলওয়ে। আমার আবছায়া স্মৃতিতে আছে শুধু একটি কাঠের বাড়ি, কাঠের পায়ার উপর তৈরি। ভাগ্যক্রমে ১৯৪৪ সালে সে-বাড়িটি আমি চিনে বের করতে পারি। আরো মনে আছে একদিন রাত্রে ঘুম থেকে হঠাৎ দেখি মিশকালো একজন লোক, মুখে ভয়ানক হিংস্র দেখতে একটা ভুটানি মুখোশ আর আগুনের মতো লাল দুটো চোখ, একটা বিরাট ভাল্লুক নাচাচ্ছে। এখনও মনে আছে ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। সেই আমার প্রথম বহুরূপী দেখা।

শিলিগুড়ি থেকে বাবা জলপাইগুড়ি বদলি হন। সে সময়ে আমরা কলকাতায় যাই। তখনকার কলকাতার কিছু কিছু জটপাকানো স্মৃতি আমার এখনও মনে আছে। লিখতে পড়তে শিখেছি। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ' প্রায় সবটাই কণ্ঠস্থ। তার সঙ্গে কাশীরাম দাসের মহাভারতের বহু অংশ। বিশেষত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও অভিমন্যু বধ। ঐ দুটি অংশ আমার মনে চিরকালের মতো গভীর ক্ষত রেখে যায়। সেই থেকে আমার মনে ঘোর সন্দেহ, আমরা জাতি হিসেবে কতখানি জানকবুলভাবে নির্ভীক, সত্যরক্ষায় অটল আর আত্মসম্মানী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছুতেই মাথা নোয়াতে রাজি নই। শ্যামানন্দ রোডে মামাবাবুর বাড়ির উঠোনে চাঁদনি রাতে ছুটে যেতুম। মৃত্যুর পর অভিমন্যু চন্দ্রলোকে চলে যান, কাশীরাম দাস তাই বলেন। চাঁদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে অভিমন্যুর কথা ভাবতুম আর তাঁর শত্রুদের বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতার জন্য তাঁর কাছে একমনে ক্ষমা চাইতুম।

বস্ত্রহরণের কথায় মনে পড়ল। আমি জানতুম আমি ছেলে আর আমার চেয়ে আড়াই বছরের ছোট রাঙ্গামামার মেয়ে নেনি ছিল মেয়ে। কিন্তু কেন যে আমি ছেলে আর নেনি মেয়ে, আমার মাথায় ঢুকত না। একদিন মায়ের সেজ বোন, যাকে আমি খুব ভালবাসতুম আর সেজকী বলে ডাকতুম, তিনি আমাদের দুজনকে স্নান করিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ দেখি নেনির উরুসন্ধির কাছটা ঠিক আমার মতো নয়। নেনির কী যেন নেই যা আমার আছে। না থাকার জন্যেই কি নেনি মেয়ে, আর থাকার জন্যেই কি আমি ছেলে? আমি নিজেকে ভাল করে দেখে নিলুম। সেজকী আমাদের দুজনকেই গামছা দিয়ে গা ঘষে মুছিয়ে দিলেন। নেনি আমার দিকে পিছন করে গা মোছাচ্ছিল, মোছার পর ছুটে গিয়ে পাজামা পরল। আমি বয়সে বড়, তায় দাদা, সুতরাং আমার হুকুম নেনিকে মানতেই হবে। সময় বুঝে একলা পেয়ে আমি নেনিকে কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে পাজামা খুলতে বললুম। সত্যিই ত নেনির শরীর অন্যরকম। ব্যাপারটা সত্যিই চিন্তার বিষয়। কিন্তু বলেইছি ত, দুর্বুদ্ধি বেশ অল্পবয়সেই গজায়। মাকে এ বিষয়ে জিগ্যেস না করাই শ্রেয়, ঠিক

করলুম। দুঃখের বিষয়, এ যুগেও অনেক পরিবারে, মা বাবারা এসব ব্যাপার ছোট-দের এখনও ডালভাতের মতো সহজে বুঝিয়ে দেন না, যদিও আমার বিশ্বাস, শিশুর বয়স যত ছোটই হক তাকে এসব জিনিস বুঝিয়ে দেয়া চলে, এবং সে তফাৎ করতে শেখে, ঠিক যেমন চোখ, কান, নাক চিনতে শেখে। অল্প বয়স থাকতে থাকতে শিখিয়ে দিলে অনেক অহেতুক ঔৎসুক্য ও যন্ত্রণার হাত থেকে শিশুরা বাঁচে।

আমার মা আর দুই দিদি—বড়দি আমার চেয়ে সাতবছরের, ছোটদি সাড়ে চার বছরের বড়—এবং আমি মামাবাবুর বিয়েতে কলকাতায় এলুম। বিয়ের কথা খুব বেশী মনে নেই, তবে ট্রামে করে মেজমাসীমার শ্বশুরবাড়ি টালিগঞ্জে যাবার কথা মনে আছে। সেই আমার প্রথম ট্রামে চড়া। আর মনে আছে বিয়ের রাত্রে বরযাত্রীদের সঙ্গে নিতবর হয়ে গিয়ে বিয়ের আসরে বিয়ের পদ্য বিলি করার ভার আমার উপর ছিল। বিয়ের পদ্যের কাগজে পদ্য ছাড়া থাকত ছবি : উপরে প্রজাপতি, তার দুধারে ফুলের মালা আর ডানাওলা পরী। সে সময়ে সেজকীও শ্যামানন্দ রোডে ছিলেন। একদিন সেজকী আমাকে একান্তে টেনে নিয়ে চুপি চুপি জিগ্যেস করলেন, সেদিন বিকেলের ডাকে সেজ-মেসোমশাইয়ের চিঠি আসবে কিনা। যদি হাঁ বলি আর চিঠি আসে তাহলে আমি কি বকশিস পাব তাও বল্লেন। আমি কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকে বল্লুম, হাঁ। বেদবাক্য ফলে গেল। চিঠি এল। ফলে গণৎকার হিসেবে ফেরিওলার কাছ থেকে গরম মশলায় রান্না দু পয়সা দামের হাঁসের ডিমের ডালনা পেলুম, একেবারে অমৃত। তখনকার দিনে ফেরিওয়ালারাও ভেজাল দিত না। কর্পোরেশন থেকে যখন তখন পরীক্ষা করত। দুঃখের বিষয় পরের বার আমার বেদবাক্য আর ফললো না।

মামাবাবু আর আমি ছাড়া বাড়ির আর সকলে ছিলেন মহিলা—দিদিমা, মা, মেজ, সেজ, ছোট মাসিমা, আমার দুই দিদি। সুতরাং আমার দর তখন অনেক। আমার পঞ্চম জন্মতিথির আগের দিন সরস্বতীপুজার শ্রীপঞ্চমী তিথি এল। ঐ দিন শিশুর হাতেখড়ি হবার প্রশস্ত দিন। সেদিন হাতেখড়ি হলে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবার সম্ভাবনা থাকে। বাড়িতে শোরগোল পড়ে গেল। সেজকী আমার জন্য ছ-হাত লম্বা একটি ধুতি শিউলি ফুলের বোঁটার রঙে ছুপিয়ে দিলেন। আমার পাঞ্জাবি ছুপিয়ে দিলেন বাসন্তী রঙে। বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি এখনও আমার একচেটিয়া। আমার বন্ধুবান্ধব, দূর থেকে যদি দেখেন কেউ ঐ রঙের পাঞ্জাবি পরে আসছে, ধরেই নেন যে আমি আসছি। মামাবাবু একটি ছোট নতুন স্লেট আর প্রকাণ্ড এক ডাং-গুলির মতো রামখড়ি কিনে আনলেন। রামখড়িটি পেটমোটা, দুদিকে ছুঁচোলো, ঠিক মোটা চুরুটের মত। সেজকীর চিত্ত সদা আশঙ্কাময়। ধুতিটি আমার কোমরে

গিঁট দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ত দিলেনই, তার উপরে আবার বাঁধলেন শক্ত ফিতে দিয়ে। পাছে ধুতি খুলে পড়ে আমার দিগম্বর শোভা বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির পুরোহিত ঠাকুর থাকতেন আমাদের বাড়ির পিছন দিকে বেলতলা রোডের কোণে। এখন যেখানে মৃণাল সেন থাকেন। মামাবাবুর হাত ধরে সেখানে গেলুম। পুরুত ঠাকুর আমাকে আগে দেখেছেন। আদর করে যতই আমাকে কোলে বসাতে যান, ততই ঢাকের মতো প্রকাণ্ড আর গোলগাল তাঁর ভুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে, কোল থেকে ছিটকে আমি মাটিতে পড়ি। অবশেষে উনি আমাকে তাঁর গোড়ালির উপর বসিয়ে, আমার হাতে রামখড়ি গুঁজে দিয়ে, আমার হাতের মুঠো নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে অ আ দুই অক্ষর শ্লেটে লিখিয়ে দিলেন। যদিও তার অনেক আগে আমি ভালই লিখতে শিখেছি, তবুও এই হল আমার আসল হাতে খড়ি। তারপর তিনি আমায় মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। মহাবিক্রমে বাড়ি ফিরে এলুম।

ঠিক কবে যে বাবা কয়েকমাসের ছুটিতে আমাদের নিয়ে কার্সিয়াং শহরে কয়েকমাস কাটান তা আমার মনে নেই। কার্সিয়াং হচ্ছে দার্জিলিং-এর মহকুমা শহর। নিচে শিলিগুড়ি আর পাহাড়ে রাস্তার শেষ প্রান্তে দার্জিলিং শহরের মাঝামাঝি। কার্সিয়াং তখন ছিল একটি ছোট গ্রাম, সমুদ্রতট থেকে ৪৮০০ ফুট উঁচুতে। লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। চতুর্দিকে ঘন বন, গাছপালা। উত্তর ও মধ্যবাংলার মাঝারি শ্রেণীর জমিদারদের শৈলাবাসভূমি। যাঁরা নাকি দার্জিলিং-এর রাজা মহারাজাদের সান্নিধ্য থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, কৌলীন্য ও মর্যাদা বজায় রাখতে উৎসুক, তাঁরা। আমার কার্সিয়াং-এর স্মৃতি খুবই ক্ষীণ। তবুও নেপালী বন্ধুদের কাছে বড়াই করে বলতে ভাল লাগে যে শৈশব থেকেই আমি দার্জিলিংএর মানুষ। অবশ্য মনে রাখার মতো বিশেষ কিছু ঘটেওনি। হিল কার্ট রোডের একটু উপরে ছিল কাঠের একটি ছোট্ট নতুন বাড়ি। সারা বাড়িতে নতুন চেরা কাঁচা পাইনকাঠের গন্ধ। তার সঙ্গে দরজা জানালায় নতুন রঙের। শরৎকালের হাল্কা, ঝলমলে কিন্তু ম্লান রোদ। মনে পড়ে একদিন বিকেলবেলা এক মোটাসোটা মেমসাহেব এলেন। গায়ে লম্বা সাদা গাউন, গলায় জপের মালা, তার তলায় মালায় লাগানো একটি ঝোলানো ক্রস। খানিকটা অ্যানি বেসান্টের মতো চেহারা আর চুল। সেই সময়ের কথা মনে আছে এই কারণে যে গন্ধ, স্পর্শ, আলো, শব্দ, হাওয়া সব মিলিয়ে এমন এক অখণ্ড অনুভূতির সমন্বয় হয়, যার বর্ণনা আমি পরে প্রুস্তের লেখাতেই সম্যকভাবে পাই।

জলপাইগুড়ি জেলা বঙ্গদেশের সমতল ডুয়ার্স নিয়ে তৈরি, শিলিগুড়ি মহকুমার

সমতল দেশ ছাড়া। তার সদর শহর জলপাইগুড়িতে ১৯২২-২৪ সালে আমরা ছিলুম। বিশ দশকে যে-সব জেলা শহরে আমি ছেলেবেলা কাটিয়েছি তাদের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহরই প্রথম যার চৌহদ্দির ছক মোটামুটি আমার মনে গেঁথে আছে। তার আগে অবশ্য মাত্র শিলিগুড়ি ও কার্সিয়াঙেই অল্প সময় কাটিয়েছি। জলপাইগুড়ি শহর তখন বেশ ছোট ছিল। তার পাঁচ বছর পরে বর্ধমান শহর যেমনটি দেখি সেরকম মোটেই সাজানো গোছানো নয়। তা সত্ত্বেও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলাদা-আলাদাভাবে বেশ বোঝা যেত। যেমন সরকারি এলাকাটি ছিল যাকে বলা যায় হৃৎপিণ্ড, উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়া এবং খেটেখাওয়া জনতার বসতিগুলি ছিল হাত পা। তা ছাড়া ছিল পাইকারি ও খুচরো আর কাঁচা-তরকারি-মাছ-মাংসের বাজার এলাকাগুলি। ছিল গাড়িঘোড়ার, বাসের আড্ডা, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, থানা, স্কুল ইত্যাদি। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ছিল বিরাট চায়ের গুদাম। দেশী যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর, ছিল বিস্তর লরী, কিন্তু রাস্তাঘাট ছিল প্রায় সবই কাঁচা। আমাদের বাড়িটি ছিল রাস্তার এক ধার ধরে সার-সার হাতাওলা একানে একতলা বাড়ির মধ্যে একটি। রেলস্টেশন থেকে সে-রাস্তা অফিসপাড়ায় গেছে। প্রত্যেক বাড়ির ভিতরে ছিল উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অন্দরের বড় উঠোন। বাইরের হাতার চারদিকে পাঁচিলের ধারে ধারে সুপুরিগাছের সারি। সদর রাস্তার উপর পাঁচিলের মাঝখানে একটি ছোট গেট। সব বাড়িতেই টিনের ছাত ; কারণ, বছরের চার মাস ধরে প্রতি রাত্তিরে জল-প্রপাতের মতো অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ত।

তিস্তার শাখা করলা নদীর ধারে ছিল অফিসপাড়া। উত্তরবঙ্গের প্রধান নদ তিস্তা, শহরের আরো পুব দিয়ে করলার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণভাবে বয়ে গেছে। প্রধান বাজারটি ছিল ছোট, নোংরা, এলোমেলো এবং কাঁচা ঘরবাড়িতে ভর্তি, সবেরই হয় কাঠ, নয় মুলিবাঁশের দেয়াল। কিন্তু বাজারটি ছিল সর্বদা বহুরকমের জিনিসে ঠাসা। রাস্তাতেই একটি বড় হাইস্কুল ছিল, নাম ফণীন্দ্র দেব ইন্‌স্টিটিউশন, পড়াশুনায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছিল খুব সুনাম। স্কুলটি ছিল আগাগোড়া কাঠ ও বাঁশের তৈরি, ভিতটি শুধু পাকা। একদিন গভীর রাতে হঠাৎ আগুন লেগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে ছাই হয়ে গেল। আমাদের বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ ধরে সে-আগুনের মস্তমস্ত লকলকে জিভ দেখা যাচ্ছিল। সুনীতিবালা চন্দ'র নামে মেয়েদের একটি স্কুলও তখন গড়ে উঠেছে। নামকরা সাংবাদিক চঞ্চল সরকারের মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরা আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় আধমাইল দূরে একটি লাল ইটের দেয়ালের বাড়িতে থাকতেন। বাবার বন্ধুদের অনেকের বাড়ি ফণীন্দ্র দেব স্কুলের রাস্তার

উপরে ছিল। এই সব নিশানা মনে থাকায় আমি যখন ১৯৪৪ সালে আবার জলপাইগুড়িতে জজ শ্রীকরুণাকুমার হাজরার কাছে মুন্সেফি কাজ শিখতে যাই তখন অনেককিছু খুঁজে বের করতে সুবিধা হয়। তবে তিস্তা নদী ১৯২২ সালে শহর থেকে যত দূরে মনে হতো, ১৯৪৪ সালে গিয়ে দেখি ততদূরে মোটেই নয়। বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের প্রকাণ্ড মাঠে ছেলেবেলায় যেখানে পুজোর মেলা বসত, সেখানে ১৯৪৪ সালে দেখি সবটাই বসতি হয়ে গেছে। এক কথায় বলতে গেলে জলপাইগুড়ি ছিল আঁটসাঁট, শান্ত, মোটামুটি গোছানো শহর, বড় গ্রামের মতোই বলা যায়। এখনকার জলপাইগুড়ির মতো ছড়ানো, ঘিঞ্জি শহর মোটেই নয়।

এই সময় থেকেই আমার দুই দিদি আমার জগতে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলেন। বাবা-মায়ের প্রথম ছেলে হিসেবে আমি নিশ্চয় আবদারে বা আদুরে সন্তান ছিলুম, ফলে নিশ্চয় স্বার্থপর হয়ে উঠেছিলুম, তা না হলে শৈশবস্মৃতিতে দিদিদের স্থান এত সংকীর্ণ কেন হবে। এখন থেকে অবশ্য তাঁরা আমার জীবনে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠলেন, কারণ যত বড় হয়ে উঠছি, আমার দুষ্টুমি তত বাড়ছে, মায়ের হাতে শাস্তির থেকে উদ্ধারের জন্যে বিপিন আর দিদির প্রয়োজন আমার বাড়তে লাগল। প্রয়োজনেই মানুষের কদর বাড়ে। আমার বড় দিদি, অমিয়ার, সৌন্দর্যের যশ তখনই চারদিকে ছড়িয়েছে, চোদ্দ পনেরো বছর বয়সেই তাঁর ঘনঘন বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। আমার দিদিমা আদর করে বড়দির নাম রেখেছিলেন নন্দরাণী, তার থেকে ডাক নাম হল নন্দা। মায়ের চেয়েও বড়দি যেন আমার বেশী যত্ন নিতেন, তাঁর বকুনি আর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতেন। দিদি ছাড়া ছিল বিপিন, আমাদের পরিবারের প্রাচীন ভৃত্য, নিশ্চিত শাস্তির হাত থেকে আমার ত্রাণকর্তা। তাঁর সামনে মা মাথার উপর ঘোমটা টেনে দিতেন, সোজাসুজি কথা বলতেন না, দিদি বা ছোটদিকে দিয়ে তাঁর কথা জানিয়ে দিতেন। যখনই কোন কারণে মায়ের হাতে উত্তম মধ্যম প্রহারের সমূহ উপক্রম হয়েছে, তখনই হঠাৎ আকাশবাণীর মতো কানে এসেছে বিপিনের গলা; 'মানি (ঐ নামেই বিপিন আমাকে ডাকতেন) চলে এসো, আমার কাছে চলে এসো।' প্রাণভয়ে দৌড়ে বিপিনের কোলে চড়তুম। বিপিনকে দেখে পরাজয় স্বীকার করে মা মাথার উপর ঘোমটা টেনে, অস্ফুটস্বরে শাসাতে শাসাতে চলে যেতেন। শাস্তির বয়ান ছিল 'এমন মার খাবে যে হাড় একদিকে, মাস একদিকে'; তার মানে যে কি ঠিক বুঝতুম না, তবে ভীষণ একটা কিছু, সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

বড়দিদিকে আমি দিদি ডাকতুম। ছোটদিদির নাম ছিল ইন্দিরা, ডাক নাম ছিল খুকি। সুতরাং আমিও খুকি ডাকতুম। দিদি ডেকে স্বীকার করতুম, শুধু

বিজয়ার সময়ে : ছোট দিদি আমার কাছ থেকে প্রণাম আদায় করত, এবং ছোটদি বলতে হতো। দিদির ছিল গানের গলা। গাইতেন চমৎকার। তার সঙ্গে বাজাতেন এস্রাজ। যখন এস্রাজ বাজাতেন, পাড়ার লোকেরা বলত সাক্ষাৎ সরস্বতী। ছোটদি ছিলেন কালো; তবে মুখে সর্বদা খৈ ফুটছে, পড়াশোনায় ভাল।

মায়ের প্রতি ভয় দিয়ে আমার দিন শুরু হতো। দিন শেষ হতো সন্ধ্যায় তাঁর প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তিতে। মাকে সবচেয়ে ভাল লাগত যখন বিকেলবেলা গা ধুয়ে স্নানের ঘর থেকে বেরোতেন, গায়ে লেগে থাকত ভিনোলিয়া সাবানের গন্ধ। পরণে বাড়িতে কাচা শাড়ি। বেরিয়ে এসে মুখে একটু হেজলীন স্নো মেখে, বাঁধা খোঁপার উপর হাল্কাভাবে চিরুনী বুলিয়ে সিঁথিটি ঠিক করে নিতেন। ছিলুম ছোট্ট, মুখ পৌঁছতো তাঁর কোমর পর্যন্ত, তাই শরীরের উপরের অংশের থেকে কোমর থেকে পা পর্যন্তই বেশী চিনতুম। যখন একটু বড় হলুম, বুঝতে পারলুম আমার দিদিমার গড়নই মা বেশী পেয়েছিলেন। আরো যখন বড় হলুম তখন বুঝলুম দিদিমা ছিলেন মায়ের চেয়ে বেশী সুন্দরী। গত পঞ্চাশ বছরে বাঙালী মেয়েদের উচ্চতা যে বেশ খানিকটা বেড়েছে তা বোঝা যায়, তবে সে যুগের তুলনায় মা লম্বা ছিলেন, প্রায় পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি। কোমর ছিল সরু, গায়ে অযথা মেদ ছিল না। বিশেষ করে চোখে পড়ার মতো উঁচু বুক তাঁর ছিল না, কিন্তু কোল ছিল প্রশস্ত, বেশ মজা করে কুণ্ডলী পাকিয়ে আমি তার মধ্যে শুতুম। ছোট বয়সে প্রতিবছর মাস ছয় সাত সিমলার পাহাড়ে চড়ে ঘোরার ফলে তাঁর পায়ের গোছ আর ডিম ছিল মোটা, সুডৌল, সুঠাম। হাত পা ছিল লম্বা লম্বা, হাড়ালো, মাপ ছিল সুন্দর। দিদিদের মধ্যে কেউই, আমি ত বটেই, তাঁর লম্বাটে মুখ, উঁচু নাক, সুচারু পেলব ঠোঁট, মুখের হাঁ, বা হাত পা পাইনি। পাবার মধ্যে আমি শুধু পেয়েছি তাঁর গালের উঁচু হাড়, থুতনির গড়ন, আর কিছুটা চোখ। মুখের তুলনায় তাঁর চোখ ছিল সামান্য ছোট, কিন্তু তাঁর চোখের পাতার তুলনায় আমার চোখের পাতা অনেক বেশী ভারি আর ফুলো। দুদিকের রগ দেখলে মনে হতো তাঁর আধকপালে মাথা ধরার রোগ ছিল, আমার যা আছে। তাঁদের প্রথম ছেলে হয়ে আমি বাবার বা মায়ের চেহারার ভাল দিকটা কিছু পেলুম না ভেবে দুঃখ হয়। তাঁদের যা কিছু ভাল সব কি আমার বড়দি আর ছোট ভাইয়ের ভাগ্যেই জুটল!

বিকেলের দিকে জলপাইগুড়িতে দিদি রোজ গান শিখত। মাস্টারমশাই করুণাবাবু সন্ধ্যার পর এসে আমাদের তিনজনকে সাহিত্য আর অঙ্ক শেখাতেন। তাঁর কালো গোলগাল, চশমাপরা মুখ আমার এখনও ভালভাবে মনে আছে। চার্লস্ ল্যামের বই থেকে আমরা শেক্‌স্‌পিয়রের গল্পগুলি প্রায় সবই শিখে

ফেললুম। বয়স যখন আট পূর্ণ হয়েছে তখন আমাকে করুণাবাবু ইংরেজিতে চার্লস্ ল্যামের মিডসামার নাইটস্ ড্রিমের গল্পটি নিজের কথায় লিখতে বল্লেন। ১৯৭২ সালে বাবা মারা যান, ততদিন পর্যন্ত তাঁর হাতবাক্সে আমার লেখা গল্পটি সযত্নে রাখা ছিল। প্রতিদিন পড়া শুরুর আধঘণ্টা পরে ভিতরের ঘর থেকে মা দিদিকে ডেকে বলতেন করুণাবাবুর চা নিয়ে যেতে। প্রতিদিনই ডাক শুনে করুণাবাবু ঘাড় নিচু করে পর্দার তলা দিয়ে ওঘরে কিছু দেখা যায় কিনা দেখতেন। তাঁর ঝুঁকে নিচু হয়ে দেখা দেখে ছোটদি মজা পেত। একে এঁচড়ে পাকা ছাড়া আর কি বলা যায় বলুন।

বসার ঘরের দেয়ালের চারদিকে বাংলার বিখ্যাত সন্তানদের বাঁধানো ছবি সার সার করে টাঙানো থাকত। ফলে আমরা অনেক মনীষীর চেহারা চিনলুম; যেমন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর স্বামী বিবেকানন্দ ত বটেই। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন বলে তাঁর ছবি ছিল না। জানি না, সব বাড়িতেই এরকম থাকত কিনা।

এই সময়ে আমি বুঝতে শিখলুম বাবা কিভাবে তাঁর বাইরের জীবন আর নিজস্ব পারিবারিক জীবনের মাঝখানে রেখা টানতেন। জীবন শুরু করেন সাবডেপুটি হয়ে। নিছক কাজ দেখিয়ে সময়মত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। বাইরে তিনি সরকারের সমস্ত নিয়ম মেনে চলতেন, নিজে ত বটেই, পরিবারের সকলের জন্যে। কিন্তু বাড়িতে তিনি সংসারের জন্যে স্বদেশী ছাড়া অন্য কিছু কিনতেন না। যেমন, বাড়িতে গায়েমাখা সাবান নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাবার সর্বদা বাদানুবাদ চলত। বেঙ্গল কেমিক্যালের টার্কিশ বাথসোপ ছাড়া বাবা কিছু কিনবেন না। তুর্কিদের চামড়া কিরকম হতো তা জানি না, কিন্তু ঐ নামের সাবান তখন প্রায় সবটাই চুনের ডেলা হতো, ফেনা প্রায় হতোই না। মায়ের নরম চামড়ার জন্যে যে সে-সাবান উপযুক্ত নয় তা আমার মতো শিশুও বুঝত। তাঁর মনের মতো সাবান ছিল ভিনোলিয়া, যতদিন না হিমানী গ্লিসারিন বাজারে এল। আগেই বলেছি কী কারণে বাড়ির সব কাপড় যতদুর সম্ভব বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের হতো। প্রবাসী আর মডার্ন রিভিউ মাসিক পত্রিকা নিয়মিত ডাকে আসত। এই দুটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দুটি পত্রিকাই ছিল তখনকার দিনে সংস্কৃতি, সুরুচি আর মার্জিত ভাষার শেষ কথা। দুই পত্রিকা থেকে পাঠকরা কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ সে বিষয়ে শিক্ষা আহরণ করতেন। উপরন্তু ষাট বছর ধরে পত্রিকাদুটি স্বদেশী আন্দোলনের মুখপত্র, তা ছাড়া সারা দেশে বেঙ্গল স্কুল

মারফৎ যে নতুন চিত্ররীতি এল তার বাহক। রাজনৈতিক সংগ্রামবিষয়ে বাবা এই দুই পত্রিকার সঙ্গে ছিলেন একমত। এ দুটি পত্রিকা ছাড়া নিয়মিত আসত জলধর সেন সম্পাদিত ভারতবর্ষ। শরৎবাবু থেকে শুরু করে সব বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখকদের লেখা থাকত। অন্যদিকে বাবার আদেশে বাড়িতে নুন তৈরি করা অথবা চরখা, তকলি কেটে সুতো তৈরি করা ছিল বারণ। আমি নিজের জন্যে প্রথম খাদি ধুতি কিনি ১৯৩২ সালে আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার স্কলারশিপের টাকা দিয়ে। অবশ্য একটি ধুতি কেনার পরই বুঝলুম খাদির চেয়ে ঐ টাকায় বই কেনা অনেক ভাল।

জলপাইগুড়িতে ডান পাশের বাড়িতে থাকতেন, পুলিশের দবিরুদ্দিন সাহেব। তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার ছিল খুব ভাব। ঈদের দিন তাঁদের বাড়িতে ভাল বিরিয়ানির স্বাদ কী, তা জীবনে প্রথম জানলুম। তবে সবাই মিলে একই থালা থেকে খাওয়ার ব্যাপারে আমার সঙ্কোচ ছিল, কারণ আমাদের বাড়িতে পরের এঁটো খাওয়া ছিল বারণ। ঐ বাড়িতেই আমি জীবনে প্রথম টিনের জ্যামও খেলুম। বেশ মনে আছে টিনের গায়ে কাগজের উপর বড় বড় করে তিনটি অক্ষর লেখা ছিল, আই-এক্স-এল। দবিরুদ্দিন সাহেবের ছেলে একদিন খোলা টিন নিয়ে এসে তার তলা চেঁচে চামচে করে আমাকে খানিকটা দিল। বলল, সাহেবরা খায়, তাই তাদের গায়ে এত জোর হয়। মুখে ঠেকাতেই মনে হল, আমারও গায়ে বেশ জোর হয়েছে। সেই থেকে সবসময় নতুন আর উদ্ভট খাবারে আমার আগ্রহ, যদিও অনেক সময়ে পালোয়ান না হয়ে, পেটের অসুখে ভুগেছি।

দুটি ঘটনা এখনো আমার খুব মনে আছে। একটি হচ্ছে ১৯২৪ সালে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত ভাইস চ্যান্সেলর। পরের মাসে ভারতবর্ষে অতুল বসুর আঁকা তাঁর প্রতিকৃতি বের হল, নাম বাংলার ব্যাঘ্র। সংবাদে মা অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। বাংলার ত বটেই, আশুতোষ আমার মামাবাবুকে খুব স্নেহ করতেন, তাঁর মৃত্যুতে মামাবাবু বিরাট মুরুব্বি হারালেন। দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে জলপাইগুড়ির বারোয়ারি দুর্গাপূজা। বৈকুণ্ঠপুর রাজের বদান্যতায় তাঁদের মাঠে এই পূজা হতো। সর্বপ্রধান ঘটনা ছিল মোষবলি। বড় এক পিপে ঘির সবটুকু আস্তে আস্তে মালিশ করে মোষের ঘাড় নরম করা হতো। শেষে বলির ক্ষণের আগে মোষের কানে সর্ষেদানা ঢালা হতো। কেন যে হতো তার কারণ আজও জানতে পারিনি। হয়ত কানে সর্ষে ঢাললে মোষ খেপে গিয়ে লম্ফঝম্ফ করে ক্লান্ত হলে বলির সুবিধা হবে এই আশায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেবার মোষটি এত বেশী দাপাদাপি করে যে দড়ি ছিঁড়ে জ্ঞানশূন্য

হয়ে সে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। ফলে সকলে প্রাণভয়ে যে যার ছুটে পালিয়ে যায়। সেবার আর মোষবলি সম্ভব হয়নি।

তৃতীয় একটি ঘটনা নিয়ে আমাদের পরিবারে এখনও আলোচনা হয়। জলপাইগুড়িতে বর্ষাকালে এত বৃষ্টি হতো, বিশেষত রাত্রে, যে বাইরের দিকের প্রতিটি দেয়াল, বর্ষা শুরু হবার দু-তিনদিনের মধ্যে পুরু হড়হড়ে শ্যাওলায় উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ভরে যেত। সব বাড়ির ছাত হতো টিনের। ছাতের উপর বৃষ্টি পড়ে জলপ্রপাতের মতো শব্দ হতো। বাবা মায়ের সঙ্গে আমি পূবের ঘরে শুতুম। দিদিরা শুতেন পশ্চিমের ঘরে, মধ্যে একটি সরু হল। সব দরজা জানালায় ভাল করে খিল, ছিটকিনি লাগানো হতো। উঠোনের খিড়কী দরজা ত বটেই। উঠোনের একটি ঘরে বিপিন শুতো। ঘুম থেকে আমাকে উঠিয়ে তোলা এক বিষম কাজ, প্রায় অসম্ভব। হঠাৎ একদিন রাতে জেগে উঠে শুনি বাবা খুব চেঁচিয়ে আমার দুই দিদিকে বাইরের দরজা খুলতে বারণ করছেন। বাবা তারপর নিজে বিছানা থেকে উঠে, দরজা না খুলে উঠোনে কিছু আছে কিনা দেখতে গেলেন। শুনলেন দরজার ওপাশে কে যেন কাকুতিমিনতি করে কান্নার সুরে ক্রমাগত বলছে, আমি হালিমন, দরজা খুলুন, খানা এনেছি। বাবা প্রথমে জানালা খুলে দেখে নিলেন আর কেউ হালিমনকে সমুখে রেখে অপেক্ষা করছে কিনা। আর কেউ নেই সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলে দেখেন, সত্যিই শুধু হালিমনই আছে। হালিমন ছিল দবিরুদ্দিন সাহেবের দাসী। বেচারী যাকে বলে সত্যিকারের হাবাগোবা। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে মাটিতে জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে, ঠিক জ্ঞান নেই। দবিরুদ্দিন সাহেবকে ডেকে উঠিয়ে হালিমনকে তাঁর বাড়িতে পাঠানো হল।

সকালবেলা তদন্ত শুরু হল। আমাদের বাড়ির উঠোনের চারদিকে ছিল উঁচু পাঁচিল। হালিমনের পক্ষে নিজে নিজে সে পাঁচিল টপকানো অসম্ভব। অন্যদিকে, দবিরুদ্দিন সাহেব নিজেই বল্লেন তাঁর বাড়ির প্রতিটি দরজা জানালা ভিতর থেকে খুব ভাল করে খিল দেয়া ছিল, ঠিক আমাদের বাড়ির মতো। হালিমন বলল কে যেন তাকে এসে বলল দবিরুদ্দিন সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে। কেমন করে বের হল বলতে পারে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেয়াল টপকিয়ে কে যেন তাকে বাগচী বাড়ি নিয়ে গেল। বাগচী বাড়ি, দবিরুদ্দিন সাহেবের বাড়ি আর আমাদের বাড়ির উত্তর দিকের পাঁচিলের ওপাশে। বাগচী বাড়ির কোন্ ঘরে কে শুয়ে আছে হালিমন তার বর্ণনা দিল। হালিমন মুসলমান, বাগচীরা ব্রাহ্মণ। হালিমন তাঁদের বাড়ি কখনও যায়নি। সুতরাং বাগচীবাড়িতে কে আছে, কোথায় শোয় হালিমনের মোটেই জানার কথা নয়। অথচ হালিমনের কথা সব মিলে-

গেল। তারপর হালিমনকে শাসিয়ে কে আবার বলল দেয়াল ডিঙিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বড়দিকে ডেকে দরজা খুলতে বলতে। আরো বলতে যে খাবা এনেছে। কী করে যে এসব হালিমন করল, কিছুতেই বলতে পারল না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোন বাড়িতেই পাঁচিলের শ্যাওলায় কোথাও কোন আঁচড়ের দাগটি পর্যন্ত নেই। কী, করে সে এতগুলি অসম্ভব কাজ করল, তার কোন সদুত্তর আজও আমরা কেউ দিতে পারলুম না।

জলপাইগুড়ি আমার জীবনে প্রথম প্রবাসস্থান যেখানকার অনেক লোককে আমার স্পষ্ট মনে ছিল এবং আছে। দাজু সেন ছিলেন আমাদের নেতা। তিনি পরে হন জেলার সেরা চা-বাগান মালিক। তেমনি ছিল তাঁর দরাজ বুক। ১৯৪৪ সালে যখন আবার জলপাইগুড়ি যাই তখন আমি বাবার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে নমস্কার জানাই। একজন ছিলেন শ্রী অন্নদা সেন, দাজুদার বাবা। অন্যজন শ্রী তারিণীপ্রসন্ন রায়, তাঁর ভগিনীপতি। দুজনেই আমাদের সকলকে নিয়ে কী যে করবেন, যেন ভেবে পেতেন না। এঁদের দুজনের মধ্যে আবার অন্নদাবাবু খুব জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। সারাদিন তাঁর কী করে কাটে, তার বিশদ বিবরণ একদিন দিলেন। বাহাত্তর বছর বয়সেও দিনে দশ বারো ঘণ্টা খাটতেন। সেই শক্তির উৎস কী ছিল তার উত্তর মজার। সকালবেলা অনেকক্ষণ ধরে বাইরে হেঁটে এসে তিনি বেশ বড় কয়েক কাপ চা খেয়ে একেবারে পেট খোলসা করে প্রাতঃকৃত্য করতেন। মন্ত্রটি বোধ হয় সকলের পক্ষেই খাটে।

স্কুলের জীবন

আজকাল, শুধু ছেলেমেয়েরা কেন, অনেকেই শুনে অবাক হবেন, আমি আট বছরের আগে স্কুলে যাইনি। আজকাল যখন দেখি তিন চার বছরের ছেলেমেয়েরা পিঠের উপর দু তিন কিলো ওজনের বইয়ের বোঝায় পিঠ নুইয়ে স্কুলের বাসের জন্যে মা-বাবাদের সঙ্গে করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, তখন তাদের জন্যে বড় কষ্ট হয়। মা-বাবাদের জন্যেও হয়, কারণ তাঁরাও লক্ষ্মণের ফলের মতো ছেলেমেয়েদের জলের বোতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন, বাচ্চারা বাসে উঠলে তাদের হাতে দেবেন বলে। তবে আমাদের সময়ে ত মায়েরা বাড়ির বাইরে কাজ

করতে যেতেন না, আর 'দুই সন্তানের পরিবার সুখী পরিবার' এই জিগিরেরও চল হয়নি। আরেকটি কথাও আছে। আমার আট বছর বয়স অবধি বাড়িতে থেকেও যে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতুম, আজকাল আড়াই তিন বছর বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা স্কুলে তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ ও স্বাধীনতা ভোগ করে। বাড়িতে থাকলে এটা করো, ওটা কোরো না জাতীয় বাধানিষেধের ঠেলায় সব ছেলেমেয়েরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার দাখিল হয়।

১৯২৫ সালের প্রথমে আমরা জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং-এ চলে যাই। সেখানে মিউনিসিপাল মার্কেটের নিচে চাঁদমারি পাড়ায় 'নুক' বলে একটি বাড়ির দোতলায় আমরা উঠলুম। সে সময়ে যে অল্প কয়েকটি কংক্রিটের বাড়ি ছিল, নুক ছিল তার মধ্যে একটি। বাড়ির মালিক ছিলেন হরিসত্ত্ব রায়। যাবার পরেই ম্যাকেঞ্জি রোডের উপর মহারানী গার্লস্ স্কুলের ফোর্থ ক্লাসে (এখনকার ক্লাস সেভেন) খুকি, অর্থাৎ আমার ছোটদি, ভর্তি হয়। তখনকার দিনে স্কুলবাড়িটি ছিল কুচবিহার রাজের সম্পত্তি, নাম ছিল নর্থ-ভিউ বিল্ডিং। শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা সরকার ছিলেন হেড মিস্ট্রেস।

১৯২৫ সালে দার্জিলিং ছিল যেন স্বপ্নপুরী, বিশেষত জুলাই মাসে। তখন যদিও সবচেয়ে বেশী লোক বেড়াতে আসত, তা সত্ত্বেও শহরটি মোটেই ঘেঞ্জি মনে হতো না, সদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখাত। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বাড়ি রঙ করে ঝকঝকে অবস্থায় রাখতেন, কারণ অধিকাংশ বাড়িতেই টাকা নিয়ে টুরিস্ট রাখা হতো। থাকতে বেশী পয়সাও লাগত না। পূর্ব ভারতের অধিকাংশ বড় বড় জমিদারদেরই দার্জিলিঙে নিজস্ব বাড়ি ছিল। প্রতি গ্রীষ্মে তাঁরা অন্তত কিছুকাল এসে থাকতেন গভর্নরের সঙ্গে দেখা করার আশায়। এর ফলে দার্জিলিঙে আদি বাসিন্দাদের সব স্তরেই অনেক উপার্জন হতো। দার্জিলিঙের মল-এ নিত্য লেগে থাকত বড়লোকদের ফ্যাশনের হিড়িক। নেপালী সাহিত্যে ও শিল্পেও তখন বেশ রমরমা অবস্থা।

খুকি স্কুলে ভর্তি হবার অল্পকালের মধ্যেই বাবা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। শ্রীমতী হেমলতা সরকার তাঁর অফিস ঘরে বাবাকে বসিয়ে আমাকে তাঁর মেয়ে শ্রীমতী মীরা সরকারের কাছে নিয়ে গেলেন। শ্রীমতী মীরা সরকারের ডাক নাম ছিল খুকু। অনেক বছর পরে তিনি শ্রীহিরণকুমার সান্যালকে বিয়ে করেন। মীরা সরকারকে আমরা খুকুদি আর হিরণবাবুকে হাবুলদা বা হাবুলবাবু বলেই বরাবর জানি। হাবুলবাবুর মতো লোক আমি খুব কম দেখেছি। যেমন মস্তিষ্কে, তেমনি আলাপে তীক্ষ্ণ। একদিকে যেমন বন্ধুবৎসল, অন্যদিকে তেমনি চিন্তাশীল,

সুসাহিত্যিক, সুরসিক, অথচ কোন প্রাজ্ঞবিজ্ঞ, হাম্বড়া ভাব নেই। ১৯২৫ সালে খুকুদির বয়স কুড়ির বেশী ছিল না। তা হলে কি হবে। আমাকে দেখামাত্র কোলের উপর বসিয়ে ইংরেজি এবং সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। একটু পরে শ্রীমতী উষা দাশগুপ্ত আমাকে নিয়ে গেলেন অঙ্কে আর ভূগোলে আমার কতখানি জ্ঞান বাজিয়ে নিতে। শ্রীমতী দাশগুপ্তর স্বামী কলম্বোয় বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। খুকুদি আর মিসেস দাশগুপ্ত দুজনে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে আমাকে আজকালকার ক্লাস ফোরে, তখনকার সেভেন্থ ক্লাসে ভর্তি করে নিলেন।

প্রথম দিন থেকেই আমার স্কুল ভাল লাগল। বাড়িতেও ইজ্জত বেড়ে গেল, এতদিন স্কুলে যেতাম না বলে সকলেই যেন কৃপা করত। খুকি ছিল উঁচু ক্লাসের মেয়ে, নিচু ক্লাসের ছোট ভাইকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে, এতে আত্মসম্মান হানির সমূহ সম্ভাবনা। বাড়ির কাছেই থাকত সহপাঠী সৌরীন, অতএব তার সঙ্গেই স্কুলে যেতুম, ফিরতুম। আমাদের ক্লাসে ছিল তিনজন মেয়ে, তিনজন ছেলে। ননীবালা হোড় ছিল মনিটর। দেখতে যেমন সুন্দর, পড়াশোনা আর পরীক্ষাতেও তেমনি দুর্জয়। পরে আর কখনও দেখা হয়নি সেজন্য আপসোস হয়। মার মনে একটা দুঃখ থেকে গেল; সেই যে প্রথম পরীক্ষাতেই সব মিলিয়ে আমাকে হারিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিল, কোনদিনই আর প্রথম স্থান পেলুম না, আলাদা আলাদা বিষয়ে যতই প্রথম হই না কেন। ননীবালা আমার চেয়ে বয়সে মাস-দুয়েকের বড় ছিল। সে জন্যে যতটা নয়, পড়াশোনায় ভাল বলে তার কাছে আমি বিশেষ পাত্তা পেতুম না, তার একটু ভারিক্কি ভাব ছিল। সে তুলনায় অনেক বেশী ধরাছোঁয়ার মধ্যে ছিল রেনুকা সেনগুপ্ত, হাসিঠাট্টা তার ভাল লাগত। সৌরীন ছিল সব মিলিয়ে খুব ভাল। হরিসত্ববাবুর ছেলে, কালু, আমাদের এক ক্লাস নিচে পড়ত। সৌরীন, কালু আর আমি তিনজনে মিলে প্রায়ই চাঁদমারির নিচে লয়েড বোটানিক গার্ডন্‌সে বেড়াতে যেতুম। সেটি ছিল ফুল, অর্কিড আর রডোডেণ্ড্রনে ভর্তি একটি নন্দন কানন। অতিকায় সাইজের প্যান্‌জি ফুল চুরি করে বইয়ের পাতার মধ্যে চেপে রেখে শুকিয়ে নেয়া ছিল আমাদের নেশা। গুর্খা রক্ষীরা তাকে তাকে থাকত, দূর থেকে প্যান্‌জি ফুল চুরি করতে দেখলে, খাপ থেকে কুকরি খুলে শূন্যে আস্ফালন করে, বেজায় তাড়া করত। আমরা প্রাণভয়ে ছুটতুম, বোধ হয় ইচ্ছে করেই তারা একটু পিছিয়ে থাকত, পালাবার সুযোগ দিত, তা সত্ত্বেও আমাদের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটত।

খুকুদি আমাদের হাইরোড্‌স্ অভ হিস্টরি আর হাইরোড্‌স্ অভ লিটারেচার পড়াতেন। কিছুদিন আগে এক পরিচিত মহিলার বাড়িতে কত বছর পরে বইদুটি

দেখে আনন্দে আমি বুকে জড়িয়ে ধরেছিলুম। মিসেস দাশগুপ্ত অঙ্ক আর ভূগোল পড়াতেন। একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা সাধারণত উঁচু ক্লাসে পড়াতেন, কিন্তু আমাদের তিনি চেঁচিয়ে ইংরেজি পড়তে আর আবৃত্তি করতে শেখাতেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তবে এক ব্যাপারে আমার একটু অস্বস্তি হতো। যখন আমাকে কাছে টেনে নিয়ে প্রায় কোলে বসাতেন তাঁর গা ও কাপড় থেকে এক অদ্ভুত পাঁচমিশেলী গন্ধ বের হতো ; ঘাম, বাসি এবং তার উপরে টাটকা মাখা ও-ডি-কলোন, গায়ের, মুখের পাউডার। তার কারণ তিনি একই কাপড় অনেকদিন ধরে পরতেন। সে যাই হোক তাঁর কল্যাণে ইংরেজি গদ্যের গুণাগুণ, ওজন, ধ্বনি, মূল্য, বাক্যের আভ্যন্তরিক ওঠাপড়ার ছন্দ সম্বন্ধে মূল ধারণাগুলি আমার মাথায় কিছুটা দানা বাঁধে।

হাতের লেখাও শেখানো হতো। আমার হাতের লেখা খারাপ ছিল একথা হয়ত বলা যায় না, কিন্তু সৌরীন আর ননীবালার ছিল আরো ভাল। কারণ হিসাবে আমার মনে হতো তারা ইংরেজি হাতের লেখার জন্য ডবলরুলের খাতা কিনত, তার কৃপায় তাদের অক্ষরগুলি হতো এক সাইজের, সুষম, গোটা গোটা। কিন্তু ডবলরুলের খাতার ওপর মা অযথা বেশী খরচ করতে রাজি নন ; বলতেন ওটা বাড়াবাড়ি, লিখতে জানলে সমান রুলের কাগজেও যথেষ্ট ভাল লেখা যায়। ইতিমধ্যে সৌরীন একদিন স্কুলে এল না। খুকুদি আমার হাতে তার হাতের লেখার খাতা ফেরৎ দেবার জন্যে দিলেন। ফেরৎ না দিয়ে আমি করলুম কি তার লেখা পাতাগুলি ছিঁড়ে, ছেঁড়া লুকোবার জন্যে নতুন করে খাতায় মলাট দিয়ে, সেই খাতায় লিখতে আরম্ভ করলুম। সৌরীন ফিরে আসার দু একদিনের মধ্যে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল। খুকুদি আমাকে কিছু না বলে খুকিকে আমার মাকে কথাটা জানাতে বললেন। ফলে মার হাতে আমি বেদম মার খেলুম। ছেলেবয়সের ছোট্ট অপরাধটি জাহির করে সাধু সাজার চেষ্টা করছি তা নয় ; বড় হয়ে আরো নিশ্চয় গুরুতর অপরাধ করেছি। তবে ব্যাপারটি এখানে বিশেষ করে বলার উদ্দেশ্য এই যে, সেই থেকে আমার মনে বরাবরই একটা প্রশ্ন থেকে গেছে যার সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটিমাত্র সদুত্তর আমি আজও পাইনি। সেটি হচ্ছে ঠিক কোন অবস্থায় শিশুর দাবী যুক্তিযুক্ততা পেরিয়ে অন্যায় আবদারের পর্যায়ে পড়ে, সেটা কি সব ক্ষেত্রে এক ?

একদিন স্কুল থেকে সন্ধ্যাবেলা এসে হঠাৎ শুনি মা যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, এবং কয়েকজন বয়স্থা ভদ্রমহিলা ঘর বন্ধ করে তাঁর দেখাশোনা করছেন। আমার চোখে এর আগে কিছু পড়েনি, তা ছাড়া যদিই বা পড়ত, কিসে কি হয় তা জানার

জ্ঞান নিশ্চয় তখন আমার হয়নি। বাবা তখন দার্জিলিঙে ছিলেন না। দিদি আমাকে সেদিন তাড়াতাড়ি খাইয়ে শুইয়ে দিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে শিশুর তীক্ষ্ণ কান্না শুনলুম মনে হল। পরের দিন সকালে উঠে মায়ের ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর বুকের কাছে একটি শিশু ঘুমোচ্ছে। বাচ্চাটি আমার ছোট ভাই, জন্ম ১১ই জুলাই ১৯২৫।

অসহযোগ যুগের প্রথম বড় ঘটনা যা আমার মনে আছে তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু, ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন, মল-এর পিছনে স্টেপ-এসাইড ভবনে। সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে খবর শুনে বাড়ি এসে বাবা আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। দেশবন্ধুর দেহ তখন ফুলমালা দিয়ে সযত্নে শুইয়ে রাখা হয়েছে। যত দূর মনে পড়ে বাসন্তী দেবী পাশের ঘরে ছিলেন, শ্রীমতী হেমলতা সরকার তাঁকে শান্ত করায় ব্যস্ত। পরের দিন সকালে দেশবন্ধুর দেহ শোভাযাত্রা করে মল-এর মধ্যে দিয়ে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। টশ এণ্ড কোম্পানি ছিল ফোটোর দোকান। শোভাযাত্রার যে ছবিটি তারা তোলে সেটি কলকাতার সংবাদপত্রে ছাপা হয়; আমার ছবি তাতে আছে, বাবার সঙ্গে শবাধারের পিছনে পিছনে হাঁটছি।

বার্ষিক পরীক্ষায় কপালের যা লিখন তাই, অর্থাৎ, দ্বিতীয় হলুম। ডিসেম্বর এল, বাবার দর্জি (বুড়োমানুষ বলে তাঁকেও আমরা দর্জিবাজে অর্থাৎ দাদু বলে ডাকতুম) আমাকে কালো বনাতের একটি কোট করে দেন। দার্জিলিঙই প্রথম শহর যার কোথায় কোন্ বাড়ি ছিল সব আমার মোটামুটি মনে আছে। ঘুমপাহাড়ের দিকে ছিল বর্ধমান রাজবাড়ি, দক্ষিণে ছিল জুবিলি স্যানাটোরিয়াম, একেবারে উত্তরে নর্থ পয়েন্ট। শহরের মাথায় পাহাড়ের উপরে ছিল সেন্ট পল্‌স স্কুল, পশ্চিমে একেবারে নিচের দিকে ছিল লয়েড় বোটানিক গার্ডন। সৌরীনের সঙ্গে আমি লেবঙ্গে ঘোড়দৌড়ের মাঠেও গেছি। মহারানী স্কুলের নর্থ ভিউ বাড়ি থেকে নিচে ম্যাকেঞ্জি রোড পর্যন্ত ছিল পাহাড়ের খাড়া ঢালু গা, সুন্দর ঘাস আর ঘাসের ফুলে ভরা। সৌরীন আর আমি উপরে স্কুলে ঘাসের উপর বসে পাছা গড়িয়ে হু হু করে চকিতের মধ্যে ম্যাকেঞ্জি রোডে নেমে যেতুম। খুব মজা লাগত, কিন্তু প্যাণ্টের পিছনের দফারফা হতে দেরি হতো না।

১৯২৫-এর নভেম্বরের শেষে আমরা দার্জিলিঙ ছেড়ে চলে আসি। তখনও অসহ্য রকমের শীত পড়েনি। কলকাতায় এসে শ্যামানন্দ রোডে মামাবাড়িতে উঠলুম। দিদির তখন বয়স ষোল। বাবা আর রাঙামামা বিয়ের সম্বন্ধ করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন এবং বেশী সময় লাগল না; বিয়ের দিন স্থির হল জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। শ্যামানন্দ রোডের উত্তরে ল্যান্সডাউন মার্কেটের

গায়ে বকুলবাগান রোডে একটি তিনতলা বাড়ি বিয়ের জন্য ভাড়া পাওয়া গেল। বাড়িটি এখনও আছে। বেশ বড় বাড়ি, তবে আমার জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ির সকলে আসায় সবটা ভরে গেল। মায়ের দিকের আত্মীয়রা মামাবাবুর আর রাঙ্গামামার বাড়িতে উঠলেন। আমার ছোট ভাই হবার পর মা তখনও ঠিকমতো সেরে ওঠেননি বলে বিয়ের ধাক্কা পড়ল মুখ্যত দিদিমা, মামাবাবু আর রাঙ্গামামার উপর। রাঙ্গামামাই অধিকাংশ কাজ করলেন।

বিবাহ স্থির হয় উনিশ শতকের স্বনামধন্য রামদুলাল সরকারের বংশধর ছাতুবাবুর লাটুবাবুর বাড়ির শ্রীপশুপতিনাথ দেবের কনিষ্ঠ ছেলে সুনীতকুমারের সঙ্গে। বংশের সম্পত্তির বড় অংশ পশুপতিবাবুর ভাগে পড়ে। বিডন স্ট্রিট আর সেন্ট্রাল এভিনিউর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, অনাথদেবের বাজারের উত্তরে, পশুপতিনাথ দেব তখন সদ্য একটি বড় নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন। বরকে আশীর্বাদ করতে আমি কন্যাপক্ষের দলের সঙ্গে গেলুম। অত ধনী বাড়িতে তার আগে আমি কখনও যাইনি। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন, ঝলমলে কার্পেট দেখে আমি ত অবাক, বুঝলুম এই সব হচ্ছে বড়লোকের বাড়ির চিহ্ন। ভাবী বর অতি সুপুরুষ, দেখেই আমার খুব ভাল লাগল; বি-এ আর এম-এ দুটিতেই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন শুনে আমার বেশ ভয়ভক্তিও হয়েছিল। তবে আশীর্বাদের আসরে যাঁকে দেখে আমার সবচেয়ে বেশী সম্ভ্রম হয়েছিল তিনি একজন শান্ত, নম্র, মৃদুভাষী, বৃদ্ধ, বরের শিক্ষক, অধ্যাপক অধরনাথ মুখুজ্যে। বছর দশেক পরে যখন রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' পড়ি, তখন নিখিলেশের মাস্টারমশাইয়ের কথা পড়ে আমার অধরবাবুর মুখ মনে পড়ে।

বিয়ের দিন সকালে বকুলবাগানের বাড়িতে, বরের বাড়ি থেকে গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে দুটি বড় ছাদখোলা দোতলা লাল ওয়ালফোর্ড বাস এসে দাঁড়াল। বরের বাড়ি থেকে যে হলুদবাটা আসে, সেই হলুদ কনের গায়ে মাখিয়ে স্নান করাতে হয়। হাতে তত্ত্বের থালা নিয়ে বাস দুটি থেকে একের পর এক দাসী নামছে ত নামছেই, যেন ফুরোয় না। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠল। প্রত্যেক দাসীর হাতে বড় থালা বা ঝুড়ি, ক্রোশে বোনা খুঞ্চিপোষ দিয়ে ঢাকা। নানা রকম মিষ্টি, শাড়ি এবং অন্যান্য বস্ত্র, তার সঙ্গে নানা রকম মনোহারী জিনিস। সবচেয়ে ভাল লাগল খেলনাগুলি, বিশেষত যেগুলির স্প্রিংএ দম দিলে চলে। তবে যখন শুনলুম, খাবার বাদে আর সব জিনিসই, মায় খেলনাগুলিও, বিয়ের পর ফুলশয্যার তত্ত্বর সঙ্গে ফেরত যাবে, তখন আমার উৎসাহ কমে গেল। সন্ধ্যার লগ্নে বিবাহ হল, বিবাহ শেষ হলে বরকনেকে 'বাসরে' নিয়ে গিয়ে বসানো হল। বাসর-

সভায় মহিলাদের আধিপত্য। সেখানে সাধারণত কনেকে গান গেয়ে নিজের কৃতিত্ব প্রমাণ করতে হয়। আর বরের পরীক্ষা হচ্ছে মহিলাদের রসিকতা আর মজার চালাকি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়ে, বিনীত মুখে হাসিভাব নিয়ে, উচিতমতো জবাব দেবার। দিদি রবীন্দ্রনাথের গান গাইল 'ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।' তার পর 'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।' বেলোয়াড়ি কাঁচের শব্দের মতো দিদির অপূর্ব গলা আর আখর আজও আমার কানে লেগে আছে।

জামাইবাবুদের অবস্থার সঙ্গে আমাদের তুলনার কোন প্রশ্নই ছিল না। সে কারণে, তত্ত্বতাবাসের সময় এলে, তাঁদের বাড়িতে কী ধরনের তত্ত্ব পাঠালে উভয়-পক্ষের মান রক্ষা হবে সে নিয়ে বাবা মার নিশ্চয় চিন্তা হতো। এ সমস্যার কথা বুঝলুম যখন আমি আরো একটু বড় হলুম; প্রতিবার তত্ত্বের সময়ে বাবা মা কত চিন্তিত, সময়ে সময়ে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতেন কানে আসত। তবে, দিদির বর, জামাইবাবু বেশ বোঝদার ছিলেন। নানা অজুহাত দেখিয়ে বাবামার যাতে কম খরচ হয় তার চেষ্টা করতেন। বাবা মোটামুটি তাঁর সাধ্যের মধ্যেই উদ্ধার পেতেন বলা যায়। দিদির বাড়ির গুরুজনরা এবিষয়ে নিজেদের মধ্যে কটাক্ষ করতেন না সে কথা বোধ হয় মনে করা ঠিক হবে না।

দিদির শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া আসার ফলে আমার ঐ বয়সেই ধারণা হয় যে ঐশ্বর্য ও লক্ষ্মীকে ধরে রাখতে হলে বেহিসেবি খরচ করা চলে না। উল্টে, বেশ হিসেবী. এমন কি কার্পণ্যঘেঁষা হতে হবে। রাই কুড়িয়ে বেল হয়। আরো একটি জিনিস শিখলুম। বড়লোকের বাড়িতে যে-ধরনের হিসেবিপণা ও কার্পণ্য শোভা পায়, এমন কি সেবিষয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে খুব প্রশংসাও করে, সে ধরনের হিসাব ও কার্পণ্য সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে শতমুখে নিন্দার কারণ হয়। দিদির বাড়িতে প্রতিদিন ভাঁড়ার থেকে, কিছুটা খাটো হাতে, গুনে গুনে, মেপে মেপে, চাল ডাল, কাঁচা তরকারি বের হতো। বাড়ির পরিজনদের পাতে বরং একটু কম পড়ত, কদাচ বেশি নয়। সে রকম হাত টিপে ভাঁড়ার বের করার কথা, পরিজনদের পাতে কম দেবার কথা আমাদের মতো সাধারণ ঘরে মা কখনো ভাবতেও পারতেন না। জামাইবাবুদের দুটি গাড়ি ছিল, একটি ডেমলার, অন্যটি মিনার্ভা। দুটিই বড়লোকী, দামী গাড়ি। কিন্তু তাদের একটি বের করতে হলে অনেক ভেবে চিন্তে করতে হতো। যখনই দিদির বাড়িতে গেছি—তখনই দিদির শাশুড়ীঠাকুরণের ঘরে একবার আমার ডাক পড়ত। ভদ্রমহিলা ছিলেন বেশ ফর্সা, কিন্তু বেজায় মোটা, তদুপরি বাতের প্রকোপে নড়তে নড়তে বেশ কষ্ট হতো। এক কালে নিশ্চয় সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু আমি যখন তাঁকে দেখি তাঁর এককালে-টানাটানা নাক চোখ মুখ

মেদের মধ্যে প্রায় ডুবে গেছে। গলার স্বর ছিল মিষ্টি, কিন্তু গিন্নিপনায় ভারিক্কি। সব সময়ে দেখেছি তিনি ঘরের ঠিক মাঝখানে একটি বিরাট গোল খাটে ছয় ইঞ্চি পুরু গদির উপর পা মুড়ে বাবু হয়ে বসে আছেন, সমুখে পানের বাটা, পান সাজছেন। দুপাশে দুজন দাসী নিচে মাটিতে বসে। তারা ছাড়া, তিন বৌয়ের অন্তত একজন সর্বদা কাছাকাছি থাকতেন। আমি কাছে গিয়ে প্রণাম করলে, তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে অস্ফুটস্বরে আশীর্বাদ করতেন। অল্পক্ষণ পরে, যে বৌমা হাজিরা দিচ্ছেন, তাকে বলতেন, 'ছোট বৌমার ভাইকে মিষ্টি দাও।' বলতে না বলতেই চলে আসত প্রকাণ্ড ষোল ইঞ্চি ব্যাসের এক ভারি রূপোর থালা, সঙ্গে রূপোর গেলাসে জল। সেই বিরাট থালার ঠিক মাঝখানে শোভা পেত খেলার মার্বেলের মতো ছোট্ট দুটি কড়াপাক সন্দেশ, প্রতিটির ব্যাস বোধহয় আধ ইঞ্চিও হবে না। কড়াপাকের মানে হচ্ছে, ময়রা বাড়ি থেকে এলে অন্তত তিনচার দিন ঠিক থাকবে, টকে যাবে না (তখনকার দিনে রেফ্রিজারেটর ছিল না)। আমার মতো ছোট ছেলের পক্ষে সে সন্দেশ মুখে পুরে, প্রাণপণ জোর দিয়ে দাঁতে ভাঙা ছিল প্রায় একলব্যের পরীক্ষার সামিল। প্রকাণ্ড বাড়িতে যা কিছু আসবাব অথবা ঘর সাজানোর দ্রব্যাদি ছিল, দেখলেই বোঝা যেত সে সব যেমন জমকালো, তেমনি মূল্যবান। কিন্তু যে সব জিনিস প্রাত্যহিক ব্যবহারের জন্যে, যেমন কাপড় জামা, খাওয়া-দাওয়া, সেগুলি সবই ছিল মামুলি, আটপৌরে, সংখ্যায় ও পরিমাণে একেবারে গোণা গুণতি। এই ধরনের বিধিব্যবস্থা পরে আমি প্রায় সব বাঙালী বাড়িতেই দেখি, বিশেষত যাঁরা অনেকদিনের বড়লোক। উত্তরভারতে এর ব্যতিক্রম দেখেছি শুধু বনেদী মুসলমান পরিবারে, সেখানে হিন্দু পরিবারে আহারের ব্যাপারে সাধারণত আরো কার্পণ্য দেখেছি।

দিদির বিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়ায় বাবা চারমাসের ছুটি কমিয়ে নিলেন। আমরা রংপুরে গেলুম ১৯২৬ সালের জানুয়ারির শেষে। দিদি শ্বশুরবাড়ি গেল। খুকি দিদিমার কাছে থেকে গেল। প্রথমে গোখেল মেমোরিয়ালে ভর্তি হয়, তখন স্কুলটি ল্যান্সডাউন রোড আর রোলাণ্ড রোডের মোড়ের কাছে ছিল। কিছুদিন পরে খুকি আপার সার্কুলার রোডে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে বোর্ডার হয়ে ভর্তি হয়, সেখান থেকে ১৯২৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে।

রংপুরে আমরা চারজনে গেলুম, মা, বাবা, ছোট ভাই গুলু আর আমি। ছোট ভাইয়ের ভাল নাম অজিত, দার্জিলিঙে জন্মেছিল বলে ডাক নাম হয় গুর্খা। ডাকতে ডাকতে গুর্খা হয়ে গেল গুলু। রংপুরে যখন গেলুম তখন তার বয়স সাত মাস, যেমন সুন্দর নাককোখ মুখ আর গড়ন, তেমনি হৃষ্টপুষ্ট। রংপুরে যতগুলি

শিশু প্রদর্শনী হতো, সব কটিতেই ১৯২৬ সালে গুলু প্রাইজ পেত।

বাবা যখন আমাকে রংপুর জেলা স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গেলেন তখন হেডমাস্টার মশাই আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করলেন, ক্লাস ফাইভ পেরিয়ে আমি সরাসরি ক্লাস সিক্সে ভর্তি হতে পারি। দার্জিলিঙে আমি ক্লাস ফোরে ছিলুম। এর ফলে, অন্য কোন বিষয়ে, যথা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদিতে যদিও কোন অসুবিধা হল না, মুস্কিল বাধল অঙ্ক নিয়ে। অঙ্কতে আমি এই সময় থেকেই কাঁচা রয়ে গেলুম। পারতুমনা যে তা নয়, তবে ভয় হতো, নিজে নিজে আপন মনে গল্পের বই পড়ার মতো অঙ্ক কষা ধাতে আসত না। কেউ আমাকে নিয়ে অঙ্ক কষাতে বসলে তবে ভাল লাগত। ফলে, পরে যেটুকু অঙ্ক শিখেছি সবই আমার গুরুদের অধ্যবসায়ের কৃপায়, আমার নিজের কৃতিত্বে নয়।

রংপুরের বাড়ির আকার ও ভিতরের ব্যবস্থা প্রায় জলপাইগুড়ির বাড়ির মতো ছিল। সমুখে ছিল বসার ঘর, সেখান থেকে ভিতরে একটি সরু হলঘর, দুপাশে দুটি শোবার ঘর, বাইরে ঢাকা বারান্দার একপাশে ভাঁড়ার ঘর, অন্যদিকে স্নানের ঘর। আমাদের পাড়ার নাম ছিল গুপ্তপাড়া। তবে রংপুর শহর জলপাইগুড়ি থেকে আরো বিস্তৃত আর সাজানো ছিল। পাকা বড় বড় বাড়ি ছিল অনেক। যেমন, রংপুরের কারমাইকেল কলেজের মতো বিরাট বাড়ি আমি তার আগে কলকাতা ছাড়া কোথাও দেখিনি। তাজহাট পরিবারের বাড়িও জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির থেকে অনেক বড় আর জমকালো ছিল। তাছাড়া ছিল বড় সাধারণ পাঠাগার। এই লাইব্রেরির মাঠে আমি প্রথম সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা শুনি। অ্যামেজনদের মতো বিরাট চেহারার কোন মহিলার যে এমন বলিষ্ঠ অথচ সুমিষ্ঠ গলা হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। আরো আশ্চর্য হলুম যখন বাবা বল্লেন তিনি আসলে বাঙালী। এমনিতেই বাঙালী বাচ্চার জ্যাত্যাভিমান অ-কল্পনীয়, অবশ্য না হয়ে পারে না, কারণ জন্ম থেকেই ভুরু নাক কুঁচকে থাকা তার স্বভাব। কাছারি অঞ্চলটিও ছিল খুব বিস্তৃত, ছিল বড় বড় দালান। যাঁরা ইতিহাস পড়েছেন জানেন, রংপুর ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে এবং পরে বৃটিশ শাসনের একটি বড় ঘাঁটি। বাজারটি ছিল বড়। এমনকি সেখানে আলাদা পুরো একটি সোনা রূপোর পট্টি ছিল। আমার মনে আছে কারণ, সে পট্টিতে বাবা জামাইষষ্ঠী তত্ত্বর জন্যে তেরো টাকা দরে একটি মোহর কেনেন। রংপুরে স্বাচ্ছল্য অবশ্য আসত তার বিখ্যাত সোনালি পাট আর কিছুটা তামাক থেকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বলত বাহে। তাদের ভাষা, জীবিকা, পোশাক-আশাক অবশ্য বাঙালীদের থেকে ছিল তফাৎ। বাবার সঙ্গে আমি পরে গাইবান্ধা আর নীলফমারি মহকুমা শহরে

গেছি, সেগুলি সব মিলিয়ে বড় গ্রামই বলা যায়, তফাৎ শুধু অফিসপাড়ায়।

জেলা স্কুলের কথা আমার তত ভাল মনে নেই। অঙ্ক ভাল পারতুম না, উপরন্তু স্কুলটি ছিল দূরে, তাছাড়া আমাদের ক্লাসের কেউ গুপ্তপাড়ায় থাকত না, ফলে সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হতো কম। এসবও হয়তো অস্পষ্ট স্মৃতির একটা কারণ। তার পরিবর্তে বাবার বন্ধুদের দু একজনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। একজন ছিলেন শ্রীআশুতোষ চৌধুরী। তাঁর মাথাভরা টাকের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ছিল বিরাট কাটা দাগ, শিকার করতে গিয়ে বাঘে থাবা মেরেছিল। প্রথম যখন দেখি তখন মনে হয়েছিল উনি হয়ত সেই বিখ্যাত শিকারী আশুতোষ চৌধুরী যাঁর গল্প ভারতবর্ষ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। যখন শুনলুম ইনিও শিকারী, ভক্তি বেড়ে গেল। আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর বন্দুকগুলি দেখি। তাঁর ছিল কয়েকটি দোনলা ম্যাণ্টন, একাধিক ম্যান্‌লিকার রাইফ্‌ল্, তাছাড়া ওয়েব্‌লি এণ্ড স্কটের রিভলভার। ঘরে ছিল অনেক জন্তু-জানোয়ারের মাথা, গায়ের ছাল। বাড়ির সদর দরজার ভিতরে ছিল বড় বড় হাতির পা, তার ভিতরে ছাতা, লাঠি, ছড়ি রাখার ব্যবস্থা। বাবার একজন মৃদুভাষী স্নেহশীল সাবজজ বন্ধুও ছিলেন, কিন্তু আশুবাবুর সঙ্গেই ছিল আমার বেশি ভাব। উনি আর বাবাতে মিলে ঠিক করলেন, আমার গ্রহনক্ষত্র এবং গাছপালা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান হওয়া বাঞ্ছনীয়। আশুবাবু আমাকে জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহনক্ষত্র' আর 'গাছপালা' কিনে দিলেন, এবং সেই সঙ্গে আমাকে তাঁর জাহাজের ক্যাপ্টেনদের জন্যে তৈরি একটি ন্যটিকাল টেলিস্কোপ দিলেন। এই টেলিস্কোপে চাঁদের পাহাড়ের গর্তগুলি খুব বড় বড় দেখাত। বৃহস্পতি গ্রহের গায়ে মোটা মোটা পটিগুলি দেখতুম, ক্ষীণ হলেও শনির চাকাগুলিও দেখা যেত। বাবা চাইতেন ছেলেমেয়ে যা কিছু শিখবে সবই নিখুঁত করে, সম্পূর্ণ-ভাবে। তিনি আশা করতেন আমি তাঁর ছোট লেন্স দিয়ে ফুলের পাপড়ি, তাদের শিরা উপশিরা ভাল করে দেখব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানার পাশে ফুলপাতা জানার ঔৎসুক্য অনেক কম হওয়াই স্বাভাবিক। ফুলপাতা জানতে হলে চাই বিশ্লেষণী মন, কিন্তু আমার মন ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য সম্বন্ধে ব্যাকুল।

আশুবাবু আমাকে তাঁর চোঙাওলা হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোনটি ব্যবহার করতে দিলেন। এই প্রথম হল আমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে বিস্তৃত পরিচয়, এ পর্যন্ত যা শুধু বাবা আর দিদির গলাতেই শুনেছি। অমলা দাশের গান 'আজি বর্ষা রাতের শেষে' রেকর্ডটি শুনি। মনে হল রংপুরের বর্ষা রাতের কথা মনে রেখেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ গানটি লিখেছিলেন। সারা রাত অঝোরে বৃষ্টির পর সকালে কালো মেঘের ফাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত সূর্যের কিরণ গাছের পাতায় ঝুলন্ত বৃষ্টির ফোঁটাগুলির উপর

অসংখ্য হীরের দ্যুতি ফুটিয়ে তুলছে, সুরের শব্দের, কথার এমন অবিচ্ছেদ্য সমন্বয় আমার ছেলেবেলার কল্পনাকে খুব অবাক করে দিত। বাবা আর তাঁর বন্ধুদের কাছে আমি অল্পবয়সে প্রাপ্তবয়স্কোচিত অনেক অভীপ্সা ও প্রেরণা পেয়েছি। এ বিষয়ে বাবার ও বাবার বন্ধুদের আমার উপরে প্রভাব পরস্পর সম্পূরক ছিল বলা যায়। বাবার বন্ধুরা তাঁদের যে বিষয় ভাল লাগত তাতে আমার উৎসাহ জাগিয়ে দিতেন, আর বাবার চেষ্টা ছিল যা কিছু শিখি তা যেন আদ্যোপান্ত শিখি, সব কিছুই ভাল, আরো ভাল করে শিখতে হবে। দুঃখের বিষয়, এ ব্যাপারে আমি বাবাকে বরাবরই নিরাশ করেছি। আমার মন ছিল, আজ এটা কাল ওটা, ব্যাঙের মতো ইতস্তত লাফিয়ে চলার মতো। স্যামুয়েল স্মাইল্‌স্ বা হার্বার্ট স্পেন্সর যে-ধাতুতে তৈরি ছিলেন, সে-ধাতুর মোটেই নয়। অন্যদিকে এঁরাই ছিলেন বাবার ইষ্টগুরু। একটি ঘটনার উল্লেখ করলে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে। বাবার হাতে রংপুরে বিচারের জন্যে একটি ফৌজদারি মামলা এল। তাতে আসামীর হাতের আঙুলের ছাপের উপর সাব্যস্ত হবে সে অপরাধী কিনা। হাতের আঙুলের ছাপ শাস্ত্র সম্বন্ধে বাবার কিছু জ্ঞান ছিল না। বাবা উদ্যোগী হয়ে অফিস ও দুপক্ষের উকিল মারফৎ এ বিষয়ে ডজনখানেক প্রামাণ্য বই আনিয়ে, বড় বড় আতস কাঁচ জোগাড় করে দুমাসের মধ্যে বিদ্যাটি আদ্যোপান্ত অধিকার করে মামলার রায় দিলেন। সেই সময়ে বাবা জার্মান শিখতে শুরু করেন, কারণ যদিও সে-শাস্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন একজন ইংরেজ, তবুও পরে কয়েকটি প্রামাণ্য বই জার্মানে লেখা হয়।

রংপুরের জল মার সহ্য হল না, ফলে বাবা বদলির দরখাস্ত করলেন। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হল আর বাবা দিনাজপুরে বদলি হলেন। রংপুর, দিনাজপুর আর জলপাইগুড়ির এমন কতগুলি সাধারণ লক্ষণ ছিল যা শুধু আমি উত্তরবঙ্গেই দেখেছি। কোন বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি না। সব মিলিয়ে ছিল উত্তরবঙ্গের গন্ধ, রূপ, বর্ণ, চরিত্র। ছিল উত্তরবঙ্গীয় বাংলা ও বাহে কথা ও টানের মিশ্রণ, তার সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি চালচলন, কথাবার্তা, হাবভাব। বাড়িগুলি অধিকাংশই ছিল ছোটছোট, চারদিকে জমি। কিছুটা ইট, বাকিটা মুলিবাঁশের বোনা দেয়ালে তৈরি, বাড়ির হাতা ঘিরে সুপুরি গাছ। এলোমেলো, ছড়ানো পাড়াগুলির প্রত্যেকটি কাঁচা রাস্তার সীমানা দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাড়ির জট ফুঁড়ে উঠেছে একটি বড় কোঠাবাড়ি। সংঘবদ্ধ সাংস্কৃতিক বা সভাসমিতি বা উৎসবের ছিল অভাব। লোকসংখ্যা ছিল কম। সব কিছু মিলিয়ে ছিল যাকে বলা যায় ছোট গ্রামীণ শহরের চরিত্র।

আমরা ১৯২৬ সালের বড়দিন কলকাতায় কাটালাম। বড়দিনটি আমার স্পষ্ট

মনে আছে, তার কারণ ঐ দিনের দুপুরবেলায় মামাবাবু আমাকে গঙ্গার মানোয়ারি জেটিতে বাঁধা একটি যুদ্ধের জাহাজ দেখাতে নিয়ে গেছলেন। জাহাজটি খুব আশ্চর্য লেগেছিল, কিন্তু হঠাৎ খুব কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়ার জ্বর আসাতে ভাল করে দেখা হল না। মামাবাবু কোন মতে আমাকে বাড়ি নিয়ে এলেন।

মা গুলুকে নিয়ে শ্যামানন্দ রোডে থেকে গেলেন। বাবা আর আমি দিনাজপুর গেলুম। সেটি ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি। আমরা মাত্র দুজন বলে বেশ কিছুদিন কাছারির কাছে ডাকবাংলায় একটি ঘরে ছিলুম, বাড়ি ভাড়া না করে। বাবা মোটামুটি রাঁধতে পারতেন। সবচেয়ে ভাল পারতেন ডিমের হালুয়া করতে সুজি দিয়ে, আর ভাজতেন ডিমের অমলেট। দিনাজপুরে বড় ম্যালেরিয়া হতো, এবং ভয়াবহ রকমের। জ্বর আসার এক ঘণ্টার মধ্যে তাপ উঠত ১০৬°৫, কুইনিন মিকশ্চার পড়লে চারপাঁচ ঘণ্টায় নেমে যেত একেবারে ৯৫°তে। তখন এত নির্জীব হয়ে যেতুম, আঙুল নাড়তেও কষ্ট হতো। প্রাণশক্তি এইভাবে কমে যাওয়ায় হঠাৎ সারা গায়ে খুব চুলকানি হল। গন্ধক গালিয়ে তার সঙ্গে নারকোল তেল মিশিয়ে বাবা একটি মলম করে গায়ে মাখিয়ে দিতেন। তাতে চুলকানি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

মার্চ মাসের শেষে ম্যালেরিয়া সারিয়ে আমি দিনাজপুর জেলা স্কুলে ক্লাস সেভনে ভর্তি হলুম। আগের পরীক্ষায় ফল ভাল থাকলে সেকালে স্কুলে ভর্তি হতে মুস্কিল হতো না। স্কুল ভর্তি হবার আগে আমি বাবার বড় রোভার সাইকেলে পা গলিয়ে পেডালে দাঁড়িয়ে চালাতে শিখলুম। কাছারির কাছে ছোট পাহাড়ের মতো একটি উঁচু ঢিপি ছিল। সাইকেল ঠেলে তার চূড়ায় উঠে সাইকেলে উঠে গা ঢেলে দিতুম। মুহূর্তে আধ-মাইলের বেশী পথ হুহু করে গড়িয়ে নামতুম। কয়েক বছর পরে যখন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের প্রিলিউড পড়লুম তখন এই লাইন কটি পড়ে আমার দিনাজপুরের কথা মনে হতো :

ঘুরে ঘুরে ফিরলুম,
গর্বে, আনন্দের শিহরন, অশ্রান্ত ঘোড়ার মতো,
বাড়ি ফেরায় মন নেই। পায়ের তলায় লাগিয়ে ইস্পাত,
নেশায় মত্ত একজোটে হুসহুস করে ছুটেছি পিছল বরফের মাঠের উপরে।

অবশ্য, ওয়ার্ড্‌ওয়ার্থের মতো 'একজোটে' নয়, একা।

দিনাজপুরে দিনাজপুর-রুহিয়া রেল লাইন হবে বলে বাবা তার জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে জমি কেনার কাজে নিযুক্ত হয়ে এলেন। জীবনের প্রথমার্ধে তিনি জরীপ ও সেট্‌ল্‌মেন্টের কাজে কৃতিত্ব দেখান। তাঁর একটি বড় কাজ দার্জিলিঙ

ডুম্বার্সের জরীপ ও সেট্‌ল্‌মেণ্ট রিপোর্ট। জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বছর তাঁকে সরকারের পক্ষে জমি কেনার কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। ফলে, ছেলেবেলা থেকেই আমরা জরীপ ইত্যাদির নানা কথা, যেমন, প্লেন টেবিল, থিয়োডোলাইট, গাণ্টার চেন, মোরব্বা, খসড়া, খতিয়ান, খানাপুরি, বুঝারৎ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে পরিচিত। তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া সম্বন্ধীয় কথাও, যেমন যোধপুর ব্রিচেস্‌, গেটার্স, স্যাড্‌ল্‌ বা জিন, লাগাম, স্ন্যাফ্‌ল্‌, বিট্‌, মার্টিংগেল ইত্যাদি।

লাইন পাতার এঞ্জিনিয়ারিং কাজে নিযুক্ত ছিলেন এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব, নাম ভার্গন্‌। তিনি আর বাবা হাত মিলিয়ে কাজ করতেন। বাবা হয় সাইকেলে ঘুরতেন, না হয় ভার্ণনের সঙ্গে তাঁর ট্রলিতে যেতেন। সাইকেলে যাবার সময়ে আমি সাইকেলের সম্মুখের ডাণ্ডার উপর বসতুম। ডাণ্ডার উপর বসার মতো ছোট সীট বা গদিও লাগানো থাকত না, ফলে কাঁচা এবড়ো-খেবড়ো বিশত্রিশ মাইল সাইকেল সফরে মেরুপুচ্ছের দফারফা হবার উপক্রম হতো। ভার্ণনের তখন সবে বিয়ে হয়েছে। তাঁর মেমও মাঝে মাঝে সঙ্গে থাকতেন এবং তিনিই সকলের খাবার আনতেন। আমি তখন ছুরি কাঁটার ব্যবহার একবারেই জানতুম না। সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় এ. এল. ব্যাশামের সঙ্গে শ্রীনিমাইসাধন বসুর যে কথোপকথন প্রকাশিত হয়, তাতে পড়েছি ব্যাশাম বলেন হাত জোড় করে নমস্কার করা আর খাবার সময়ে ডান হাত দিয়ে মুখে গ্রাস তোলা, দুইই তাঁর মতে একান্ত ভারতীয় রীতি। ওঁদের সঙ্গে খাবার সময়ে আমি বাঁ হাতে ছুরি নিয়ে মাংস কেটে ডানহাতে কাঁটা দিয়ে সেটি গেঁথে মুখে তুললুম, কারণ কাঁটাই হাতের বদলে মুখে পোরে, ছুরি নয়। আমাকে ন্যাটা ভেবে মিসেস ভার্ণন চিন্তিত স্বরে বাবাকে এবিষয়ে জিগ্যেস করলেন। বাবা বুঝিয়ে বললেন। আমি ভাবলুম, কি যন্ত্রণা, দক্ষিণকে ভাবে বাম, বামকে ভাবে দক্ষিণ! আজকের দিনেও পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক সমস্যা আমাকে প্রায়ই ভাবিয়ে তোলে।

মার্চ মাস নাগাদ, কি তার একটু পরে, দিনাজপুর শহরের মধ্যস্থলে, কালীতলায় বাবা একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন। কাছারি অঞ্চল থেকে যে-রাস্তাটি শিরদাঁড়ার মতো শহরের মধ্যে দিয়ে সোজা অন্য প্রান্তে গেছে, বাড়িটি ছিল তার ওপর। মা গুলুকে নিয়ে কলকাতা থেকে এলেন। তার কয়েকদিনের মধ্যে আমার জ্যেঠতুতো দাদারা এলেন, সঙ্গে এলেন আমার ছোট পিসীমা। জন্মের কিছু পরে বসন্ত হয়ে ছোট পিসীমার চোখ দুটি নষ্ট হয়, সুতরাং জন্মান্ধই বলা যায়। গুলুর বয়স তখন দুইও পূর্ণ হয়নি, পিসীমার কাছে এসে লুকোচুরি খেলত। অন্ধ কাকে বলে গুলু তখন বুঝতো না, পিসীমারও ভাল লাগত, গুলু তাঁকে অন্ধ বলে জানে না.

ভেবে। একেক সময়ে গুলু যখন বড্ড হুড়োহুড়ি করত, পিসীমা পেরে উঠতেন না, তখন আমার জ্যেঠতুতো ফুলদাকে চেঁচিয়ে ডেকে বলতেন, জগবন্ধু গুলুকে সিন্দুকের উপর বসিয়ে দাও। গুলু আরো বেশী চেঁচিয়ে বলত, ফুলদা দাও ত পিসীমাকে বাক্সোর উপর বসিয়ে। পিসীমা রেগে যেতেন।

স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হল, আমি যেন আকাশ থেকে বর পেলুম। ফুলদার বড় ভাই, নতুনদা, কলেজ থেকে ছুটিতে এসে সারা ছুটির প্রতি দুপুরে আমাকে একে একে আলেকজাণ্ডার ডুমা আর ভিক্টর হুগোর গল্প বলতেন। একদিকে থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের এথস, পর্থস, এরামিস আর ডার্টানিয়ঁর কার্যকলাপ শুনে আমরা হাসতুম, অন্যদিকে কাউণ্ট অভ মণ্টেক্রিস্টোর দুঃখে কষ্ট পেতুম। নোতরডামের কুব্জের প্রতি শ্রদ্ধায় মন আপনিই নুইয়ে যেত। সে সময়ে, সব মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের এগারো-বারো বছরের ছেলেমেয়ের পক্ষে যা নিয়ম ছিল আমার বেলায়ও তাই হল, অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ ইত্যাদি বই টেবিলের তলায় ঢুকে লুকিয়ে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না। পড়তুম দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ডিটেকটিভ উপন্যাস, অ্যামেলিয়া কার্টার ও রবার্ট ব্লেকের বুদ্ধির, তার সঙ্গে প্রেমের লড়াই। তখন যে প্রশ্ন আমাকে পীড়া দিত, উত্তর পেতুম না, তা হচ্ছে নরনারীর প্রেমের দৈহিক ভিত্তি নিশ্চয় কিছু আছে। তারা আলিঙ্গনের জন্যে কেন ব্যাকুল হয়। কিন্তু আসল ব্যাপারটি কি নিয়ে? যেসব বই তখন পড়েছি তাতে মনে হতো লেখক বলতে চান প্রেমই হচ্ছে নরনারীর জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য, কিন্তু কেন, কি কারণে? বইগুলিতে কারণের কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। মনের দিক দিয়ে যারা কিছুটা পরিণত, অথচ দেহের ব্যাপারে অজ্ঞ ও অপরিণত এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করার যেখানে উপায় নেই—উত্তর সেখানে হয় ধমক না হয় নীরবতা—সেখানে এ সমস্যা সবটাই ধাঁধা ও রহস্যে ভরা। এ অবস্থায় এঁচড়ে-পাকা হয়ে বিজ্ঞপ্রাজ্ঞের মতো অসহ্য চালচলন স্বভাবতই আসে। আর, সত্যি হলও তাই। এই সময়ে, স্বামী বিবেকানন্দের 'হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ' আবৃত্তি করে আমি যখন একটা প্রাইজ পেলুম, তখন নতুনদার দুই বন্ধু—মাকুদা আর ছকুদা—তাঁদের আমি বেশ ভক্ত ছিলুম, হঠাৎ একদিন আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন 'এ গডি এণ্ড অস্টেনটেশস বয়!' আসল ওঁরা বলতে চেয়েছিলেন আমি বয়সের তুলনায় পড়াশোনায় ভাল ও পরিণত এবং আমার মনের কথা ভাল করে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু ইংরেজিতে এই গালভরা কথাগুলির মানে ঠিক উল্টো, নিন্দাসূচক। কতকটা রবীন্দ্রনাথের 'ধাব্বার ফ্লুয়াস ইনফ্যাচুফুয়েশন অভ আকবর ওয়াজ ডগম্যাট্রিক্যালি…'শব্দগুলির মতো তাঁরা কথাগুলির শব্দেই মোহিত

হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ভাবের ঘরে চুরি ত সব সময়ে চলে না। তাই পরবর্তী কালে যখনই কোন ব্যাপারে নিজেকে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক বা গর্দভ মনে হয়েছে, তখনই মাকুদা আর ছকুদার কথাগুলি কানে বেজেছে, রীতিমত লজ্জা পেয়েছি। এ ঘটনার বছর দশ এগারো পরে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে একডালিয়া রোডে ধূর্জটি মুখুজ্যে মশাইয়ের বাড়িতে তাঁর খোঁজে গেছি, দেখি তাঁর ছেলে বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ, কুমার, সিঁড়ির উপর বসে আছে। সুন্দর গোলগাল চেহারা আর তেমনি সৌম্য, গম্ভীর ভাব। দিনাজপুরে আমার ঐ বয়সই ছিল, জিগ্যেস করলুম, হালে নতুন কি কি কবিতা লিখেছো। এক দণ্ড চুপ থেকে কুমার গম্ভীর গলায় উত্তর দিল 'না, কিছুকাল হল কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি, ছোট গল্প লিখছি।'

দিনাজপুরে থাকতে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমটি মান্দালয় জেল থেকে সদ্য মুক্তি পেয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর দিনাজপুরে আগমন, এবং কাছারি সংলগ্ন খেলার মাঠে তাঁর বক্তৃতা। সেই বক্তৃতা দিয়ে শুরু হয় সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। বাবার বারণ থাকাতে আমি যাইনি। তবে বড় জ্যেঠামশাইয়ের চতুর্থ ছেলে, আমাদের ন'দা, তাঁর ব্রাউনি ক্যামেরা নিয়ে গেছলেন এবং ছবি তুলেছিলেন। সুভাষবাবুর পৌরুষময় দেহ, সুশ্রী নাক মুখ চোখ, পরিষ্কার সরল চাউনি দেখে আমার খুব ভক্তি হয়। ন'দা বললেন ওঁর বক্তৃতাও খুব ভাল হয়েছিল, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার মতো। সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতার সঙ্গে তুলনা হয় কিনা আমার জানতে ইচ্ছা হয়েছিল। তাছাড়া দুজনেই বাঙালী, ভাবতেও ভাল লেগেছিল। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আমার নিজের একটি সাইকেল হল। পঁয়ত্রিশ টাকা দামের একটি হার্কিউলিস সাইকেল, আমার সবচেয়ে দামী ও প্রাণের সম্পত্তি। রাস্তায় বেরোলেই সকলের চোখে পড়ত।

তৃতীয় একটি ঘটনা হয়, যেটি পরবর্তী জীবনে পূজা-পার্বণ-মেলা সম্বন্ধে আমার মনের মাটিতে প্রথম আগ্রহের বীজ ফেলে। একবার সকলে মিলে আমরা কার্তিক মেলা উপলক্ষ্যে কান্তনগরের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দিরে গেলুম। তার আগে বাবার সঙ্গে রুহিয়া রেল লাইনে অনেক ঘুরেছি, সাঁওতাল ও বাহে গ্রাম দেখেছি। কান্তনগরের মন্দিরটি যেমন বড়, তেমনি সুন্দর আর চোখ জুড়োনো তার কারুকার্য। পোড়ামাটির খোদাই মানুষ, জন্তু, ফলফুল, পুরাণ উপাখ্যানের গল্পে ভর্তি। সেই আমার প্রাচীন মন্দিরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, বড় বয়সে এ বিষয়ে উৎসাহের প্রথম সূত্রপাত। আরেকটি বিষয়ও আমার তখন উৎসাহ জাগে এবং আজীবন থাকে। উত্তরবঙ্গের মেলাগুলিতে, যেমন জলপাইগুড়ি বা দিনাজপুরে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, অনেক রকম জাতিপ্রজাতির সমাগম—কোচ,

বাহে, মেচ, সাঁওতাল, নেপালী, ওরাওঁ, বোড়ো। সকলে মিলে আনন্দ করে খেয়ে, পান করে, নাচ গানে মত্ত হতো। সেই প্রথম অনেক রকমের লোকনৃত্য ও বাজনা শুনলুম।

দিনাজপুর স্কুলের স্মৃতিও আমার রংপুরের মতো ক্ষীণ। পড়াশোনা ছাড়া স্কুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল কম, স্কুল ছিল দূরে, কালীতলাতেই আমার ছিল বন্ধুবান্ধব যা কিছু। এই সব বন্ধুদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ বছর পরে দিল্লীর ইন্‌ষ্টিটিউট অভ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ডাঃ তারেশ রায়ের সঙ্গে আমার পুনরায় ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। ১৯২৭ সালে বার্ষিক পরীক্ষার আগে আমার যাকে প্যারাটাইফয়েড বলত তাই হয়। কিভাবে কেমন করে আমরা কলকাতায় গেলুম আমার মনে নেই, অসুস্থ ছিলুম। শুধু মনে আছে কালীঘাটের ৭নং যদু ভট্টাচার্য লেনে মামাবাবুর বাড়িতে আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠি। ১৯২৪-২৫ সালে মামাবাবু পুরনো বাড়ির সমুখের খালি জমিতে নতুন দোতলা বাড়ি করেছিলেন, সেই বাড়ি থেকে ১৯২৬ সালের প্রথমে দিদির বিয়ে হয়। কিন্তু আমার ছোট মাসীমার বিয়ের জন্যে টাকার দরকার হওয়ায় মামাবাবু সে বাড়ি ১৯২৭ সালে বিক্রি করতে বাধ্য হন। সে বাড়িটি আজও খুব ভাল অবস্থায় আছে, রাঙ্গামামা কত যত্ন নিয়ে সে বাড়ি তৈরি করেন বেশ বোঝা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই ছোট মাসীমা বিধবা হন। স্বামী হারিয়ে মামাবাবুর কাছে ফিরে এসে তিনি আমার জীবনে সেজকীর স্থান পূরণ করেন, আমি তাঁকে ছোটকী বলে ডাকতুম। যতদিন না বড় হয়ে চাকরি করতে গেলুম ততদিন দিদিমা আর তাঁর কাছে ছিল আমার যত কিছু নালিশ আর আবদার।

একে মায়ের দুর্বল স্বাস্থ্য, তায় আমার নিত্য অসুখ, এই দুই কারণে বাবার ওপর খুব অত্যাচার হতো। নিজে তিনি শরীরের খুব যত্ন নিতেন, নিত্য ব্যায়াম করতেন, হাঁটতেন, যে-সব কাজে হাত পায়ের ব্যবহার হয় প্রচুর করতেন। ফলে কেউ অসুস্থ হলে রেগে যেতেন। কারোর অসুখ হওয়া মানেই, তাঁর কাছে, স্বাস্থ্যের কতগুলি সাধারণ সরল নিয়ম অবহেলা এবং আলস্যের কারণ। সেজন্যে, বাড়িতে কারোর কোন অসুখ হলে, বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরলে মাকে অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সে-খবরটা ভাঙতে হতো। ফলে, অসুখ হলেই প্রথম চিন্তা হতো কী করে যতক্ষণ পারা যায় অসুখটা লুকোনো যায়। তাতে অনেক সময়ে অসুখ বেড়ে যেত। অন্যের অসুখ সম্বন্ধে বাবার অসহিষ্ণুতা আর বিরক্তির অনেকখানি আমি আমার স্বভাবে পেয়েছি। বাড়িতে বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সংসারে কোন অসুখ হয়েছে, শুনে প্রথমেই বিরক্ত হয়েছি।

মায়ের কাছে শুনেছি তিন মাস বয়স থেকে আমার নিউমোনিয়া, ডবল নিউমোনিয়া, আমাশা, পেটের অসুখ ইত্যাদি, অর্থাৎ ছোট ছেলের ভাগ্যে যা কিছু সাধারণত যত বার হতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী বার আমার হয়েছে, ম্যালেরিয়ার ত কথাই নেই। মায়ের শরীর ভাল থাকত না, তিনি আধকপালে মাথাব্যথার রোগে নিত্য ভুগতেন। এসবের ফলে বাবাকে প্রায়ই বদলি চাইতে হতো।

১৯২৭ সালের শেষে আমার অসুখের দরুণ বাবা আবার তিন মাসের ছুটি চাইলেন। আরোগ্য হয়ে আমার আরেক অদ্ভুত রোগ হল, সে রোগ আমার হতে পারে, আগে কেউ ভাবেনি। সব সময়ে পেটে আগুন জ্বলত ; ফলে, আমি রাত্তিরে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, বেড়ালের মতো চুপি চুপি রান্নাঘরে গিয়ে এদিক ওদিক ঘেঁটে যা পেতুম তাই খেতুম, এমন কি অন্যলোকের খাওয়া এঁটো থালার উচ্ছিষ্ট শুদ্ধ। একদিন এই রকম চুরি বিদ্যা করতে গিয়ে আচমকা রান্নাঘরের একগাদা সাজানো বাসন হুড়মুড় করে পড়ে গেল। তার শব্দে ধরা পড়ে গেলুম। হাওয়া বদলের জন্যে বাবা এসময়ে আমাদের জামসেদপুরের সাঁকচিতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি কয়দিনের মধ্যেই ফুটবলের মতো ফুলে উঠলুম। খুকি ব্রাহ্ম বালিকার হস্টেলে থেকে গেল। বাবা, মা, গুলু আর আমি সাঁকচিতে মায়ের মাসতুতো বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। তাঁকে ডাকতুম মেনি মাসীমা বলে, মেসোমশাইয়ের নাম ছিল ধূর্জটিচরণ সোম। মেনিমাসীমার ভাই, সুধীরচন্দ্র বসুও, তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। জামসেদপুর হচ্ছে আমাদের দেশের প্রথম ইস্পাত কারখানার শহর। এই শহরেই ভারতে আধুনিক শিল্পযুগের পত্তন হয়। জামসেদপুর শহর দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এর সঙ্গে এত দিন উত্তরবঙ্গে যে-সব শহর দেখেছি তার তুলনাই চলে না। ইতিমধ্যে কলকাতায় যদিও অনেকবার গেছি, তবুও কলকাতা শহর ত কখনও বেশ ঘুরে ফিরে দেখিনি। বড় জোর শিয়ালদহ থেকে বাড়ি আর বাড়ির চারিদিকে পাড়ায় যেটুকু ঘুরেছি। ১৯২৭ সালেই জামসেদপুর যথেষ্ট বড় শহর ছিল, নগরই বলা যায়। তার বিরাট চৌহদ্দির একধারে ছিল ইস্পাত কারখানা। তা সত্ত্বেও জামসেদপুরের রাস্তাঘাটে সর্বত্র ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত, নিরাপদে চলাফেরা করতে পারত। সন্ধ্যাবেলা বিশেষত যখন বেসেমার ইস্পাত পরিশোধকগুলি আকাশের দিকে মুখ তুলে, হাঁ করে অগ্ন্যুদগার করত, তখন সারা জামসেদপুর শহর আকাশের প্রতিফলিত আলোয় অলৌকিক রূপ নিত। সুধীরমামা কারখানার রোলিং মিলে কাজ করতেন। একদিন সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। রোলিং মিল দেখার পর, ধূর্জটি মেসোমশাইয়ের টি-মডেল ফোর্ডে

আমরা সারা কারখানাটা ঘুরলুম। আমার বিস্ময় তখন হ্যামলেটের বিস্ময়ের মতো, 'মানুষ কি আশ্চর্য-সৃষ্টি !' সত্যি বলতে, টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কারখানা আমার ছোটবেলার এক প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা।

হঠাৎ একদিন গুলুর ডিপথিরিয়া রোগ ধরা পড়ল। জামসেদপুরে ঐ অসুখ হল তাই রক্ষা। খুব কম হাসপাতালেই তখন ডিপথিরিয়ার সিরাম রাখত। টাটা হাসপাতালে ছিল। গুলু তাড়াতাড়ি সেরে উঠল। হাসপাতালটি দেখবার মতো। আগে কখনও এত বড় এবং ঝকঝকে তকতকে হাসপাতাল দেখিনি, এত পরিষ্কার যেন মেঝেতে ভাত খাওয়া যায়।

ছুটি শেষ হলে বাবা এবার বদলি হলেন পাবনায়। আমরা ঈশ্বরদি স্টেশনে নেমে বাসে করে পাবনা পৌঁছলুম ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর ছিল পুরোপুরি উত্তরবঙ্গ ঠাটের শহর। 'ঘটি'দের দক্ষিণ বা পশ্চিম বঙ্গের শহর থেকে পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায়। অবিভক্ত বাংলার প্রায় ঠিক কেন্দ্রস্থলে, ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ধরে কলকাতা থেকে প্রায় দুশ' মাইল উত্তরে, পদ্মানদীর উত্তরতীরে, পাবনা জেলার ভিন্ন একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক চরিত্র আছে স্পষ্ট বোঝা যায়, উত্তরবঙ্গ থেকে স্পষ্ট তফাৎ। পাবনা শহরের নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিল্পভিত্তিক পুরব্যবস্থা ছিল, যাকে এক কথায় বলা যায় বারেন্দ্র সংস্কৃতি। বেশ বোঝা যেত। উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি থেকে এ সংস্কৃতি ছিল অনেকভাবে বর্ণাঢ্য, বহুস্তরে বিভক্ত চরিত্রে জটিল। কথাই আছে বারেন্দ্র রক্ত এবং আনুষঙ্গিক চোখের কটা রঙেই প্রতিফলিত হতো বারেন্দ্রমনের নানামুখী চিন্তা, গহন ধ্যানধারণা. যার সঙ্গে ঘটি-মন তাল রাখতে অক্ষম।

আমি ক্লাস এইটে ভর্তি হলুম। সহপাঠীরা সকলেই কৃতবিদ্য, ধীমান ; গিরীন চক্রবর্তী, সুধেন্দুজ্যোতি মজুমদার (পরে সুধেন্দু আর আমি একসঙ্গে আই. সি. এস. চাকরিতে ভর্তি হই), ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী, প্রবীর রায় প্রভৃতি। সকলেই অন্য জায়গার সহপাঠীদের থেকে অনেক বেশী বিদ্যা ও বুদ্ধির অধিকারী, সজাগ। বারেন্দ্রদের সম্বন্ধে প্রথম থেকেই আমার ভক্তি বেড়ে গেল, যদিও মনে মনে ধারণা, ঘটি কায়স্থরাও বিশেষ কম যায় না। লম্বা, নানাপ্রসঙ্গের জটিল অবতারণা করে প্রবন্ধ লিখত গিরীন, তার লেখা যেমন ভাল লাগত, ঈর্ষাও হতো। সারাজীবন ধরে গিরীন নানা রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও বরাবর লেখক হিসাবে খ্যাতি বজায় রেখেছে, বিশেষত কিশোর সাহিত্যে। সম্প্রতি হঠাৎ তার মৃত্যু হয় ; আমরা কাছাকাছি থাকতুম। পাবনায় গিরীন আমাকে প্রথম বিনয় সরকার মশাইয়ের লেখা পড়তে দেয়, তার সঙ্গে স্বদেশী এবং সন্ত্রাসবাদী বই, আইরিশ ও

সিনফিনদের ইতিহাস ও প্রবন্ধ সংগ্রহ। তারই কাছে সর্বপ্রথম বলশেভিক বিপ্লবের কিছু চটি বই পাই, এবং তখনকার কালের প্রবাদপুরুষ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের কথা শুনি ও জানতে পারি। এম. এন. রায় তখন চীন, রাশিয়া, গোবি মরুভূমি আর সাইবিরিয়া ঘুরেছেন। তাঁর কল্যাণে এসব নাম আমার কাছে নিছক ভূগোলের ম্যাপেই আবদ্ধ থাকল না, জীবন্ত হয়ে উঠল।

এদিকে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। পাবনা শহরেও 'ফিরে যাও সাইমন' ধ্বনি করে শোভাযাত্রা বেরিয়ে তোলপাড় হল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদধন্য হয়ে পাবনা শিল্প-সঞ্জীবনীর লম্বা উঁচু চিমনি শহরের মাঝখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বাঙালী শিল্পোদ্যমের উৎকর্ষ ঘোষণা করল। ১৯৪৭ সাল অবধি পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী ভারতে প্রায় সবচেয়ে বড় গেঞ্জির কারখানা ছিল বলা যায়। সারা ভারতময় তখন শ্রমিক আন্দোলনের যে বান এসেছিল শিল্প সঞ্জীবনীর শ্রমিকরা মাঝে মাঝে পথে শোভাযাত্রা বের করে তাকে আরো জোরদার করত। তবে আমরা যতদিন ছিলুম ততদিন পাবনায় কোন দেশবিখ্যাত নেতা এসেছিলেন বলে মনে পড়ে না।

অনেক কিছু উত্তেজনা চলছিল। তবে কাপুরুষের পক্ষে অজুহাতের অভাব কখনও হয় না। বাবা মাকে খুব জোর করে বোঝাতে হল না, নিজেই বুঝে ফেললুম আমার বয়সে আন্দোলন করার চেয়ে বিদ্যার্জনই বেশী প্রয়োজনীয়। গিরীন এবং আরো কয়েকজন অবশ্য 'করা' এবং 'পড়া' দুইয়ের সমন্বয় সাধনে পটু। এই সময়ে বাবা মা আমাকে বাড়ির কাজে বিশেষ করে ব্যস্ত রাখার নানা ব্যবস্থা করলেন। আগেই বলেছি বাবা নিজের কাজ করতে ভালবাসতেন। বাড়িতে যদিও দুজন রাত-দিনের কাজের লোক ছিল, তবুও আমাকে বাড়ির সব কাজ শিখতে হল। ভাল করে ঘর ঝাঁট দেয়া, পায়খানা, স্নানের ঘর ভাল করে ঝাঁট দিয়ে, ধুয়ে পরিষ্কার করা, ভিজে কাপড় দিয়ে ঘরের মেঝে মোছা, ঘরের দেয়ালের, ছাতের ঝুল ঝাড়া, কাপড় কেচে নীল দিয়ে, মাড়ে ডুবিয়ে তুলে কাপড় ধোয়া, সেগুলি শুকিয়ে, পরিপাটি করে টেনে সুন্দর করে পাট করা, খাবার ও রান্নার বাসন মাজা, কেরোসিনের সেজলণ্ঠন এবং চিমনি উনুনের ছাই দিয়ে ঘষে মেজে পরিষ্কার করা, খাবার জন্যে মাটিতে আসন পেতে, পরিবেশন করা, এসব কাজ ক্রমশ শিখলুম। পরিণত বয়সে আমার এই সব গুণাগুণ উল্লেখ করে আমার বন্ধুর স্ত্রীরা স্বামীদের যদিও ভর্ৎসনা করতেন, কিন্তু তা হলেও এ সব গুণ আমার আছে বলে, আমার প্রতি বাড়তি অনুরাগের কোন লক্ষণ দেখিনি। আমারই মন্দ কপাল! মায়ের শাড়িগুলি আমি সবচেয়ে মন দিয়ে করতুম। ধোবার বাড়ি থেকে সেগুলি কেচে এলে আমি আবার জল-

কাচা করে, শুকিয়ে, সেগুলি সরু সরু করে কুঁচিয়ে, বিঁড়ে পাকিয়ে, বাংলার '৪' আকার করে আলনায় টাঙিয়ে রাখতুম। তখনকার দিনে মেয়েদের পক্ষে ধোবার বাড়ির পাটভাঙা শাড়ি পরা লোকে কুরুচির পরিচায়ক বলে মনে করত। অবশ্য সিল্ক বা জরির শাড়ি সম্বন্ধে সে-বিধি খাটত না। তবে মা আমাকে কখনও রান্না করতে দেননি, উনুন বা আগুনের কাছে পারতপক্ষে যেতে দিতেন না, পাছে গায়ে বা কাপড়ে আগুন লাগে। ফলে এখনও আমি ভাত রান্না করতে পারি না, অন্য রান্না ত দূরের কথা। পাবনাতেই আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ভাল করে পড়তে শুরু করি।

১৯২৮ সাল শেষ হয় হয়, এমন সময়ে বাবা আবার বদলি হলেন। এবার হলেন বর্ধমানে, দামোদর ব্যারাজ আর তার থেকে সেচের খালের জমি সরকার তরফ থেকে কেনার জন্য। বাবার উত্তরবঙ্গ পর্ব শেষ হল। পাবনা ছিল ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ঈশ্বরদি স্টেশন থেকে প্রায় কুড়ি মাইল পূর্বে। আগেই বলেছি ঈশ্বরদি থেকে পাবনায় বাসে যেতে হতো। একদিন রাত্রে আমরা ঈশ্বরদি স্টেশনে দার্জিলিং মেলে চড়লুম, পরের দিন ভোরবেলা কলকাতায় পৌঁছলুম। বাবা স্টেশন থেকে হাজরা রোড পর্যন্ত একটি ট্যাক্সি নিলেন। তখনকার দিনে প্রায় সব গাড়িতেই কাপড়ের ছাত হতো, ওঠানো নামানো যেত। তাদের বলত ট্যুরর। যেসব গাড়ির ছাত লোহার বা কাঠের হতো তাদের বলত সিডান।

তখনকার দিনে শীতের ভোরে কলকাতার প্রশান্ত আকাশের স্মৃতিতে এখনও আমার মন আপ্লুত হয়। যদি তখন গান জানতুম, তাহলে বলতুম কলকাতার এই মুহূর্তটির পক্ষে আদর্শ রাগ ছিল রামকেলি অথবা ভৈরবী। নির্মল, নিষ্কলঙ্ক মুক্তোর মতো কোমল, দ্যুতিময় আকাশের পক্ষে একমাত্র ঐসব রাগে কণ্ঠসঙ্গীতই প্রশস্ত। পরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গলায় রামকেলি শুনে আমার কলকাতার শীতের প্রত্যূষের দৃশ্যই মনে সবচেয়ে বেশী জেগে উঠত। বেশ কিছুদিন পরে যখন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের 'আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ' প্রথম পড়ি, তখন মনে হয়েছিল, তিনি কলকাতা সম্বন্ধে আমার ছেলেবেলার স্মৃতিই হুবহু ব্যক্ত করেছেন : 'পৃথিবী এর চেয়ে সুন্দর কিছু দেখাতে পারে না!'

বসনের মতো নগরী পরেছে
ভোরের সৌন্দর্য ; শায়িত, স্তব্ধ, নগ্ন।
জাহাজ, চূড়া, গম্বুজ, নাট্যশালা, মন্দির।

সুপ্ত, নগ্ননারীদেহরূপী নগরীর বর্ণনা। জর্জোনের সুপ্ত ভিনাস ছবিটির প্রিণ্ট যখনই দেখি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের লাইনগুলি মনে পড়ে যায়। শেয়ালদহ স্টেশন থেকে

বেরিয়ে যখন বৈঠকখানা বাজারের পাশ দিয়ে ভোরে আসি তার কথা অনেকদিন পরে 'মাই ফেয়ার লেডি' ফিল্মটির কভেণ্ট গার্ডন বাজারের দৃশ্য মনে পড়ে যায়।

তখনই অত ভোরে, লোয়ার সার্কুলার রোড জল দিয়ে পরিষ্কার করে ধোয়া হয়ে গেছে। যে-লোকরা জোড়ায় জোড়ায় পাইপ নিয়ে একটু আগে রাস্তা ধুয়েছে, তারা তাদের লম্বা অজগরের মতো জলের হোজপাইপ ঘাড়ে তুলে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে পরের কলের সঙ্গে প্যাঁচ দিয়ে জুড়ে দিচ্ছে। যেই কল খুলে দেয়া, অমনি পটপট করে ছোট পটকার মতো শব্দ করতে করতে পাইপের হাওয়া ঠেলে পাইপ ফুলিয়ে টপটপ শব্দ করে অল্পক্ষণের মধ্যেই জল তোড়ে বেরিয়ে রাস্তা ভাসিয়ে দিতে লাগল। হোসের লোকদুটি ক্ষিপ্রহাতে পায়ে-চলা পথিক আর গাড়ি ঘোড়া বাঁচিয়ে, সে জলের স্রোত এদিক ওদিক চালাতে লাগল। ধোয়া রাস্তায় যখন আমাদের ট্যাক্সি পড়ল, তখন ভিজে রাস্তায় তার রবার টায়ার ট্যাপ, ট্যাপ, ট্যাপ, শব্দ করতে করতে চলল, যেন ফ্রেড এস্টেয়ারের নরম ট্যাপ নাচ। তার ছন্দে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। জেগে উঠে দেখি ১৩।২ হাজরা রোডে ট্যাক্সি পৌঁছেছে, মামাবাবু আমাকে হাত ধরে নামাচ্ছেন। ইতিমধ্যে যদু ভট্টাচার্য লেন থেকে মামাবাবু বাড়ি বদল করেছেন।

যেসব রাজনৈতিক ঘটনা তখন ঘটেছিল, জনসাধারণ তখন সেগুলিকে কিভাবে নিয়েছিল, সে-কথা আমি লিখতে বসিনি। সংবাদপত্র ঘেঁটে তার পুনরুদ্ধার করা বা ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। ঐ বয়সের স্মৃতি আমার কতটুকু, কিভাবে মনে আছে বুকে হাত দিয়ে বলা শক্ত, তার কারণ পরে ইতিহাসে যা পড়েছি তা অনায়াসে স্মৃতি হিসাবে আমার মনকে ঠকাতে পারে। সে-সব বইয়ে পড়া কথা এতদিন পরে স্মৃতি বলে চালিয়ে বাহাদুরি নেবার ইচ্ছাও মনে উঁকিঝুঁকি মারা স্বাভাবিক। আমার যেটুকু যেমন ভাবে মনে আছে শুধু সেইটুকুই লিখব, এই আমার সংকল্প। মুস্কিল হচ্ছে স্মৃতির দ্বারে ধাক্কা দিলেও অনেক সময়ে জবাব মেলে না, বিশেষত সে-যুগের যে-সব ঘটনা আমার নিজের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল না। অতএব ১৯২৮-২৯ এই দশ এগারো বছরে দেশব্যাপী যে-সব ঘটনা ঘটেছে, তার যতটুকু যেভাবে আমার মনে এখনও লেগে আছে, সেইটুকুই মাত্র বলব। বই দেখে শুধু তাদের সনতারিখটুকু বড় জোর মিলিয়ে নেব, কারণ স্মৃতিতে ঘটনাস্রোত অনেক সময়ে জট পাকিয়ে গুলিয়ে যায়। লিখিত ইতিহাসের উপরেও মোটামুটি সজাগ বালকবিশেষের নিজস্ব স্মৃতিকথার কিছু মূল্য থাকতে পারে এই বিশ্বাসে আমি লিখছি। বিস্মরণের তলায় অনেক

কিছুই তলিয়ে গেছে, ফলে আমার বর্ণনায় কিছু কিছু ভুল থাকা স্বাভাবিক। সে যা হোক, আমার কথায় ফিরে আসি।

১৯২৮ সালের বড় দিন উত্তেজনার মধ্যে শুরু হয়। সামান্য ছোটখাট ঘটনাও তখন অলৌকিক বলে মনে হতো। ছুটির পরে বাবা কি রেলপথে বর্ধমানে গিয়ে নতুন কাজে যোগ দিতে পারবেন, না দেশব্যাপী রেল ধর্মঘটে আটকা পড়বেন? পার্ক সার্কাসে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে কত লোক হবে? কিন্তু পার্ক সার্কাসটা কোথায়? ময়দানের কথাই ত শুধু জানি। জি. ও. সি. কাকে বলে? কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর নাম জি. ও. সি. কেন হল?

মামাবাবুর সঙ্গে একদিন পার্ক সার্কাস গেলুম। সেদিন শুনলুম সুভাষবাবু দেশের নেতাদের প্রধান রক্ষী সেজে পার্ক সার্কাসে যাবেন। দেখি তিনি ফৌজের মতো-উর্দি পরে ঘোড়ার উপর চড়ে আসছেন। দেখে মনে হল যেন একটু বেশী বীরপুরুষের মতো দেখাচ্ছে, ঘোড়ার উপর খাড়া হয়ে বসে, বুক চিতিয়ে। বাবা বেশ ভাল ঘোড়া চড়তেন, তাঁকে কিন্তু বেশ স্বাভাবিক দেখাত, যেন ঘোড়ার সঙ্গে বেশ মিলিয়ে বসে আছেন, চেষ্টা করে বসে থাকতে হচ্ছে না। তবে একটা কথা সুভাষবাবু ত ফৌজের উর্দি পরেছেন, সেজন্যে হয়ত ইচ্ছা করে বেশী খাড়া হয়ে আছেন। কংগ্রেসের উপলক্ষ্যে যে মেলা বসেছিল সেটি ছিল যেমন বড় তেমন দেখার মতো। এত বড় মেলা এবং এত রকম জিনিস আমি আগে কখনও দেখিনি; এর তুলনায় কাঞ্চননগরের মেলা ছিল যেন চক্রবেড়িয়াতে চড়কের মেলা। তাছাড়া, জামসেদপুরে ছাড়া, আমি সারা দেশ থেকে আগত এত বিচিত্র জাতি সমাবেশও আগে কখনও দেখিনি। শিখ আর পাঠানরা ছিল সবথেকে দেখবার মতো। কোন দিন কি আমার শরীর তাদের মতো হবে? হলে কি মজাই না হয়! হঠাৎ, কোথা থেকে যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, হৈহৈ রৈরৈ শব্দ, লোকজন ছিটকে এধার-ওধার পালাতে লাগল। কোথা থেকে যেন মানুষের বন্যা ছুটে এল, হাতে তাদের নানা রঙের, নানা ধরনের পতাকা, সাজগোছ মোটেই পরিপাটি নয়, সুন্দর ত নয়ই, বরং যেন কলকারখানার মজুরদের পোশাক। দলে দলে তারা কংগ্রেস সভাস্থলে ঢুকে প্যাণ্ডাল ভরিয়ে দিল, এমন কি মঞ্চে উঠে সেটিও ভর্তি করে ফেলল। মামাবাবু আমাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

তখনও খবরের কাগজ পড়া শুরু করিনি। পরের দিন মামাবাবু আর বাবা নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন, শুনলুম একদিকে মজুররা আর অল্পবয়স্ক নেতারা, অন্যদিকে বয়স্ক নেতাদের মধ্যে পূর্ণ স্বরাজের প্রশ্ন নিয়ে কলহ বেধেছে, অল্প-বয়সীরা বয়স্ক নেতাদের কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে হঠাতে চায়। আমার মনে তখন পূর্ণ

স্বরাজ কথাটি বিশেষ দাগ কাটেনি, বয়স যদিও এগারো। পূর্ণ স্বরাজের চেয়ে সারা বড়দিনের ছুটিতে ছোটকী রোজ রোজ যে ফুলকপি দিয়ে গল্‌দা চিংড়ি বা পারশে বা ট্যাংরা মাছের ঝাল রাঁধতেন সে সব অনেক বেশী কাম্য মনে হতো।

তখন দিদির বিয়ে প্রায় তিন বছর পূর্ণ হয়েছে, সুতরাং তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বেশ ফুটে উঠেছে। বড়দিনে আমাদের থিয়েটারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা দিদি করল। কর্নওয়ালিস রোডের কর্নওয়ালিস থিয়েটারের একতলার টিকিট্ কাটা হল। শরৎচন্দ্রের ষোড়শী। শিশির ভাদুড়ী জীবানন্দ, প্রভা ষোড়শী। একটি দৃশ্যে জীবানন্দ আর ষোড়শী পরস্পরের খুব কাছাকাছি এবং মুখোমুখি এসেছেন। যদি আলিঙ্গন হয় তারপর কী হবে সে-আশায় উদ্‌গ্রীব হয়েছি, এমন সময়ে আমার বাঁ পাশে বসা দিদি আর মেনিমাসীমা বোঁ করে হাত দিয়ে আমার মাথা তাঁদের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন, ডানদিক থেকে ছোটকী হাত দিয়ে ভাল করে দিদিদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বল্লেন, ওদিকে চাও। নিজেদের আমোদ জলাঞ্জলি দিয়ে শিশুচরিত্র রক্ষার কী অসীম আগ্রহ! আমাদের শৈশবে এই ছিল ব্যবস্থা। আজকাল ছেলেবুড়ো সকলে মিলে ভিডিও দেখার ব্যবস্থা ও আগ্রহের কথা ভেবে দেখুন! ভিডিওতে কায়িক যৌন অঙ্গভঙ্গী ত বটেই, ঠারে ঠারে জঘন্য ইঙ্গিতেরও বিরাম নেই। সবচেয়ে যা বেশী অশ্লীল তা ঘিনঘিনে ন্যাকামি। অবশ্য এও সম্ভব যে ছেলেবয়স থেকে এসব দেখা গা-সওয়া হয়ে গেলে বড় বয়সে তার বীভৎস স্মৃতি বোধ হয় দাগ রাখে না। মন হয়ত অনেক সুস্থ ও পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে পরে আবার আসা যাবে।

বাবা আমাদের কলকাতায় রেখে প্রথমে একাই বর্ধমানে যান। বাঁকা নদীর দক্ষিণে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর একটি দোতলা বাড়ি ভাড়া নেন। বাড়িতে ঢোকার দুটি গেট ছিল, একটি বড় গাড়িবারান্দা ছিল, তার সমস্তটির উপরে দোতলায় একটি মস্ত ঘর ছিল, প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা আর কুড়ি ফুট চওড়া। রাস্তার উপর তিনটি বড় বড় মেঝে পর্যন্ত জানলা ছিল এবং দুপাশে দুটি করে ঐ ধরনের জানলা। ভিতর দিকে তিনটি বড় বড় দরজা ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বাড়িটির পিছন দিকের বাগান, কিছুটা বিষবৃক্ষের বাগানের কথা মনে করিয়ে দিত। একদিকে উত্তর-দক্ষিণমুখো বেশ লম্বা ও গভীর পুকুর, তাতে দুটি মুখো-মুখি বাঁধানো ঘাট ছিল। বাগানময় ছিল ঘুরে ফিরে বেড়াবার ইঁটের কেয়ারি-করা রাস্তা; নানা ভাগ ছিল, যেমন দিশি আম, কলমের আম, লিচু, পেয়ারা, কাঁঠাল। তা ছাড়া ছিল কাগজি আর পাতিলেবুর গাছ, বাতাবি লেবু, কামরাঙা, কুল ইত্যাদি। কেয়ারির ধারে ধারে ফুলের গাছ ও লতা : করবী, জুঁই, মালতী, বেল,

তাছাড়া শিউলি, বকুল। ১৯৮৬ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতার পথে ফেরার সময়ে বাড়িটি, নতুন করে সমস্তটি মেরামত হয়ে, লোকে বাস করছে দেখে, বেশ ভাল লাগল।

এত বছর উত্তরবঙ্গে থাকার পর, তখনকার দিনের সেরা মফস্বল শহর বর্ধমানে এসে বেশ অবাক হয়ে গেছলুম। উত্তরবঙ্গের চেয়ে বর্ধমানে বৃষ্টি অনেক কম হতো, সুতরাং শহরটি মোটেই জঙ্গলে ভর্তি মনে হতো না। অন্য সব দিক দিয়েই বর্ধমান শহর অনেক বেশী চাঁচামোছা, সাজানো আর পরিষ্কার দেখাত। দার্জিলিঙ আর রংপুরের কিছু কিছু অংশ ছাড়া উত্তরবঙ্গের যত শহর দেখেছি সবই দেখে যেমন মনে হতো এলোমেলো গজিয়ে ওঠা বসতি তা নয়। তার একটি বড় কারণ হচ্ছে যে বর্ধমানে কোন বাড়িতেই মুলিবাঁশের বা দরমার দেয়াল ছিল না, অধিকাংশ বাড়িই ছিল ইঁটের। যা কিছু মাটির বাড়ি ছিল, তাদেরও দেয়াল সর্বদা এত ভাল করে কাদা ও গোবর দিয়ে লেপা থাকত যে প্রায় চুন-সুরকির দেয়ালের মতো দেখাত। বর্ধমানই আমার জীবনে বাংলার প্রথম শহর যা দেখে মনে হল বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে আস্তে আস্তে, ভেবে চিন্তে, যত্ন করে গড়ে তোলা, এবং অনেক যুগ ধরে এখানে মানুষ শহুরে আবহাওয়ায় বাস করছে। পৌর সংগঠন আর পৌরব্যবস্থাও বেশ ফলাও করে চালু। তাছাড়া দেখে তারিফ করার মতো অনেক জমকালো জিনিস শহরটিতে ছিল। সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে, শহরটির একটি বেশ তৃপ্তিকর সার্বিক ভাবচ্ছবি ছিল। তার কারণ, কয়েক পুরুষ ধরে বর্ধমানের রাজারা ধীরে ধীরে প্ল্যান করে শহরটি নানা ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করেন। রাজপ্রাসাদটির কথাই ধরা যাক! যেমন বিস্তৃত আর বড়, তেমনি তার মধ্যে অনেকগুলি চকমিলান মহল ছিল, প্রত্যেক মহলে তার স্থাপত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। বেশ বোঝা যায়, যখন রাজবাড়িটি প্রথম হয় তখন পুরোপুরি রাজস্থানী প্রাসাদের প্ল্যানে হয়, তার পরে ক্রমশ বৃটিশ প্রভাব আসে পুরনো প্রাসাদের বাড়ানো অংশগুলিতে। যেমন রাজবাড়ির সদর দিকটি লালবাগের মুর্শিদাবাদ নবাববাড়ির, অর্থাৎ হাজারদুয়ারির কথা মনে করিয়ে দেয়, এবং সেই সঙ্গে কিছুটা কলকাতার রাজভবনের কথা। প্রাসাদ আর তার চতুর্দিক নিশ্চয় শহরের কেন্দ্র হিসাবে পরিকল্পিত হয়েছিল। প্রাসাদের সিংহদরজার সমুখ দিয়ে ঘুরে চলে গেছে প্রধান রাজপথ। শহরের মেরুদণ্ডের মতো বিজয়চাঁদ রোড প্রধান রাজপথ হিসাবে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিম ধারে ইংরেজ আমলের কাছারি পাড়ায় গিয়ে মিশেছে। যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে উঠেছে মিশ্র ইওরোপীয়—মুঘল আদলে নির্মিত কার্জন তোরণ। এখন নাম হয়েছে বিজয় তোরণ। শহরের ভিতরে স্থানে স্থানে ছিল রাজাদের খনন করা

বড় বড় সরোবর, সবগুলির দৈর্ঘ্যই হিন্দু ঐতিহ্যমতে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। প্রতিটি এত বড় যে তাদের এখনও সাগর বা সায়র বলা হয়। ছোট আকারের সরোবরও ছিল, যেমন ধলদিঘি। প্রত্যেকটি পাড়ের মধ্যস্থলে একটি বড় বাঁধানো ঘাট। নামকরণও সুন্দর সুন্দর, কৃষ্ণসায়র, শ্যামসায়র। খুব সাজানো একটি বড় প্রমোদ উদ্যানও ছিল, নাম গোলাপবাগ, তার মধ্যে ছিল একটি ছোট প্রাসাদ। সেই বাগানে এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হয়েছে, নাম তারাবাগ।

গোলাপবাগে ছোট কিন্তু ভারি ছিমছাম, সাজানো একটি চিড়িয়াখানা ছিল, কলকাতার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু অনেক পরিপাটি। জন্তুশালাটিতে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য ও উপভোগ্য জন্তু ছিল ; একটি মাঝারি আকারের গরিলা। সেটিকে দেখতে গেলে দু পয়সা দিয়ে একটি নতুন হুঁকো কেনার রেওয়াজ ছিল। হুঁকোর সঙ্গে অবশ্য থাকত তামাক সাজা জলন্ত কলকে। গরিলাটির দিকে তামাক সাজা হুঁকোটি এগিয়ে দিলে সে এগিয়ে এসে সেটি আপনার হাত থেকে তার নিজের প্রকাণ্ড বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে নিত। তার পর আস্তে আস্তে খাঁচার উল্টোদিকে গিয়ে বসত। এত ধীরেসুস্থে কাজটি করত, মনে হতো যেন বেশ আরামে মৌজ করার ব্যবস্থা করছে। তার পর হুঁকোর ফুটোয় মুখ লাগিয়ে এক নিঃশ্বাসে প্রচণ্ড দম মারত। ফলে যা ঘটত ভয় লেগে যেত। হুঁকোটির নলচেটি উপর থেকে নিচে পর্যন্ত আগুন ধরে ফেটে গিয়ে হুঁকোর খোলাটি সুদ্ধ পুড়ে যেত। গরিলাটি তখন জলন্ত হুঁকোটি খাঁচার দূরের কোণে ছুঁড়ে দিয়ে, শিবনেত্র হয়ে, স্থির হয়ে তার নিজের কোনে ধ্যানে বসত, এবং অনেকক্ষণ ধরে তামাকের ধোঁয়া নাকের দুটি ফুটো দিয়ে খুব আস্তে আস্তে বের করত। যতক্ষণ না সবটুকু ধোঁয়া বের হতো, ততক্ষণ গরিলা নড়ত না।

সারা শহরময় বড় বড় খেলার মাঠ ছিল। কাছারির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আর দেওয়ানি কাছারির মাঝখানে ছিল টাউন হল আর আফতাব ক্লাব। দুটিই সুন্দর দেখতে। শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল অনেক। ছিল রাজাদের প্রতিষ্ঠিত রাজ কলেজ, মেডিক্যাল স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, অন্যান্য স্কুল, তাছাড়া ছিল সংস্কৃত টোল, আরবী মাদ্রাসা, ফারসী মক্তব। কয়েকটি মিশনারি স্কুলও ছিল। কাছারি-পাড়ার পুবদিকে সে-সময়ে গড়ে উঠছে একটি মেয়েদের স্কুল। এ সব ছাড়াও ছিল বিভিন্ন ধর্মের উপাসনার জন্য মন্দির, মসজিদ, গির্জা, বর্ধমান রাজের নিজস্ব সর্বমঙ্গলা মন্দির এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাঠান আমলে গড়া জুমা মসজিদ। বিজয় তোরণের পাশে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর ছোট্ট সুন্দর গির্জা। শহরের উত্তর পশ্চিম

প্রান্তরেখায় নিশানা হিসাবে ছিল একশ' আট শিবমন্দির, শের আফগানের কবর। শের আফগানকে পরাস্ত করে বাদশা জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে বিবাহ করেন।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে নমস্কার, সেলাম বা গল্প করার মধ্যেও ছিল এক ধরনের ধীর স্থির, অমায়িক বিশ্রান্ত ভাব। উত্তরবঙ্গের মতো কাটা কাটা ব্যস্ততার ভাব নিয়ে কথা বলার রীতি নয়। এমন কি গতর-খাটা স্ত্রীপুরুষদের দেখেও মনে হতো বেশ ঢিলে-ঢালা, মিশুকে।

শুধু তাই নয়। উত্তরবঙ্গের যে-কোন শহরের থেকে বর্ধমান শহরে ছিল অনেক বেশী কল-কারখানা, তৈরি হতো অনেক ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিস। ছিল অনেক-গুলি কামারশালা, ধাতুঢালাইয়ের কারখানা, লোহার, পিতল কাঁসার। তাছাড়া কুমোরশালা ছিল বিস্তর, দু তিনটে বড় কুমোরপাড়া ছিল। বাঁকা নদীর দুই ধার ধরে ছিল ইঁট আর টালি তৈরির খোলা। দামোদর নদীর কাছে ছিল লোহার ছুরি কাঁচি, অস্ত্রশস্ত্র তৈরির প্রসিদ্ধ গ্রাম, কাঞ্চননগর। বৃটিশপূর্ব যুগে বর্ধমান-রাজের সৈন্যসামন্তর জন্যে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা ছিল ঐ গ্রাম। বর্ধমান রেলওয়ে জংশনের কাছে ছিল বিরাট রেলএঞ্জিন মেরামতের কারখানা, বা লোকো শেড। সব মিলিয়ে ষাট বছর আগে বর্ধমান শহরকে অনায়াসে একটি শিল্পনগরী বলা যেত। তাছাড়া ছিল অনেক পাইকারি ও খুচরো বাজার। কাঁচা মাছ ও সব্জির দৈনিক বাজার ত ছিলই, প্রায় প্রতি বড় পাড়ার মধ্যে অন্তত একটি করে। এসব ছাড়াও ছিল রাজবাড়ি সংলগ্ন বড়বাজার, কলকাতার পোস্তা বাজারের ছোট সংস্করণ। নানাধরনের বিশেষ বিশেষ সামগ্রীর দোকানও ছিল প্রচুর। মিষ্টান্নের জগতে বর্ধমানের নিজস্ব নাম ছিল; সবচেয়ে নামকরা মিষ্টি ছিল মিহিদানা আর সীতাভোগ। প্রথমটির উপাদানে ছিল বেসন, দ্বিতীয়টির চালগুঁড়ো। তৃতীয় একটি নামকরা মিষ্টি ছিল খাজা, থাক থাক পাতলা ঢাকাই পরোটার মতো-পর্দা করা ময়দা দিয়ে তৈরি, লুচির আকারে বেলা ও ভাজা গোল মিষ্টি, চিনির রসে ফেলে তোলা। এটি মুসলমান সংস্কৃতির অবদান। তাছাড়া ছিল নিকটবর্তী স্থান মানকরের কদমা বাটা দিশী চিনি জমিয়ে ছাঁচে ঢালা, সেটি স্থানীয় লোকসংস্কৃতির দান। শক্তিগড় বলে বর্ধমান থেকে মাইল দশেক দূরে আরেকটি পানতুয়ার মতো মিষ্টি হতো—নাম ল্যাংচা।

খোসবাগান পল্লীতে তখন নামকরা ডাক্তারদের একটি পল্লী গড়ে উঠতে শুরু করে। এটি এখন অনেকগুলি নার্সিংহোম নিয়ে বেশ বড় হয়েছে। বিচার ও আইন জগতেও বর্ধমানের বিচারক ও উকিলদের বেশ নামডাক ছিল। সব মিলিয়ে

বর্ধমানের আপামর সকলেরই অবস্থা উত্তরবঙ্গের শহরের থেকে বেশী সচ্ছল ছিল। নতুন নতুন জীবিকাও সৃষ্টি হতো প্রচুর।

শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা ও পেশাগত সমৃদ্ধির ফলে বর্ধমানে নতুন বাড়ি এমন কি পল্লী-নির্মাণের হিড়িক সে সময়ে বেশ শুরু হয়েছে। সরকারী দপ্তর বা আজকালকার মতো সরকারের তৈরি পল্লী নয়। সবই প্রায় আলাদা আলাদা জমির উপর বাড়ির সমষ্টি। নতুন বাড়ির মালিকরা সকলেই ছিলেন বর্ধমানের অধিবাসী। বাবা যে-কয় বছর ছিলেন, অর্থাৎ ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত, সে-কয়বছরে শহরের সারা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে, অর্থাৎ দক্ষিণে বাঁকা নদীর ধার থেকে শুরু করে, উত্তরে রেলস্টেশন পেরিয়ে গোলাপবাগের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত, সারা রাস্তার দুধারে আস্তে আস্তে বাড়ি, দোকান আর ব্যবসাকেন্দ্রে প্রায় ভরে গেল। রাস্তার দুধার জুড়ে বসতি ছাড়াও দুটি নতুন বড় বড় পল্লী গড়ে উঠতে শুরু হল। একটি হল আজকাল যাকে বলি কালীবাজার, অর্থাৎ বাঁকার উত্তর তীর ধরে টাউন স্কুল থেকে পুব দিকে চলে গেছে। অন্যটি হল টাউন-হল পাড়া, পরে সেটি কালীবাজার পাড়ার সঙ্গে সামিল হয়ে যায়। যদি মনে রাখি এই যুগটি ছিল সারা বিশ্বময় অর্থ নৈতিক মন্দার কাল, তাহলে এই সন্ধিক্ষণে গৃহনির্মাণে বর্ধমানে যে পরিমাণে লগ্নি হয়েছিল তার পরিমাণ কিছু কম নয়। তখনকার কালে বর্ধমানের যে সঙ্গতি ছিল তার সঙ্গে আমাদের কালে কলকাতার বিধাননগরে লগ্নির অনায়াসে তুলনা চলে।

এত ভণিতার মূলে আসল বক্তব্যটি বলি। বর্ধমানের বাসিন্দারা নিশ্চয় মনে করতেন তাঁদের সঞ্চিত বিত্ত কলকাতায় না খরচ করে বর্ধমানে করাই শ্রেয়। কলকাতায় পাট উঠিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবতেন না। অর্থাৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক, পৌর সুখ-সুবিধা ও বিদ্যার্জনের কেন্দ্র হিসাবে বর্ধমানকে কলকাতার সঙ্গে প্রায় সমান স্থান দিতেন। আসলে, চিত্ত, উদ্যম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বর্ধমানের নিজস্ব গরিমার কারণ প্রচুর ছিল।

আমার নিজের কথা বলি। দিনাজপুর, পাবনা শহরের কাঁচা রাস্তায় চালানর পর বর্ধমানের প্রকাণ্ড গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও বিজয়চাঁদ রোডের পিচমোড়া রাস্তায় বনবন করে সাইকেল চালিয়ে ঘুরতে আমার খুব ভাল লাগত।

১৯২৯ সালের গোড়ায় আমি বর্ধমান টাউন স্কুলের ক্লাস নাইনে ভর্তি হই। টাউন স্কুলের তুলনায় মিউনিসিপাল স্কুলের ছিল বয়সের কৌলীন্য। আমাদের স্কুল নতুন তৈরি হয়েছে, ১৯২৪ সালে। সব কিছুই প্রশস্ত আর মনোরম, ক্লাসঘরগুলিতে বড় বড় জানলা, দরজা, যথেষ্ট আলো হাওয়া। মস্ত বড় দুটি খেলার মাঠ। একটি

ফুটবলের, অন্যটি বাস্কেটবলের ও ভলিবলের। মাঠের মধ্যিখানে বড় পুকুর, সাঁতার কাটার জন্যে। মিউনিসিপাল স্কুলের পড়াশোনায় সুনাম ছিল, কিন্তু টাউন স্কুলের সুনাম তখন দ্রুত প্রসারের মুখে। ব্যারাকপুর গভর্নমেণ্ট স্কুল থেকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বেনীমাধব ভট্টাচার্য এলেন। শিক্ষক ও অনুশাসক হিসাবে তাঁর ছিল দুর্জয় সুনাম। সরকার থেকে স্কুলটি সাহায্য পেত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। টাউন স্কুল নিজের সুনাম তৈরির জন্য ছিল খুব চেষ্টিত। মিউনিসিপাল স্কুলে ছাত্ররা রাজনীতিতে যোগ দিত। এখন মনে হয়, সেজন্যই বোধহয় আমাকে সেখানে ভর্তি না করে টাউন স্কুলে করা হয়।

ভাল গুরুর মতো কিছু নেই। নিজে নিজে অবশ্য অনেক কিছু শেখা যায়, তবে ভাল গুরু একাধিক জ্ঞানরাজ্য বা বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক যোগ এবং ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রথম থেকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারেন। বিভিন্ন জ্ঞানজগতের মধ্যে ওতপ্রোত সম্পর্ক কি, সেবিষয়ে অবশ্য পরবর্তীকালের গুরুরা আমাকে ভাল করে শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রারম্ভকালে আমার এমন গুরুর প্রয়োজন ছিল যাঁরা আমাকে জ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেবেন, জ্ঞানপিপাসা বাড়িয়ে দেবেন। এ বিষয়ে আমার বর্ধমান টাউন স্কুলের শিক্ষকরা আদর্শস্থানীয় ছিলেন বলা যায়। আমার আগের কোন স্কুলে তাঁদের সমকক্ষ কেউ ছিলেন বলে মনে পড়ে না। মহারানী গার্লস্ স্কুলের প্রতি আমি অবশ্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু সে কৃতজ্ঞতার ভিত্তির কতটা স্নেহাশ্রিত, কতটাই বা জ্ঞানাশ্রিত বা বোধাশ্রিত, সে বোঝার শক্তি আমার তখনও হয়নি। টাউন স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত, অনন্তকুমার শাস্ত্রীমশাই, খেলার মাস্টার সুচাঁদবাবু, অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ধর্মদাসবাবু, মুরারিবাবু, এঁদের ঋণ শোধ করার কথা আমি ভাবতে পারি না। সর্বোপরি ছিলেন হেডমাস্টার বেণীবাবু। আমার এখনও খুব খেদ হয়, আমি বড় হয়ে কখনও বেণীবাবুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করিনি। তবে ১৯৫৫ সালে মুরারিবাবু, সুচাঁদবাবুর সঙ্গে যে দেখা হয়েছে, তাতে আমি বিশেষ কৃতার্থ বোধ করেছি। ১৯৮৬ সালে তার মৃত্যুর আগে শ্রীধর্মদাস চৌধুরীর সঙ্গে কিছু কিছু পত্রালাপ হয়েছে। ১৯২৯ সালে ক্লাস নাইন কাটিয়ে আমি ১৯৩০ সালে ক্লাস টেন-এ উঠলুম ঠিকই, কিন্তু তার পরের বছর আমি যদি ম্যাট্রিক দিতুম তাহলে আমার বয়স হতো চোদ্দ, ফলে বয়স বাড়িয়ে লিখিয়ে পরীক্ষা দিতে হতো। তা না করে বেণীবাবু উপদেশ দিলেন, ক্লাস টেন-এ ১৯৩০ ও ৩১ দুই বছর পরপর কাটাতে। তার ফলে ১৯২৬ সালে রংপুরে আমি যে ডবল প্রমোশন পেয়েছিলুম, সেটি কাটাকাটি হয়ে গেল। ১৯৩২ সালে ম্যাট্রিক দিলুম। ১৯৩০-এর অক্টোবর থেকে ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ পর্যন্ত বেণীবাবু আমাকে প্রতি সন্ধ্যায়

নিয়মিতভাবে প্রতিটি বিষয় পড়িয়েছেন, বিশেষ করে অঙ্ক। পারিশ্রমিকের অবশ্য কোন প্রশ্নই ছিল না, সে-কথা উত্থাপন করাও হয়নি। পারিশ্রমিকের কথা ছেড়ে দিলেও, দীর্ঘ দেড় বছর ধরে তাঁর মতো এবং বয়সের একজন হেডমাস্টারের পক্ষে একনাগাড়ে এই ধরনের কায়িক ও মানসিক ক্লেশ স্বীকার কথার কথা এখন কেউ ভাবতেই পারবে না।

পাবনায় যে শ্রেণীর সহপাঠী পেয়েছিলুম, বর্ধমানে সে-রকম পাইনি। পাবনার সহপাঠীরা সারা বিশ্বের দিকে আমার মনের কয়েকটি জানলা খুলে দিয়েছিল। বর্ধমানে আমার সহপাঠীরা সকলেই স্কুলের পড়াশোনায় বেশী মন দিত আমার মতো। জেলা জজ ছিলেন বীরেন্দ্রকুমার বসু, যেমন বিদ্বান তেমনি স্বাধীনচেতা, সরকারকে ঠুকতে পারলে আর কিছু চাইতেন না। তাঁর ছেলে অজয়কুমার বসু আমার বিশেষ বন্ধু হল, যেমন শান্ত মিষ্ট স্বভাব তেমনি বন্ধুবৎসল, বড় হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের জজ হয়। খেলোয়াড়দের মধ্যে বিশেষ বন্ধু ছিল মথুরা দে, এবং স্কুলের বাইরে সামন্তবাড়ির যাদু সামন্ত। মথুরা এখন কালীবাজারে থাকে; আমি খেলাধুলায় ভাল ছিলুম না, তবুও আমাকে তারা দলে নিয়েছিল। মিউনিসিপাল স্কুলের ছাত্ররা স্বদেশী আন্দোলনে ভিড়ে গেল, টাউনস্কুলের মাস্টার-মশাইরা আমাদের যেতে দেননি। বাড়িতেও স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা কমই হতো। মাঝে মাঝে বাবাকে মনখারাপ করে থাকতে দেখেছি, কিন্তু আমার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনদিন খোলাখুলি কথা বলেন নি। তবে কোনদিন খবরের কাগজ পড়ায় আমাকে বাধা দেননি, যদিও সেকালে ছাত্রদের মধ্যে খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস চালু হয়নি। মা বরং প্রায়ই স্বদেশীর উল্লেখ করতেন, যদিও তিনিও চাইতেন না আমার মন ওদিকে যায়। বাবার বন্ধুরা সকলেই সরকারী চাকরি করতেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক কিন্তু প্রখরবুদ্ধি ছিলেন শ্রীমনোরঞ্জন সরকার, তিনিই আমাকে ভারতের জনবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম বলেন। ১৯০১ সালের আদম স্থমারির প্রাথমিক ফলাফল তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। বলেছিলেন, ভারতে পুরুষের অনুপাতে স্ত্রী-সংখ্যা কম, যা নাকি ভারতবর্ষ ছাড়া খুব কম দেশেই আছে। তার মানে ভারতে পুরুষদের অনুপাতে স্ত্রীলোকরা বেশী মারা যায়, তাদের স্বাস্থ্য ও আহার সম্বন্ধে উপেক্ষা বেশী হয়। তাছাড়া বলেছিলেন আমাদের অত্যল্প সাক্ষরতাহারের কথা, অতি অল্প গড়পড়তা আয়ুর কথা, কৃষির উপর অতিনির্ভরতার কথা। তিনি আমার মনে ঐ বয়সে যে বীজ পুঁতেছিলেন পরে তার অঙ্কুরোদ্গম হয়; ১৯৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি জনবিজ্ঞানের ছাত্র এবং এই বিদ্যাই আমার সর্বপ্রধান সাধনা বলা যায়।

বাড়িতে অথবা বাইরে আলোচনার সুযোগ না থাকলেও খবরের কাগজে যে সব সংবাদ ছাপা হতো তাতে বিচলিত না হয়ে উপায় ছিল না। তবে এটা ঠিক যে বীরপুরুষের যোগ্য কিছু কিছু চিহ্ন আমার শরীরে বা মনে কোন কালে ছিল না, এখনও নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি বাবা ও মা আমার মনে 'অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহে' তার সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা ও বিতৃষ্ণা ফুটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। শারীরিক অত্যাচার বা শাস্তি বিষয়ে আমাকে কাপুরুষ বলাই ঠিক হবে। যারা শারীরিক অত্যাচার বা শাস্তিকে ভয় পায় না, তাদের আমি ভক্তি করি। আরো ভাবি, যারাই শারীরিক অত্যাচার সহ্য করেছে তারা সবাই হাসিমুখে করেছে। এ যেন জীবিতাবস্থাতেই অমরত্ব লাভ করার মতো।

সব মিলিয়ে বলতে গেলে, ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত যে সব রাজনৈতিক বা স্বদেশী ঘটনা ঘটে তার বিশেষ কিছুই আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে হুড়োহুড়ি করে অনেক কিছু ঘটে গেছল। সে যাই হোক, যৎসামান্য মনে আছে তাই বলি। প্রথমেই যা মনে আছে, তা হল ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে বেশ কিছু ইংরেজ রাজকর্মচারীর হত্যার কথা। হত্যা নিশ্চয় খারাপ কাজ, তবুও তখনকার দিনে ইংরেজ খুন হয়েছে এ খবরে কোন ভারতীয়, বিশেষত বাঙালীর পক্ষে, উৎফুল্ল না হওয়া অসম্ভব ছিল ; খবরটি নিয়ে সে অন্য কারোর সঙ্গে আলোচনা করুক বা না করুক। ১৯২৯ সালের কথা আরেকটু ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে, দুটি ঘটনা আমার মনে বিশেষ রেখাপাত করে। একটি ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্তর কীর্তি। অন্যটি যতীন দাসের চৌষট্টি দিনব্যাপী অনশন ধর্মঘট ও মৃত্যু। এই দুটি ঘটনার তুলনায় গান্ধীজির দাণ্ডি অভিযান বা অসহযোগ আন্দোলনও আমার মনে তেমন দাগ কাটেনি। বরং একটু মিনমিনে লেগেছিল। অথচ দাণ্ডি অভিযান আর আইন অমান্য আন্দোলন লক্ষ লক্ষ ভারতীয়কে সহসা জাগিয়ে তুলেছিল। আমার এখনও মনে হয় একদিকে সন্ত্রাসবাদ, অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য এই দুই আন্দোলন একই সময়ে পাশাপাশি না ঘটলে ভারতীয় আন্দোলন পরিপূর্ণ, নিটোলরূপ ধারণ করত না। গোলটেবিল বৈঠক বিষয়ে আমার জ্ঞান খুব কমই ছিল, অজ্ঞই ছিলুম বলা যায়। যেটুকু মনে আছে তার মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ ভাল লেগেছিল যে ইংলণ্ডে গান্ধীজি সর্বত্র সমাদর ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, এবং দিল্লীর দরিয়াগঞ্জ পল্লীতে ডাঃ আনসারির বাড়িতে স্বয়ং গিয়ে অর্ধনগ্ন ফকির গান্ধীজিকে বড়লাট আরউইন বিশেষ সম্মানভরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে সারা দেশ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো জেগে ওঠে। বিনয় বসু, বাদল, দীনেশ গুপ্ত, প্রীতিলতা

ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, মণিকুন্তলা সেন এবং আরো শতশত যুবক-যুবতীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত। সব থেকে গর্ববোধ হতো এই ভেবে যে সারা ভারতের মধ্যে বাঙালী মেয়েরাই অস্ত্র হাতে লড়েছে এবং পুরুষদের থেকে কোন অংশে কম সাহস ও আত্মাহুতি দেখায়নি। একটি ঘটনা আমাকে বিশেষ উত্তেজিত করে, সেটি হচ্ছে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খড়্গপুরের হিজলী জেলে নিরীহ, অস্ত্রহীন বন্দীদের গুলি করে হত্যা করা, বিশেষ করে সেখানে সন্তোষ মিত্রের মৃত্যু হয় শুনে। সন্তোষ মিত্র ছিলেন বাবার বিশেষ সম্মানার্হ বন্ধুর ছেলে। ১৯৩২ সালে আমি, ঠিক মনে করতে পারছি না, কোথায় পড়লুম যে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ভগৎ সিং ১৯৩১ সালে জেলে মৃত্যুর চিন্তা ঠেলে শান্ত মনে বই লিখেছেন, তার বিষয় ছিল **'Why I am an atheist'**, 'কেন আমি নাস্তিক'। সে সময়ে আমি রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের বিষয়ে বই পড়তে শুরু করেছি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভগৎ সিংএর কথা পড়ে খুব ভাল লেগেছিল।

বাইরের আন্দোলন থেকে সুরক্ষিত হয়ে নিজের মনে থাকার ব্যক্তিগত আরো কারণ ছিল। ১৯৩০ সালে আমার বয়স তেরো পূর্ণ হয়। আমার শরীরে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ যেন বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল। আমাকে প্রায় গ্রাস করার উপক্রম। এ বিষয়ে কেউ আমাকে সজাগ করে দেননি, শরীরে হঠাৎ কি তোলপাড় আসতে পারে সে সম্বন্ধে সাবধান করে দেননি। অনেক কিছু হুড়মুড় করে ঘটতে শুরু করল। হঠাৎ একদিন গলা ভেঙে গেল, অনেক আশা সত্ত্বেও আগের গলা আর কোনদিন ফিরল না, আমার দুর্ভাবনার সীমা রইল না। পরে এল আমার অণ্ডকোষ ঝুলে পড়ার পালা, আমি ভয় পেয়ে গেলুম। শরীরের মধ্যে অনেক কিছু যেন যখন তখন নড়ে চড়ে বেড়াতে লাগল, তাতে আমার কেবল মনে হতো আমি নিশ্চয় একমাত্র পাপী আর সতত কামলিপ্সায় মগ্ন। এতদিন পর্যন্ত মেয়েদের যে চোখে দেখেছি বা ভেবেছি, তা যেন বদলে গেল। তারপর এল ইডিপাস স্বপ্ন, যার ফলে অপরাধবোধের সীমা রইল না। কেউ বলল না যে দেশ, জাতি, মানুষ, আবহাওয়া, ভূগোল নির্বিশেষে পৃথিবীর সর্বত্র এই বয়সের ছেলে এ স্বপ্ন দেখে। ফলে, নিজেকে সর্বদা অশুচি, পাপবিদ্ধ মনে হতো, বেঁচে থাকার অযোগ্য ভাবতুম। বেশ কিছুদিন মায়ের চোখের দিকে আমি তাকাতে পারতুম না; আমার সঙ্কোচ লক্ষ্য করে মাও যেন শঙ্কিত হলেন। সারা ১৯৩০ সালই আমার বেশ আতঙ্কে কেটেছে। কেউ নিজে থেকে আমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি, আমিও ভয়ে, পাপবোধে, লজ্জায় কারোকে নিজে থেকে জিগ্যেস করতে সাহস পাইনি,

ভেবেছি ব্যাপারটা বোধ হয় জগতে একমাত্র আমারই ঘটছে। যখন ভাবি এখনও হয়ত অনেক সমাজ আছে যেখানে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সহজ স্বাভাবিক যৌনবিজ্ঞান শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনও হয়নি, তখন সমাজের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে আমার খুব রাগ হয়। যে সব দেশে এসব বিষয়ে এখনও পরিষ্কার, খোলাখুলি, বৈজ্ঞানিক, সহজবোধ্য স্কুলপাঠ্য বই বা ক্লাসে শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, সে সব দেশে ছেলে মেয়েরা এখনও কত কষ্ট পায় তাই ভাবি। আমার একমাত্র সম্বল ছিল লেখাপড়া। লেখাপড়ার জোরেই আমি পঙ্ক থেকে উদ্ধার পাই। রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরি থেকে যখন লুকিয়ে হ্যাভেলক এলিসের শরীর ও মনোবিদ্যা সম্পর্কিত বই এবং ছবি আমি পড়ি ও দেখি।

অন্য যে শাস্তি পেলুম তা ম্যালেরিয়া থেকে। প্রতিবছর জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত অমোঘ নিয়মের মতো আমি তিনবছর সমানে প্রতি পনেরো দিন অন্তর ম্যালেরিয়ায় ভুগতুম। ভাগ্যক্রমে প্রায়ই শনিবার জর শুরু হতো। সেজন্যে পনেরো দিনের মধ্যে দিন তিনেক ক্লাস বাদ পড়ত। নিত্য কুইনিন খেয়ে আমার কান আর যকৃতের দফা রফা হয়। বাঁ কানে কম শুনি, সারাজীবন দুর্বল পেট আমাকে কাবু করেছে। আমার সাথী হয়েছে দুর্ভাবনা, আধ-কপালে রোগ। এসব নিত্যসহচর নিয়েও কি করে দীর্ঘ, কর্মব্যস্ত জীবন কাটানো যায়, সে বিষয়ে আমি মনের সুখে বেশ লম্বা উপদেশ দিতে পারি। অবশ্য এই ধরনের রুগ্ন লোকের সঙ্গে থাকতে হলে বাড়ির পরিজনদের ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অসীম ধৈর্য ও ক্ষমাগুণ থাকা আবশ্যক, না হলে তাঁরা এরকম আপদ বেশীদিন সহ্য করতে পারবেন না। সেরকম পরিজন ও বন্ধু পাওয়া বিশেষ ভাগ্যের কথা, তবে সে ভাগ্যের অভাব আমার কোনদিন হয়নি।

১৯৩১ সালে পুজোর ছুটি খুব সুন্দর কাটল। মায়ের শরীর ভাল চলছিল না, আমারও নয়। অথচ ম্যাট্রিক পরীক্ষা আসন্ন। রাঙ্গামামা আর মামাবাবু এলেন ত্রাণকর্তা হয়ে, মাকে, গুলুকে আর আমাকে নিয়ে গেলেন সিমলায়। আমরা উঠলুম বালুগঞ্জের একটি ভাড়া বাড়িতে। মল্ থেকে বড়লাটের বাড়ির নিচে দিয়ে যে রাস্তাটি বালুগঞ্জে গেছে সেই রাস্তার শেষে। উত্তর ভারতে সেই আমার প্রথম ভ্রমণ। এলাহাবাদে যখন ট্রেন পৌঁছল তখন রাঙ্গামামা কানপুর, টুণ্ডলা, এটাওয়া, আলিগড় প্রভৃতি জায়গার পানীয় জলের গুণের কথা বলতে লাগলেন। তখন আমি বিদেশী উপন্যাসে প্রস্রবণবিশিষ্ট স্বাস্থ্যাবাসে ছুটি কাটাবার কথা পড়েছি। এলাহাবাদের পর যে স্টেশন আসে তাতেই দেখি প্রায় সব লোকই হৃষ্টপুষ্ট, ছয় ফুট লম্বা, মেয়েরাও তেমনি বলিষ্ঠ আর স্বাস্থ্যবতী। পুরুষরা যত লম্বা, তার উপর তাদের

জরির কাজ করা কুল্লা আর পাগড়ি চড়িয়ে আরো ছয় ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে। ফলে জলই যে তাদের স্বাস্থ্যের মূলে, এ বিশ্বাস আমার হল। এখনও বেশ মনে আছে, একটি করে স্টেশন আসে, আর আমরা পানিপাঁড়ের কাছে ঘটি ঘটি জল নিতে দৌড়ই, মায়ের জন্যে কামরায় একঘটি করে নিয়ে আসি। পুজোর ছুটি শুরু হলে বাবা খুকিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। রাঙামামা আর মামাবাবুর আমি চোখের মণি ছিলুম, বেশ মজাতেই কাটল। এক একদিন জ্যাকো পাহাড়ের বুক অবধি চড়ে উঠতুম, সেখানে খুব বাঁদরদের উৎপাত হতো। বালুগঞ্জ থেকে নিচে বহুদূরে সমতলভূমিতে শতদ্রু নদীর সরু রেখা সূর্যের আলোয় সরু হারের মতো ঝিকমিক করত। দুই দিন বর্ধমান থেকে আগত সভ্যদের কৃপায় কেন্দ্রীয় লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্‌ব্লিতে গেছি, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, তেজবাহাদুর সপ্রুর বক্তৃতা শুনতে। ফিরতি পথে আমরা দিল্লীতে এক সপ্তাহের বেশী মামাবাবুর বাল্যবন্ধু শ্রীঅমূল্যধন দত্তর বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলুম, ২৭নং আরউইন রোডে। মামাবাবু আর অমূল্যমামা স্বভাবে ও বেশভূষায় প্রায় একরকম ছিলেন। হঠাৎ দেখলে মনে হতো যেন যমজ ভাই। অমূল্যমামার ভাইপো বীরেন পরে খুব ভাল টেনিস খেলোয়াড় হয়। আমরা সারা দিল্লী ঘুরে বেড়ালুম, সেখান থেকে গেলুম আগ্রায়, ফতেপুর সিক্রিতে। নভেম্বরে বর্ধমান ফিরলুম। পরের মার্চে হল আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। নভেম্বর মাসে আগ্রায় তখন খুব শীত হতো। ঘাসে শিশির জমে সাদা বরফ হয়ে যেত। মনে আছে চাঁদনি রাতে যখন তাজমহল দেখতে যাই, তখন আগ্রা হোটেলের ম্যানেজার আমাদের জন্যে টাঙায় জড়িয়ে বসার জন্যে তুলোর লেপ দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে পরে হিরণকুমার সান্যাল মশাইয়ের কাছে একটি গল্প শুনি। গল্পটি তাঁর বানানো অথবা সত্যি জানি না। হিরণবাবু জ্যোৎস্নারাতে আগ্রায় তাজমহল দেখতে গেছেন। আগ্রা হোটেল থেকে লেপ নেওয়া সত্ত্বেও এত শীত যে তিনি তাজমহলের ভিতরের খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে দেখার উৎসাহ পাননি। প্রবেশ তোরণের মধ্যে এককোণে দাঁড়িয়ে তাজমহল দেখছেন। হঠাৎ মনে হল সমুখে তাজমহলের দিকের পথে কী যেন একটি মোষের মতো কালো আকার নড়ে চড়ে উঠল। তারপরে আকারটি যেন আস্তে আস্তে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে উঠল; কিন্তু গোল, মানুষপ্রমাণ বড়, যেন একটি ঘণ্টা। তার পর তিনি দেখলেন, দাঁড়িয়ে ওঠা ঘণ্টাটি ধীরে ধীরে তাঁর দিকে এগিয়ে তোরণে ঢুকে তাঁর পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। যখন আকারটি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন সেটি শীতে হিহি করে সশব্দে কাঁপছে আর দাঁতের মধ্যে দিয়ে বলছে 'হি-হি, প্রতিটি পাথর প্রেম দিয়ে গাঁথা'। লোকটি বাঙালী!

ম্যাট্রিকের ফলাফলে আমার হেডমাস্টারমশাই ক্ষুণ্ন হলেন। তা সত্ত্বেও আমার প্রতি তাঁর বিশ্বাস টলেনি। একেই বলে স্নেহশীল হেডমাস্টার! এই সময়ে এক মজার ব্যাপার ঘটে গেল! পরীক্ষার ফলাফল কলকাতা গেজেটে ছাপা হবার দিন পনেরো আগে মামাবাবু বাবাকে লিখলেন, বাবু (আমার নাম) কোন মতে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে, তার বেশী হয়নি। মামাবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতেন, সুতরাং ভিতরের খবর নিশ্চয় জানবেন। এ খবরে বাবা বেশ বিচলিত হলেন, আমার উপর আস্থা হারালেন। কেন্দ্রীয় আইন সভার সভ্য কাশেম সাহেবকে ধরলেন, আমি কি করে বম্বের নৌসেনা ট্রেনিং জাহাজ, ডাফরিনে ভর্তি হতে পারি। এ প্রস্তাবে আমার মনে যে খুব কষ্ট হয়েছিল তা নয়, তবে গেজেটে ফলপ্রকাশ মাত্র সে সম্ভাবনা উবে গেল। ফলাফলের কল্যাণে আমি অনায়াসে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢুকতে পেলুম। ফিরে পেলুম বাবার আস্থা। এবং সেই সঙ্গে, বিদায় ডাফরিন!

প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৯৩২-৩৬

১৯২৪ সালে, আমার যখন সাত বছর বয়স, বাবাকে ধরে মা হাজরা রোডের সংলগ্ন গ্রোভ লেনে একটু জমি কিনিয়ে রাখেন, তাঁর ছেলে বড় হয়ে যাতে বাড়িতে থেকে কলেজে লেখাপড়া করতে পারবে, হস্টেলে থাকতে হবে না। ১৯২৯ সালে জগৎজোড়া অর্থনৈতিক সংকট আসে এবং ১৯৩১ সালে চরমে ওঠে। বাড়ির মালমশলার দাম তখন সবচেয়ে কম, আমারও ম্যাট্রিক পাশ করতে মাত্র একবছর বাকি। এই সময়ে মায়ের কথামত রাঙামামা বাবাকে বলে কয়ে একটি বাড়ি তৈরি করতে রাজি করালেন। ১৯৩২ সালে জুলাই মাসে মা, গুলু আর আমি, প্রেসিডেন্সী কলেজ খোলার প্রাক্কালে, বর্ধমান থেকে যখন কলকাতায় এসে সে বাড়িতে উঠি তখনও বাড়িটি তৈরি করা শেষ হয়নি। খুকি বিডন স্ট্রীটের ইউনিয়ন হস্টেলে থেকে বেথুন কলেজে পড়ত, সেও হস্টেল ছেড়ে বাড়িতে এল। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বাবা তাঁর কাজে বর্ধমান থেকে গেলেন। প্রতি শনিবার ও ছুটির সময়ে শুধু কলকাতা আসতেন। ১৯৩৩ সালে গুলু বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট স্কুলে ভর্তি হল।

১৯৩২ সালের মার্চে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরের সাড়ে তিন মাসে আমি নানা বিষয়ে বেশ কিছু বই পড়ি। অধিকাংশই সাহিত্য আর ইতিহাস। সেই সঙ্গে মিউনিসিপাল স্কুল থেকে চার বছর আগে পাশ করা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ভবতোষ চক্রবর্তীর কাছে ট্রিগোনোমেট্রি আর অ্যালজেব্রা শিখি। স্টেশনের কাছে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে একটি ভাল লাইব্রেরি ছিল, তার থেকে বই নিতুম।

কলকাতায় এসে একা একা বাসে করে যেদিন কলেজে প্রথম গেলুম হঠাৎ নিজেকে খুব লম্বা আর ভারিক্কি মনে হল। গ্রোভ লেন থেকে হেঁটে হাজরা-রসা রোডের মোড়ে বাস ধরতে হতো। ভীড়ের সময়ে সেখান থেকে প্রেসিডেন্সী পর্যন্ত বাস ভাড়া নিত দু আনা। দুপুরে যখন ভীড় থাকত না তখন ছ পয়সা। অনেক দোতলা লাল ওয়ালফোর্ড বাস ছিল, কোনটির দোতলায় ছাত লাগানো, কোনটি খোলা ছাত। কলকাতাব হাওয়া তখন অনেক পরিষ্কার ছিল, দিনের শেষে কাপড়-জামা এখনকার মতো কালো আর ময়লা হতো না। খোলাবাসের দোতলায় যখন চুল উড়িয়ে দিয়ে মুখে হুসহুস করে হাওয়া লাগত তখন ফুর্তিতে শরীর দুলে উঠত। নতুন নতুন ডবলডেকার বাসও রাস্তায় অনেক দেখা দিল। প্রায় সবগুলির নাম কোন না কোন অপ্সরী বা কিন্নরীর, যেমন উর্বশী, মেনকা, ইত্যাদি। কিংবদন্তী আছে সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল গোঁড়া ব্রাহ্ম শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র নাকি একবার গোঁ ধরেছিলেন সুরসুন্দরীদের নামে কোন বাসে তিনি চড়বেন না। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একবার তাঁকে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের বিরাট বাড়ি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ, বেকার ল্যাবরেটরি, সংলগ্ন হেয়ার স্কুল, এই সব দেখে আমার মনে খুব সম্ভ্রম আর ভক্তি হল। এসেছি পাড়াগাঁর স্কুল থেকে, যেখানে কোন দিন এসব বাড়ি দেখিনি। ফলে নিজেকে বেজায় অকিঞ্চিৎ আর অযোগ্য মনে হতো। ইতিমধ্যে বাংলার এবং কলকাতার সামাজিক ইতিহাস কিছুটা পড়েছি। ডিরোজিও থেকে শুরু করে যত বিখ্যাত লোক জন্মেছেন, তার মধ্যে খুব কম নামই পাওয়া যাবে যাঁরা এই চৌহদ্দির মধ্যে পড়াশোনা করেন নি। ইতিহাস একদিকে বন্ধনবোধ যেমন আনে, মুক্তিবোধও তেমনি আনে। আমার কপালে কী আছে তাই ভাবতুম। সবে ডাফরিনের হাত থেকে যে মুক্তি পেয়েছে—যেখানে বোম্বেটে ছাড়া আর কিছু হবার সম্ভাবনা ছিল না—সে যে প্রেসিডেন্সী কলেজ দেখে জড়সড় হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে!

প্রথমেই ধরুন, প্রত্যেক ক্লাসেই একদল ছাত্র যারা তাদের চালচলনেই সর্বদা

জানিয়ে দিত, কলকাতা শহরটি তাদেরই সম্পত্তি। স্কুল ছিল তাদের হয় প্রেসিডেন্সীর হাতার মধ্যে হেয়ার, না হয় রাস্তার ওপারে হিন্দু, অথবা কলকাতারই অন্যান্য বিখ্যাত স্কুল। তা যদি না হয় তবে তারা এসেছে কলকাতার কয়েক ডজন নামকরা বংশ থেকে। দ্বিতীয় দল ছিল যারা ম্যাট্রিকে জেনরল বা ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়ে ঢুকেছে; তাদের মধ্যে আবার ছিল উত্তম মধ্যম দুটি দল। উত্তম হচ্ছে কলকাতার স্কুলের ছাত্রবৃত্তি পাওয়া ছেলেরা; মধ্যম হচ্ছে কলকাতার বাইরে থেকে যারা এসেছে। মধ্যমদের ছিল মেধার ছাপ, উত্তমদের ছিল শ্রেণীর ছাপ। তৃতীয়, বস্তুতপক্ষে চতুর্থ, এক শ্রেণী ছিল। মফস্বলের ছেলেরা। ঘরের দেয়াল বা কোণ ঘেঁষে ইঁদুর যেমন নিঃশব্দে ঘুরঘুর করে, এরা কলেজে তেমনিভাবে চলাফেরা করত। এক এক সময়ে মনে হতো প্রেসিডেন্সী কলেজের কথা মনে করেই বুঝি বা হিলেয়ার বেলক তাঁর কবিতাটি লিখেছিলেন :

ধনীরা এল জোড়ায় জোড়ায়
চড়েছে তারা রোল্স্ রয়েসে
কথা তাদের খুব চড়া গলায়
সে-কথা তাদের ফুরোয় না

গরীবরা এল ফোর্ডে চড়ে
যেমন গাড়ির তেমন তাদের চেহারা

এদের মাঝামাঝি যারা
স্পষ্টই বিভ্রান্ত আর দিশেহারা
জানে তাদের এখানে নেই স্থান
মুখ তাদের দ্বিধাগ্রস্থ ম্লান

আমি ছিলুম শেষের এই মাঝামাঝির একজন, পকেটে সম্বল একটি দশ টাকার জেলা-স্কলারশিপ।

ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স ক্লাসে ভর্তি হলুম, আজকাল যাকে প্লাস টু-এর ১১-১২ ক্লাস বলে। সাহিত্য, অঙ্ক আর কেমিস্ট্রির ক্লাস হতো পুরনো বড় বাড়িতে, ফিজিক্স আর ফিজিওলজি করতুম বেকার ল্যাবরেটরিতে। আজকালকার সেমিস্টার প্রথা না থাকলেও বছরে দুটি পরীক্ষা হতো। প্রতিটি বিজ্ঞান বিষয়ে অন্তত দু'জন শিক্ষক থাকতেন, একজন প্রবীণ, অন্যজন নবীন। কেমিস্ট্রিতে যেমন প্রোফেসর পঞ্চানন নিয়োগী ছিলেন প্রবীণ, ডাঃ হুসেন নবীন। আমি ডাঃ হুসেনের ভক্ত ছিলুম,

তাঁর বিষয়ে তিনি আমার মনকে জাগিয়ে দিলেন। প্রোফেসর নিয়োগীকে আমার একটু বেশী প্রবীণ মনে হতো। ডাঃ কুদ্রৎ-ই-খুদা আমাদের পড়াতেন না, বি-এস-সি ক্লাসে পড়াতেন। তাঁকে দেখে ভয় ও সম্ভ্রম দুই-ই হতো, এতই বড় মাপের ছিলেন। ফিজিওলজিতেও তাই। প্রোফেসর সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ ছিলেন সব থেকে প্রাচীন, দেখেই ভক্তি হতো। কিন্তু আমাদের মন জাগিয়ে তুলতেন প্রোফেসর বসু ও ডাঃ ব্যানার্জি। প্রোফেসর বসু পড়াতেন, ডাঃ ব্যানার্জি নিতেন প্র্যাকটিক্যাল। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষকদের মধ্যে যিনি সব থেকে ভাল পড়াতেন; গলা ছিল মিষ্টি কিন্তু ঈষৎ শ্লেষের আমেজ, অথচ প্রতি ছাত্রের নাড়ীনক্ষত্র জানতেন এবং কিসে উন্নতি হয় সে বিষয়ে চিন্তা করতেন, তিনি ছিলেন ফিজিক্সের প্রোফেসর শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। চোখের কোণে সর্বদা থাকত একটু কৌতুকের বা রহস্যের আভাস, কে কি মতলবে ঘুরছে সব যেন জানতেন। বিশ্বভারতীর কাজে ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, রবীন্দ্রনাথের ছিলেন প্রিয় পাত্র, কিন্তু কখনও তাঁর মুখে এসবের কিছুমাত্র উল্লেখ কোনদিন শুনিনি। রবীন্দ্র পরিষদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। কলেজের পুরনো বাড়ির ছিল ঐতিহ্য, সে হিসাবে বেকার ল্যাবরেটরি ছিল অনেক বেশী অন্তরঙ্গ, সহজলভ্য। এখানে ছিল জীবজন্তুর খাঁচা, ফিজিওলজি আর জুওলজি বিভাগে ব্যবহারের জন্যে। জিওলজি বিভাগে ছিল কাঁচের আলমারি ঠাসা নানা ধরনের মাটি, কাঁকর, পাথর। ফিজিক্স বিভাগে ছিল বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি, দেখে তাক লেগে যায়। তা ছাড়া ছিল জমকালো ফিজিক্স থিয়েটার, যেখানে কলেজের পর বিকেলে বা সন্ধ্যায় হতো যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু সারা বাড়িতে ঘুরত ল্যাবরেটরির গ্যাসের গন্ধ, সেই মিষ্টি অথচ একটু গা-বমি করা গন্ধের মধ্যে ঘুরে ফিরে নিজেকে বেশ মাতব্বর মনে হতো।

ইংরেজির অধ্যাপক হাম্‌ফ্রি হাউস প্রায়ই বলতেন, ভাল কথ্য বাংলার আদত বা ইডিয়ম শেখার আশায় তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা পড়তেন। সেই অমৃতবাজারি ভাষায় বলা যায় আমাদের অধ্যাপকরা আমাদের গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরির চেষ্টার ত্রুটি করতেন না। যতদিন বেঁচে থাকব অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকুমার ব্যানার্জি, তারকনাথ সেন, অপূর্বকুমার চন্দ, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সোমনাথ মৈত্র, হিরণকুমার ব্যানার্জি, সুশোভনচন্দ্র সরকার, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ঋণ আমি কখনও ভুলব না। আমার বিশেষ ক্ষোভ যে অধ্যাপক অপূর্ব চন্দ, সুশোভন সরকার এবং প্রশান্ত মহলানবিশ ছাড়া আমি অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করিনি। তার একটা কারণ ১৯৪০ থেকে আমি মফস্বলে বনে-বাদাড়েই বেশী থাকতুম। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে এ সত্ত্বেও অধ্যাপক চন্দ,

মহলানবিশ ও সরকার আমার খোঁজ নিয়ে ডেকে সর্বদা আদর করে কথা বলতেন। অধ্যাপক কুদ্রৎ-ই-খুদার সঙ্গে ১৯৭৫ সালে ঢাকায় ভাগ্যক্রমে দেখা হয়। তখন তাঁর শরীর ভাল ছিল না, কয়েক বছরের মধ্যেই মারা যান, কিন্তু তখনও তিনি বাংলা-দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রভূত সময় দিতেন। ভাগ্যক্রমে এখনও মাঝে মাঝে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আসি। অন্যদের চেয়েও ওঁর সম্বন্ধে আমার ছিল বেশী ভয়। নির্ভুল, সুন্দর অন্বয়, মেদবর্জিত ইংরেজি গদ্য লিখতেন, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ যথাসম্ভব বর্জন করতেন। চেষ্টা ছিল কত কম কথায় কত বেশী বলা যায়। আমার নিজের চেহারা বেঁটে খাটো, বলার মতো তাতে কিছু নেই বলে, জ্ঞানবুদ্ধির পূজা ছাড়া সুপুরুষ হিসাবে কয়েকজন অধ্যাপককে আমি খুব সমীহ করতুম। যেমন, তারকনাথ সেন, ভূপতিমোহন সেন, সুশোভন সরকার, প্রশান্ত মহলানবিশ, কুদ্রৎ-ই-খুদা। সকলেই ছিলেন লম্বা, বলিষ্ঠ, শ্যামলকান্তি, সুপুরুষ। অনেকে ছিলেন ডি. এস-সি.। ভাবতুম ডি. এস-সি. হতে গেলে কি সুপুরুষ হতে হয়? তবে স্নেহময় দত্তও ডি. এস-সি., তিনি ছিলেন কিন্তু বেঁটে, এবং পিপের মতো। নিজেদের মধ্যে আমরা তাঁর নাম রেখেছিলুম, টাবি।

সোমনাথ মৈত্র এবং তাঁর সব ভাইদের সুপুরুষ বলে সুনাম ছিল। কলেজের লাইব্রেরির একতলায় একটি কিউবিক্‌লে সোমনাথবাবু টিউটোরিয়াল নিতেন। কয়েক সপ্তাহ টিউটোরিয়ালের পর একদিন জিগ্যেস করলেন আমি কোথায় থাকি। উত্তর শুনে বললেন, হাঁটা পথে যখন দূরে নয় তখন আমি তাঁর বাড়ি এক আধ রবিবার বিকেলে গেলে তিনি খুশি হবেন, ঐ সময়ে প্রমথ চৌধুরী মশাই ওঁর বাড়িতে আসেন। ইতিমধ্যে আমি প্রমথ চৌধুরীর লেখা 'চারইয়ারি কথা' পড়েছি এবং আন্দাজ করেছিলুম সোমনাথবাবুই আসলে চারইয়ারির সোমনাথ। পরের রবিবার পরম কৌতূহল নিয়ে গেলুম। যেই প্রমথবাবুর গাড়ি এল, সোমনাথবাবু শশব্যস্তে বাইরে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে সযত্নে ওঁকে ধরে নামিয়ে বসার ঘরে নিয়ে এলেন। প্রমথবাবু সোমনাথবাবুর সঙ্গে যেরকম স্নেহভরে কথা বললেন, তাতেই বুঝলুম আন্দাজ ঠিক। সেটি ১৯৩৩ সাল। প্রমথবাবু তখন একটু অথর্ব হয়ে গেছেন; কথা বলতেন একটু বিড়বিড় করে। তবে কি বলছেন বুঝতে পারলে ধারণা হতো কত শুদ্ধ আর মিষ্টি তাঁর গলা এবং বাংলা, ইংরেজি আর ফরাসী উচ্চারণ। সোমনাথবাবুর কথা সব স্পষ্ট, গোটা গোটা, গলা দানাদার আর মিষ্টি, স্বর কোমল-ভাবে উঠছে, পড়ছে, ঠিক যেমন প্রমথবাবু 'চারইয়ারিতে' লিখেছেন। দুজনে যখন কথা বলতেন তখন মনে হতো যেন বাখের একটি চেলো স্যুইট শুনছি। একই

যন্ত্র থেকে যেন দুটি গলা বের হচ্ছে, প্রবীণ গলাটি খাদে, নবীন গলাটি উঁচু গ্রামে।

সোমনাথ মৈত্রই আমার প্রথম অধ্যাপক যিনি আমার সঙ্গে প্রথম থেকেই সমবয়সীর মতো ব্যবহার করতেন। তখন আমার সবে ষোল পেরিয়েছে। সোমনাথ সম্বন্ধে প্রমথবাবু তাঁর চারইয়ারিতে লেখেন, গোঁফের রেখা ফোটার আগেই সোমনাথের মাথার চুল পেকেছিল; আমার সম্বন্ধেও সোমনাথবাবু বোধ হয় তাই অনুমান করেছিলেন। তাঁর ঘরের কোন বই আমার নিষিদ্ধ ছিল না। গল্প ইয়ার্কি যা হতো সবই যেন দুই প্রাপ্তবয়স্ক বন্ধুর মধ্যে। তিনি আর প্রমথ চৌধুরী মশাই যখন নিজেদের মধ্যে, আমার সমুখে, কথা বলতেন, তখন রসালো গল্প করতে মোটেই বাধত না। তবে দেহের নিম্নাঙ্গ বিষয়ে আলোচনা হতো না। তাঁদের গল্পের একটি নমুনা দিলেই পাঠক বুঝতে পারবেন। গল্পটি প্রমথবাবু বলেন। বলার সময়ে চোখে মুখে এবং গলায় যে কৌতুক ফুটে উঠেছিল আমার এখনও মনে আছে। প্রমথ চৌধুরীর তখন সবে বিয়ে হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শাশুড়ী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে ইন্দিরা দেবী আর উনি রাত্তিরে ডিনার খাচ্ছেন। আজকালকার মেয়েরা যে কি বেহায়া, বেসরম হয়ে, মাত্র কনুই পর্যন্ত হাতাওলা, গলা থেকে বুক অবধি কাটা ব্লাউজ পরে, একথা উত্থাপন করে জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী বেশ বিরক্তি প্রকাশ করলেন। আহারের শেষে তখন শেরী ঢালা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী চুপচাপ শেরীর গ্লাস হাতে নিয়ে, শেরীর মাদকতাময় চুনীর রঙ আলোর সামনে তুলে ধরে, রঙের তারিফে মশগুল ভাব দেখিয়ে ঈষৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আহা কাঁচের শাড়ি হয় না গা!' এক মুহূর্তের জন্যে সবাই স্তম্ভিত, মাটিতে পিন পড়লেও শোনা যাবে এরকম অবস্থা। হেঁচকি সামলাবার ভান করে ইন্দিরা দেবী তাড়াতাড়ি উঠে অন্য ঘরে পালিয়ে গেলেন। সত্যেন্দ্রনাথ হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাকের উপর ঘড়িটির দিকে মনোনিবেশ করলেন। আর আত্ম-সংবরণ করে খানসামাকে 'সেভারি' কোর্সটি আনতে বলতে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বেশ কিছুক্ষণ লাগলো।

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ প্রিন্সিপাল ভূপতিমোহন সেন এত লাজুক ছিলেন যে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রদের ধমক দিতে গেলেও তাঁর মুখ লাল হয়ে যেত, আমতা আমতা করতেন। তাঁর স্ত্রী, মিসেস সেন, কিন্তু অনেক কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বোধ করি স্থির করলেন যে এত নরম হলে আর যাই হোক সংসার বা কলেজ চলে না। সত্যি কথা বলতে, উনি যদি কলেজের অনেক কিছুর ভার—যেমন রবীন্দ্র পরিষদ, শরৎ সমিতি এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে—নিজের হাতে না নিতেন,

তাহলে শুধুমাত্র ছেলেদের হাতে সেগুলি থাকলে কি অবস্থা হতো বলা যায় না। কলেজের নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে তিনিই সর্বময় ভার নিতেন, খেলাধুলা, স্টীমার পার্টির ব্যাপারেও। তাঁর শাসনে বিকাশ রায়, চাঁদলাল মেহতা, বিদ্যুৎ ঘোষের মতো দুরন্ত ছেলেরা শায়েস্তা থাকত। অথচ খুব হাসিখুশী থাকতেন, একবার মাত্র মেজাজ হারাতে দেখেছি। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে সেবার থিয়েটার হয়। মিসেস সেন স্টেজের নেপথ্যে সারা সন্ধ্যা বসে তদারক করেছেন, যাতে কোন ত্রুটিবিচ্যুতি না হয়। নাটক সুষ্ঠুভাবে শেষ হবার পর হতভাগা বিকাশ, বিদ্যুৎ, অন্যান্যবারের মতো এবারও তাঁকে কোথায় নমস্কার করে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গাড়িতে তুলে দেবে, তা নয়, শেষ হবামাত্র উধাও। আর কোথায় যাবে! পরের দিন এসে মিসেস সেন ধমকের চোটে তাদের অবস্থা কাহিল করে দিলেন: 'আমার হার্টে ট্যাক দিয়েছে, তার তোয়াক্কা না করে তোমাদের পোড়া থিয়েটারের জন্যে আমি সারা সন্ধ্যা ঠায় একভাবে বসে আছি, আর তোমরা? তোমাদের এতটুকু আক্কেল নেই! কি মনে করো কি নিজেদের!' এর পর অবশ্য আর কেউ এরকম আস্পর্ধা দেখাতে সাহস করেনি।

ঠিক মনে নেই কোন বছরে, ফার্স্ট না সেকেণ্ড ইয়ারে, কিন্তু ঘটনাটা বলি। বিকেল হয়ে এসেছে, কলেজের ছুটি হয়ে গেছে। এক নাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা ক্লাস নেবার পর, বইয়ে ভর্তি কুড়ি কিলো ওজনের গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ হাতে দুর্ধর্ষ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পুরনো বাড়ির বুলন্দ দরওয়াজার মতো দোতলার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে তাঁর ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের ছাত্রদের কোন এক নিগূঢ় ব্যাপার বোঝাতে ব্যস্ত। আমরা কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকাল করে তাঁর অনেক পিছনে ভয়ভক্তিতে দূরে দাঁড়িয়ে আছি, কখন তিনি নামবেন। দু তিন ধাপ নেমেছেন কি নামেন নি, এমন সময়ে হঠাৎ অন্যমনস্কের মতো কথা বন্ধ করে সিঁড়ির একেবারে নিচে বারান্দায় কী যেন হচ্ছে নিবিষ্ট মনে দেখলেন। আমরাও চুপ করে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা কী হ'ল তাই ভাবছি। হঠাৎ দেখি তাঁর মোটা বৃষস্কন্ধ শরীর সমুখের দিকে ধনুকের মতো ঈষৎ বেঁকে কেঁপে উঠল। ঠিক যেমন বুল-ফাইট শুরু হবার পর টরিয়াডরের দিকে তেড়ে যাবার আগে বুলফাইটের ষাঁড় বিদ্যুতের মতো বেঁকে পরমুহূর্তেই কাঁপে। নিচে করিডরে যে টরিয়াডর চালের মাথায় আপন মনে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল, বেচারী কিছুই বুঝতে পারেনি বিপদ কোথা দিয়ে আসছে। হঠাৎ ধরণী একটু কেঁপে উঠল। মাথায় কিছু ঢোকার আগেই আমরা দেখি প্রোফেসর ঘোষ পড়িমরি করে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন, হাতের ভারি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ এদিক ওদিক বেগে দুলছে, ছোকরার দিকে তাকিয়ে মুহুর্মুহু চিৎকার করে বলছেন, 'ফেলো,

ফেলো এক্ষুণি।' কাকে বলছেন, কী ফেলতে বলছেন, প্রথমে আমরাও বুঝতে পারিনি। নিচের ছেলেটি বেশ দু এক সেকেণ্ড ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখল, বেশ বোঝা গেল মাথায় কিছু ঢুকছে না। যখন মাথায় বুদ্ধি খেলল, তখন প্রোফেসর অর্ধেকের বেশী সিঁড়ি নেমেছেন; ছেলেটি প্রাণভয়ে চোঁচা দৌড়। আমরা ভয়ে অস্থির; একে ভারি শরীর, তায় হাতে অত ভারি ব্যাগ, যা নিয়ে তিনি ঐ খাড়া সিঁড়ি উর্ধ্বশ্বাসে নামছেন, নিজের বিপদ সম্বন্ধে কোন হুঁশ নেই। তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ নাগাদ হবে, কিন্তু তখনকার দিনে পঁয়তাল্লিশ বছরের লোককে এখনকার ষাট পঁয়ষট্টি মনে হতো। নিচের ছেলেটি বুঝতেই পারেনি সে অতক্ষণ ধরে তাড়া খাবে, খানিক ছুটছে আর ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে পিছনে কেউ আসছে কিনা। শেষ পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে বড় গেট পেরিয়ে, কলেজ স্ট্রীট পার হয়ে হিন্দু স্কুল পর্যন্ত ছুটে গেছে, তখন দেখে প্রোফেসর ঘোষ প্রেসিডেন্সীর গেটে দাঁড়িয়ে তাকে শাসাচ্ছেন 'ফেলো, তা না হলে কলকাতা শহর থেকে বের করে তবে ছাড়ব।'

ফরাসী বিপ্লবের কথা স্মরণ করে ওয়ার্ড্স্‌ওয়ার্থ তাঁর কাব্যে যেমন লিখেছিলেন, আমারও প্রেসিডেন্সী কলেজ সম্বন্ধে তাই মনে হতো 'বেঁচে থাকা পরম সুখ, তবে অল্পবয়সে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়া স্বর্গবাসের মতো।' ভারতবর্ষের সর্বত্র তখন প্রচণ্ড সব ব্যাপার চলছে, বিশেষত কলকাতায়। কোথাও কোন রাজনৈতিক আন্দোলন হলে কলকাতাতেই সে বিষয়ে প্রথম শোরগোল শুরু হতো। চিন্তাজগতে যে-কোন নতুন ঢেউ কলকাতাকে মাতিয়ে দিত। আজ লণ্ডনে কোন নতুন বই বেরোলে মাসখানেক না যেতেই সেটি হয় দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, না হয় চক্রবর্তী এণ্ড চ্যাটার্জি, না হয় বুক কোম্পানিতে এসে হাজির। কলেজের ভিতরে সব কিছু নিয়ে হতো জোর তর্কাতর্কি। অন্য কোন কলেজের ছাত্রের কাছে সেসব তর্ক নিশ্চয় অসহ্য পাকামি বা বুজরুকি মনে হতো। কলেজের প্রত্যেক ইয়ারের ছাত্রদের একটি ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ গোষ্ঠী ছিল। এক ইয়ারের এই গোষ্ঠী অন্য ইয়ারের অনুরূপ গোষ্ঠীর কাছে, যাকে বলে, কল্‌কে পেত। এই ভাবে ফার্স্ট ইয়ার থেকে সিক্‌স্‌থ্‌ ইয়ার পর্যন্ত ছিল এই গোষ্ঠীপরম্পরার দৌড়। এদের মধ্যে গণ্য হতো প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকার সম্পাদক, বিভিন্ন পরিষদের সচিবরা আর প্রতিটি বিভাগের লাইব্রেরিয়ানরা। সম্প্রতি ১৯৩১ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকার পাতা ওলটাতে গিয়ে অবাক হয়ে গেছি, যে-বন্ধুদের লেখা এই ক' বছর ছাপা হয়েছিল, তাদের মন ও বিচার বয়োজ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ নির্বিশেষে, কত শিক্ষিত, মার্জিত এবং বিশ্লেষণশক্তি সম্পন্ন ছিল। আশা করি তাঁদের সঙ্গে গা ঘষাঘষির গুণে, তাঁদের কিছু গুণ আমারও গায়ে লেগেছিল এবং এখনও আছে। কলেজের

কর্তৃপক্ষ অবশ্য আমরা যাতে রজেনৈতিক, বিশেষত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ না দিই তার জন্যে যে যথেষ্ট চেষ্টা করতেন সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। থার্ড ইয়ারের কালিদাস লাহিড়ীর প্রবন্ধ 'ফ্যাশিজ্‌মের আসল বাণী', অথবা 'বঙ্গদেশে কৃষকদের ঋণের বোঝা', অথবা, বিনয় সরকার মশাইয়ের আদলে বাংলায় লেখা আমার সহপাঠী গিরীন চক্রবর্তীর (তার সঙ্গে পাবনার পর থার্ড ইয়ারে আবার একসঙ্গে পড়তে আরম্ভ করি) 'মার্ক্সের অর্থনৈতিক চিন্তা' যে কোন দেশে, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আঠারো উনিশ বছরের ছেলেমেয়ের পক্ষে গর্ব করারই কথা। এ কথা আজ ত্রিশ বছর ধরে অনেক দেশের পি-এইচ. ডি গবেষণার পরীক্ষক হয়ে আমি অনায়াসে বলতে পারি।

অবশ্য বলতে পারেন প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকায় কিছু কিছু লেখা থাকত যাকে বলা যায় গুরুগম্ভীর ভাষায় বড় বড়, এমন কি পাকামো, কথা। তা সত্বেও অধিকাংশ লেখাতেই যে যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় থাকত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া পত্রিকাটিতে শিক্ষক ও ছাত্রদের পরিপূরক প্রবন্ধ লেখারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রোফেসর উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের 'মূল্য ও প্রাচুর্য' (১৯৩৩), তারকনাথ সেনের 'কীটসের সৌন্দর্যতত্ত্ব' (১৯৩৮) এখনও সাগ্রহে পড়া যায়। বহুপূর্বের প্রিন্সিপাল এইচ. এম. পার্সিভাল, অর্থনীতির প্রোফেসর জে. সি. কয়াজির স্মৃতি-কথায় যে ভালবাসা ও আন্তরিকতার মাধুর্য পাই, তা পড়লে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র কথা মনে পড়ে যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকার সম্পাদকের মন্ত্রই যেন ছিল পত্রিকায় তর্কবিতর্কের জোয়ার যত জোরে সম্ভব চলবে। ১৯৩৮ আর ১৯৩৯ সালে আমার লেখা দুটি প্রবন্ধ পত্রিকা সম্পাদক পরপর সংখ্যায় ছাপান। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংগ্রহের একটি নির্মম সমালোচনা, দ্বিতীয়টি তাঁর 'শেষের কবিতা'র। দ্বিতীয়টিতে বোধহয় ধৃষ্টতার সীমা রক্ষা হয়নি, লেখা ছিল 'শেষের কবিতা' লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা রোগে সম্ভবত ভুগছিলেন। প্রবন্ধ দুটি যখন প্রকাশ হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স আটাত্তর, তখনও তিনি অত্যাশ্চর্য কবিতা লিখছেন, এবং তার কিছু পরেই তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ বেরোয়। তাছাড়া প্রেসিডেন্সী কলেজ তাঁর অকপট পূজার বেদী ছিল বলা যায়। সে হিসাবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে আজকের দিনে কোন পত্রিকা, যত প্রসিদ্ধই হোক, সত্যজিৎ রায়ের বিষয়ে ঐ ধরনের সমালোচনা আদৌ ছাপবে কিনা, যদিও অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নামের পাশে সত্যজিৎ রায়ের নামের উচ্চারণ করা উচিত হবে না।

১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে আই-এস-সি পরীক্ষা শেষ হল। নিয়তির লিখনে,

আই-এস-সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় হলুম, আবার আই-এ এবং আই-এস-সি মিলিয়েও দ্বিতীয় হলুম। কেমিস্ট্রি আর ফিজিওলজিতে রীতিমত হতভম্ব হবার মতো উঁচু মার্ক উঠেছিল। ফলে কেমিস্ট্রির ডাঃ হুসেন আর ফিজিওলজির অধ্যাপক বসু দুজনেই আমাকে বললেন ঐ দুটির একটিতে অনার্স নিলে বোধ হয় ভাল হতো। কিন্তু প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেমিস্ট্রির কিপ্‌স্ অ্যাপারেটাসের গন্ধ শোঁকা, অথবা সারা দিন ঠায়ে দাঁড়িয়ে ব্যাঙ গিরগিটি কাটাছেঁড়া করা আমার ধাতে পোষাল না। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে আমার মনের গড়ন ছিল অন্যরকম, এক বিষয়ে শ্রান্তি এলে আরেকটি বিষয় ধরা, যা নাকি বিজ্ঞান পড়লে করা শক্ত। সে-স্বাধীনতা বজায় রাখতে গেলে ইংরেজি অনার্স পড়াই শ্রেয়, তার সঙ্গে অর্থনীতি আর অঙ্ক। অন্য যে কোন জ্ঞান বা বিজ্ঞান আজীবন তাদের খুঁটোয় বেঁধে রাখে, সাহিত্য সে ধরনের বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। ফলে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের পুরনো বাড়িতে ফিরে যাওয়া ঠিক করলুম। বি-এ পড়ার সঙ্গে এল আরেক জীবন।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের দুর্গের বাইরে সারা পৃথিবী ফুঁসতে শুরু করেছে। আমার জীবনে কলেজটি ছিল এক সুরক্ষিত আশ্রমের ভিতরে আরেকটি আরো ছোট সুরক্ষিত আশ্রম। প্রথমত, কলেজটি ছিল প্রথম বড় সুরক্ষিত আশ্রম; অধিকাংশ সহপাঠী ছিল কলকাতার ছেলে, তাদের ছিল নিজস্ব ঠাট্টা, ইয়ার্কি, অভিজ্ঞতার জগৎ, নিজেদের গূঢ় ভাষা, আমার মতো মফস্বলের ছেলের সেদেশে প্রবেশে ছিল বিস্তর বাধা। আমি ছিলুম বেন্ জনসনের গাঁয়ের ছেলে। ভাগ্যক্রমে আরেকটি মফস্বল স্কুল থেকে আসা সহপাঠী অমিয় দাশগুপ্তর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। অমিয় ছিল বামপন্থী দর্শন ও রাজনীতিতে লিপ্ত। তা ছাড়া ছিল গিরীন। কালিদাস লাহিড়ী এক বছরের সিনিয়র। তিনি জানতেন ফ্যাশিজমের স্বরূপ, আর কী করে তার কালো মেঘ হু হু করে পৃথিবীর আকাশ গ্রাস করতে চলেছে। আরেক সহপাঠী প্রীতিতোষ রায়ের সঙ্গে আই-এস-সি থেকেই বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়, তার মারফতে হয় রাধিকাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে, ডাক নাম বাদু। স্কুল ছেড়ে দিয়ে সে একটি ব্যায়ামাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেটি নাকি ছিল সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া। বাদুর ছিল সব কিছুতে আগ্রহ। ছিল তার্কিক এবং বিনা বিচারে কোন কিছু মেনে নেবার বিরুদ্ধে। সেই মুখ্যত হল আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের বদ্ধ আশ্রমে মুক্ত আকাশের দিকে খোলা জানালা। আমি নিজে থেকে বেশী মিশতে পারতুম না, তাড়াতাড়ি বন্ধু করতে পারতুম না। ফলে কলেজে ওরা আমাকে অনেকে নাক উঁচু মনে করত, বিশেষত আই-এস-সি পরীক্ষার ফলাফলে আমার অনামীত্ব যখন হঠাৎ ঘুচে গেল। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে সনৎ চাটুজ্যে এসে আমাদের কলেজে ভর্তি হল

ইতিহাস বিভাগে : তার সঙ্গে বছর আঠারো পরে বন্ধুত্ব ক্রমশ গভীর ও স্থায়ী হয়। কলেজে থাকতে সে আমাকে দালাই লামা বলত। তখন আমার মুখাবয়ব এখনকার চেয়ে আরো প্রকটভাবে মঙ্গোলীয় ছিল, এবং মনের হাবভাব মুখে ফুটে উঠত কম। 'লোকায়ত' দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চাটুজ্যে আমার নামে তখন একটি গল্প রটায়। গল্পটি সত্য নয় বলে আমার এখনও বিশ্বাস, কিন্তু বদনাম হিসাবে সেটি আমার গায়ে এখনও লেগে আছে। অনন্ত ভট্টাচার্য নামে ইংরেজির এক ছাত্র একদিন আমার টি-এস-এলিয়টের 'দি ইয়ূজ অভ পোয়েট্রি এণ্ড দি ইয়ূজ অভ ক্রিটিসিজ্‌ম্' বইটি চেয়ে নেয়। মাত্র দুটি দিন না যেতে যেতেই আমি নাকি অনন্তকে ডেকে বলি যে সে বইটি এখন ঠিক বুঝতে পারবে না, অতএব যেন ফেরৎ আনে। আমি এখনও বুঝতে পারি না, দেবী আমার বদনাম করার জন্যে না কৌতুক করার জন্যে গল্পটি তৈরি করে। আমি নিশ্চয় অত খারাপ বা নাক উঁচু ছিলাম না!

এই ধরনের সুরক্ষিত গণ্ডীতে বাস করে, উপরন্তু বন্ধুর সংখ্যা কম থাকায়, আমার অধিকাংশ সময় কাটত নানা বিষয়ে বই পড়ে। সে বিষয়ে আমি ছিলুম কিছুটা বাদুর কাছে ঋণী। বাদু যা পেত তাই পড়ত এবং আমাকে পড়াত। বাবা বুক কোম্পানিতে আমার নামে একটি একাউণ্ট খুলে দেন। বুক কোম্পানির মালিক শ্রীগিরীন মিত্র—আমি তাঁকে কাকাবাবু বলে ডাকতুম—অসম্ভব খবর রাখতেন। শুধু যে বই তা নয়, পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে। বছরের নয় মাস তিনি খালি গায়ে দোকানে বসে থাকতেন, জগতে এমন লোক ছিল না তিনি চিনতেন না, এমন বই ছিল না যার খবর তাঁর জানা ছিল না। যে-কোন বইয়ের নাম উঠলেই বলতে পারতেন আর আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন। সবচেয়ে জরুরী একটি ব্যাপারেও তাঁর টনটনে হুঁশ ছিল, খরিদ্দার দোকানে ঢুকলেই তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারতেন, বইচোর কিনা।

যে বইটি আমার জীবনে সারা সাম্প্রতিক বিশ্বসম্বন্ধে উৎসাহ জাগিয়ে তোলে সেটি হল রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'। এর ইংরেজি অনুবাদ বৃটিশ ভারতে নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর বর্ধমানে আমি বইটি প্রথম পড়ি। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' তার আগে পড়েছি, কিন্তু 'রাশিয়ার চিঠি' আমাকে আরো গভীরভাবে নাড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের বই আমাকে আমাদের দেশের সমস্যা বুঝতে সাহায্য করে, এবং আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোথায় ফাঁকি, কেন বি-আর আম্বেদকর বা মহম্মদ আলি জিন্না ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছেন এবং ভবিষ্যতে আরো উঠবেন, সে সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করে; আমাদের

বিপ্লবাত্মক বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কোথায় গলদ সেবিষয়ে ভাবিত করে। ভবিষ্যতে যখনই দেশে সাম্যবাদী আন্দোলন সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জেগেছে তখনই 'রাশিয়ার চিঠি'র কোন না কোন অংশ মনে পড়েছে। ঐ বয়সে 'রাশিয়ার চিঠি'র তুল্য প্রভাব আমার মনে খুব কমই পড়েছে। আমার মনের অনেক ম্যাজিকভরা জানালা দরজা বইটি যেন হঠাৎ খুলে দিল। ফলে, ১৯৩২-এর কয়েক বছর পরে যখন আমি প্রথম মার্ক্সের কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়ি তখন মনের ভিত খানিকটা তৈরি হয়েছে। কী করে এই নতুন সমাজের জন্ম হল? কে এই জন্মের ধাত্রী হল? কতদিন ছিল গর্ভবাস? ১৯২৯ সালে পাবনায় থাকতে সোভিয়েট রাশিয়া এবং বিড়ম্বিত চীন সম্বন্ধে অবশ্য সামান্য কিছু পড়েছি আর শুনেছি, কিন্তু তাদের অন্বিষ্ট কী ছিল, তার সঠিক হদিস পাইনি। 'রাশিয়ার চিঠি' পড়ার পর বিশের দশকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের চীনভ্রমণের লেখাগুলি পড়ি। কিন্তু চীনের বিষয়ে তাঁর লেখা আমার মনে 'রাশিয়ার চিঠি'র তুল্য উত্তেজনা আনল না। চীন সম্বন্ধে যা পড়লুম তাতে আশা হল, উন্মাদনা এল না। দেশেও অবশ্য তখন ঝড় এত দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল যে রাশিয়া চীন প্রভৃতি বৃহত্তর জগৎ সম্বন্ধে তত উৎসাহ না থাকারই কথা। তাছাড়া, বৃটিশ সরকার তো কোনমতেই নয়, কংগ্রেস আন্দোলনের নেতারা এবং সংবাদপত্র সংস্থাগুলিও বোধ হয় চাইত না যে রাশিয়া বা চীনে কী হচ্ছে দেশের লোক সেবিষয়ে বিশদভাবে জানে। চীন সম্বন্ধে একটু উৎসাহ বাড়ল দুটি কারণে: মাঞ্চুকুয়ো সম্পর্কে জাপানের বিবৃতি এবং ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে জাপানের সাংহাই দখল করায়। কিন্তু এ দুটি ঘটনায় চীনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পিছিয়ে গেল। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতো মুখ্যত সাহিত্যিক ও কবির লেখা 'রাশিয়ার চিঠি'তে শিখলুম, আরেকটি নিঃস্ব দেশ ইতিমধ্যেই কত বেশী জেগে উঠে সম্পূর্ণ নতুন একটি জগৎ এবং ততোধিক নতুন এক জীবনের বার্তা নিয়ে এসে পৃথিবীর ধনী দেশগুলিকে কত ভয় খাইয়ে দিয়েছে।

সে উত্তেজনার তুলনায়, স্বীকার করতে দ্বিধা হয়, কিন্তু কথাটা সত্যি, ১৯৩০ সালের মার্চ মাসের দাণ্ডি যাত্রা, পরে আইন অমান্য আন্দোলন, তারও পরে বঙ্গদেশের নানা জেলায়, বিশেষত মেদিনীপুর জেলায় বৃটিশ রাজের অকথ্য নিপীড়ন, তার সাথে অন্যান্য জেলায় বিপ্লবাত্মক ও সন্ত্রাসবাদী ঘটনাবলী, হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষের উপর অত্যাচার ও জেলে পোরা সব কিছুই যেন একটু নিচু মানের মনে হতো। তার কারণ ছিল দুটি। প্রথমত, দেশের জগৎ ছিল নাকের ডগায়; দ্বিতীয়ত এ জগতে আমার নিজের কোন অংশ ছিল না। অপর পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' এমন এক জগতের সন্ধান দিল যার অন্বিষ্ট আমার

জানা ছিল না, এবং সে বিষয়ে আমি ভাবিওনি। মানুষ যা খোঁজে, চেষ্টা করলে তা পায়। ম্যাক্সিম গর্কীর 'মা' হাতে এল রবীন্দ্রনাথের চিঠির সম্পূরক হিসাবে, বুঝতে সুবিধা হল। তখনও পর্যন্ত আমি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, অথবা ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির জন্ম বা মার্ক্সীয় দর্শনের কোন বই পড়িনি, বা কোন রিপোর্ট সম্বন্ধে জানতুম না। বর্ধমানের রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিতে এড্‌গার স্নো'র লেখা একটি বই এবং মরিস হিণ্ডাসের লেখা গুটি দুয়েক বই পেলুম। দুই লেখকেরই বইয়ে রাশিয়ার পুনর্নির্মাণ কাহিনীর কিছু কিছু পরিচয় পেলুম, জানলুম কেমন করে ইওরোপীয় ও আমেরিকান এঞ্জিনিয়াররা, লেখকরা, মনীষীরা এই যজ্ঞে সাহায্য করছেন। তার চেয়ে বেশী মুগ্ধ হলুম, কিভাবে দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও লক্ষ্য বদলাচ্ছে। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক নিজেই উদ্যোগী হয়ে পরের বছর (১৯৩৩) এবং তার পরের বছর আরো বই আনালেন রাশিয়ার পুনর্নির্মাণ বিষয়ে। ফলে আরো দুটি ভাল বই পেলুম—দুটিই ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত, লেখক এম-ইলিন। একটি বইয়ের নাম 'মস্কো হ্যাজ এ প্ল্যান'। বইটি রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা, অনেক সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী রেখাচিত্রে চিত্রিত। দ্বিতীয়টির নাম 'মেন্ এণ্ড মাউণ্টেন্‌স্'। নামটি কবি উইলিয়াম ব্লেকের একটি কবিতা থেকে নেয়া : 'মানুষ আর পর্বত যখন একসঙ্গে হাত মেলায় তখন আশাতীত কাণ্ড ঘটে'। বইটিতে ছিল পরিকল্পিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের বিবরণ, যার ফলে পৃথিবীর সমগ্র স্থলাংশের এক ষষ্ঠাংশের ভূ-চিত্র অনেকাংশে আমূল বদলে যাবে। দ্বিতীয় প্ল্যান শুরু হবার কথা ১৯৩২-এর জানুয়ারি মাসে। এর কয়েক বছর পরে মিনু মাসানি 'মেন্ এণ্ড মাউণ্টেন্‌স্'-এর অনুকরণে 'আওয়ার ইণ্ডিয়া' (আমাদের ভারত) বইটি লিখলেন। বইটি হুবহু অনুকরণ, অথচ 'মেন্ এণ্ড মাউণ্টেন্‌সের' কোন উল্লেখ ছিল না, ঋণ স্বীকার তো দূরের কথা। তবুও বইটি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে ভবিষ্যতের আশার বাণী বয়ে আনে, আমাদের বয়সীদের কাছে খুব প্রিয় হয়। কিন্তু মাসানি লিখলেন একটি স্বপ্নের কথা, যে-স্বপ্ন নষ্ট করতে পরে তিনি নিজেই উদ্যোগী হন। এ সব সত্ত্বেও 'রাশিয়ার চিঠি' আমার মনে যে বীজ পুঁতে দেয়, তাতে পরে আস্তে আস্তে ডালপালা গজায়। সামাজিক সমানাধিকার, আর্থিক অসাম্য, নিরক্ষরতা, রোগ, অস্বাস্থ্য, মানুষের প্রতি মানুষের অবমাননা, জাতিপ্রথা, আত্মসম্মানের অভাবের কারণ এ সব বিষয়ে আমাকে চিন্তিত করে এবং সেই সঙ্গে দীক্ষিত করে ভারতের ইতিহাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি গঠনবিষয়ক ইতিবৃত্তে। কী করে, কেন, আমাদের দেশ এ ধরনের জড়, অনড়, স্থাণু 'জগন্নাথ' হল তারই কারণ সন্ধানে।

ইতিহাসে একক ব্যক্তির অবশ্য স্থান আছে। লেনিন সম্বন্ধে তখনও বিশেষ কিছু পড়িনি, কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে স্টালিন আমাদের জীবিতকালে এমন এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন যা পৃথিবীতে কোনদিন জানা ছিল না। রাশিয়াতে যা ঘটছে তা এতই অভিনব, এবং সে বিপ্লবের কাণ্ডারী যে স্টালিন সে বিষয়ে ত্রিশ দশকে এমন এক বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছল যে স্টালিনের যারাই বিরোধিতা করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে সাম্যবাদের ঘোর শত্রু, যেমন ট্রট্স্কী, জিনোভিয়েভ, রাডেক, কিরভ প্রভৃতিরা—এ ধারণা যে কেমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল বলা শক্ত। স্টালিন মানেই সাম্যবাদ এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হল, আরো বদ্ধমূল হল এই বিশ্বাস যে তিনি পিতা, তিনি কোন অন্যায় করতে পারেন না। এই বিশ্বাস চলল ১৯৫৫ পর্যন্ত।

অন্যদিকে ১৯৩০ দশকের প্রথম কয় বছর বেনিটো মুসোলিনী আর অ্যাডল্ফ্ হিটলার দেশপ্রেমে আপ্লুত এক গণ-জাগরণের সৃষ্টি করলেন বলে মনে হতো। আমাদের মনে তাদের বিশেষ প্রভাব পড়ল, কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজরা ছিল আমাদের শত্রু, এবং মুসোলিনি ও হিটলার উভয়েই বৃটিশকে রীতিমত শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর মনে হতো। ফলে, ভারতের জনগণের মনে তাঁদের সম্বন্ধে অনুরাগই ছিল বলা যায়। তখনও স্পষ্ট হয়নি তাঁদের দুজনের অভিযান মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে কত ভয়াবহ ও অনিষ্টকর। তখন আমাদের দেশের বড় বড় সর্বসম্মানিত নেতারা সাধারণ লোককে ভাল করে, পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে ও জানিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই করেননি একদিকে সমাজবাদ এবং কম্যুনিজম এবং অন্যদিকে নাৎসীবাদ ও ফ্যাশিবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী? আমার বিশ্বাস অধিকাংশ ভারতীয় নেতারই, এই দুই দর্শনের মৌলিক পার্থক্য কী সে-বিষয়ে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। সেই কারণে তাঁরা অনেকদিন বহু দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের দোটানায় কাটিয়েছেন। ফ্যাশিজমের অন্তর্নিহিত দর্শন ও বিবর্তনের রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিশ্লেষণী শক্তির অভাবে, অধিকাংশ ভারতীয় নেতার কাছেই—নেহরু প্রভৃতি কয়েকজন বাদে—ন্যাশনাল সোশ্যালিজ্‌ম্ ও অটার্কি বা 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা' কাম্য বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল, এমন কি 'একটিমাত্র-দেশে-আবদ্ধ সমাজবাদ' তত্ত্বেরই মাসতুতো ভাই বলে ধারণা হওয়া বিচিত্র ছিল না। আমাদের মতো অর্বাচীনদের ত কথাই নেই। মুসোলিনি, স্টালিন, হিটলার, তিনজনেই ত ডিক্টেটর ছিলেন, নয় কি? আর তিনজনেই ত একই সুরে উঠতে বসতে জন্মভূমির দোহাই দিতেন। তাছাড়া, মুসোলিনি বা হিটলার আমাদের মতো দেশে বেশী প্রিয় হওয়া স্বাভাবিক

—দুজনেই ইংরেজবিদ্বেষী, এবং দুজনেই আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসী, বলতেন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে হবে। সেই হিসাবে স্টালিন যেন বেশী মৌলবাদী ছিলেন, সব কিছু ধ্বংসের পক্ষে, বিশেষত সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য ধ্বংসের পক্ষে। আমার মনে হয় মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের পক্ষে এই দ্বন্দ্বই ছিল সব থেকে বড়, এবং সব কিছু যেন গুলিয়ে দিত। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। ইংরেজরাও ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত হিটলার ও মুসোলিনিকে বন্ধু বা আপনজন মনে করত, ফলে ইংল্যাণ্ডের কাগজে তাদের প্রশংসা করে লেখা হতো। আমাদের দেশের সংবাদপত্রে মুসোলিনি আর হিটলারের অভিযান ও সাফল্যের খবর যে উচ্ছ্বাসের ভাষায়, নানাবিধ ফোটোগ্রাফ দিয়ে ভক্তিভরে ছাপা হতো, সে-সব যদি আমরা এখন খুলে দেখি তাহলে সংবাদপত্রদের এই উৎসাহের পিছনে ইংরেজ সরকারেও যে সহানুভূতি বা আনুকূল্য ছিল, সে-সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক। এখনকার ভাষায়, আমাদের সংবাদপত্রগুলি জার্মানি ও ইটালির কাছে ঘুষ খেয়ে এই সব বিষয় ফলাও করে ছাপত, এই কৈফিয়তে সব কিছুর উত্তর চলে না। বিশেষত যখন স্মরণ করি যে রবীন্দ্রনাথ নিজে মুসোলিনির নিমন্ত্রণ গ্রহণে উন্মুখ হন, রোমাঁ রোলাঁই তাঁকে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণের কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করেন।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে, ফলে অনেক স্মৃতি এত বিবর্ণ হয়ে গেছে যে ঠিক করে বলা যায় না। তবু আমার যা মনে আছে তাই বলছি। সারা বঙ্গদেশে তখন এত বেশী, এবং সময়ে সময়ে এত নিচুমানের রাজনৈতিক অন্তর্কলহ চলছিল, যে অধিকাংশ বাঙালীর পক্ষে ইওরোপে এবং সুদূর প্রাচ্যে যে ধরনের আমূল তোলপাড় শুরু হয়েছিল, মাথা ঠাণ্ডা করে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে, তা ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সবসময়ে সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৩৬ সালে আমি তখন সবে বি-এ পাশ করেছি, এমন সময়ে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হল। সে সময়ে আমার মতো অজ্ঞলোকও খুব আশ্চর্য হয়ে গেছল যে বাংলার ছোটবড় কত নেতাই কত উল্টোপাল্টা কথা বলেছেন। খুব কম লোকেই তখন বুঝেছেন যে এই হলো বিশ্বব্যাপী চরম বিপদের সূত্রপাত। বহুলোক ছিলেন যাঁরা বরং উল্টোদিকে দরদ দেখাতেন। আমার নিজের কথাই বলি। যতদিন না ইণ্টারন্যাশানাল ব্রিগেড তৈরি হল, র‍্যাল্‌ফ্‌ ফক্স ইত্যাদি নেতৃত্বভার নিলেন, তত দিন আমি যে-নাকি কিছু কিছু এ বিষয়ে জানতুম এবং পড়াশোনা করেছিলুম—সঠিক মনস্থির করতে পারিনি। এমন কি যখন ব্রিগেড তৈরি হল, স্পেনে গেল, অনেকে প্রাণ দিল, তখনও—নেহরু এবং দু-এক জন বাদে—অনেক নেতা ব্যাপারটিকে বয়স্কাউট অভিযান বলে ব্যঙ্গ করেছেন। ১৯৩৫ সাল নাগাদ যখন মোজাফ্‌ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত,

সোমনাথ লাহিড়ী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, হীরেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে, বিশ্বনাথ মুখুজ্যে প্রভৃতিরা বাংলা কংগ্রেসের সদস্য হলেন, তখনও কিন্তু সারা বিশ্বে কী বিপদ ঘনিয়ে আসছে সে সম্পর্কে জনসাধারণের ধ্যানধারণা খুব স্পষ্ট হয়নি বা করার জন্যে চেষ্টা করা হয়নি। আমার নিজের কথাই বলি। স্পেন সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ধারণা সত্ত্বেও, জার্মানির বিরুদ্ধে ইংরেজদের ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও, ১৯৪০ সালে যতদিন না ডানকার্কের পতন ঘটল ততদিন নাৎসি বা ফ্যাশিস্টদের হাতে মিত্রশক্তি যতবারই অপদস্থ হতো, তখনই আমার মনে বেশ উল্লাস হতো ; মনে হতো বেশ হয়েছে ইংরেজদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে। ডানকার্কের যখন পতন ঘটল তখনই কেবল ভালভাবে বুঝতে পারলুম, আমরা কী বিপদের মুখে পড়েছি। সে-বোধ যে আমার হল তার প্রধান কারণও ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত। তখন আমি অক্সফোর্ডে যে-সব ভাল ভাল বন্ধু পেয়েছি তারা সকলে হঠাৎ রাতারাতি একসঙ্গে ফৌজে চলে গেল, আমি নিতান্ত একা হয়ে গেলুম।

কিন্তু একলাফে সময় পেরিয়ে লাভ নেই। ১৯৩৪ সালের কথায় ফিরে যাই। আই-এস-সি পরীক্ষার ফল বের হবার পর গ্রীষ্মের শেষে কলকাতায় ফিরে গিয়ে ভাবলুম পদ্মপুকুরের সাঁতার ক্লাবে গিয়ে সাঁতার শিখব। শুরু করার তিনদিনের দিন খুব অল্পের জন্যে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেলুম। যিনি শেখাতেন তিনি গুনতে গিয়ে একজন কম দেখে খুঁজে আমাকে টেনে তুললেন। পেট থেকে জল বের করা ব্যাপারটা খুব সুবিধার নয়। ছেড়ে দিলুম পথটা, বদলে গেল মতটা। এরপর, এত বছর ভাসতে না শিখে মোটামুটি ত বেশ কেটে গেল।

চুবোনি খেয়ে আমার হাম হল। হামের পর গলা আর টনসিল ফুলে হলো একান্বয়ে জ্বর, কিছুতেই ছাড়ে না। একদিন রাতে হঠাৎ জ্বর নেমে গিয়ে আমাকে অত্যন্ত দুর্বল করে দিল। সকালবেলা চোখ খুলে দেখি আমার দুপাশে বাবা মা আর খুকি, সঙ্গে দুজন ডাক্তার আমাকে ঝুঁকে দেখছেন। তারপর দিন দুয়েক আমার চারপাশে যা কিছু হচ্ছে সবই বহুদূরে ঘটছে বলে মনে হল। তারই মধ্যে একদিন সকালে জানালা দিয়ে দেখি দূরে নারকোল গাছের পাতায় ভোরের রোদ ঝলমল করছে, আর ঘরের পাশের গলি থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের সরু-গলার চেঁচামেচি আর হাসি ভেসে আসছে। এর পর থেকে লক্ষ্য করেছি যখনই অসুখের বাড়াবাড়ি হয়েছে তখন আমার ইন্দ্রিয়বোধ তীক্ষ্ণ হয়েছে আর সৌন্দর্যবোধ বেড়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে ভাল হয়ে গেলুম। শুনলুম গলার স্ট্রেপ্টোকক্কাস হয়ে আমার হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভ্‌ কাজ করা প্রায় বন্ধ করেছিল, এবং কিছু সময়ের জন্যে আমার নাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না, লুকোচুরি খেলছিল। আই-এস-সির

ফিজিওলজি জ্ঞান কাজে লেগে গেল, আমার অসুখের তালিকায় আরেকটি নাম যোগ হল। তখন আমার বয়স সাড়ে সতেরো। অবশেষে একত্রিশ বছর বয়সে আমি স্ট্রেপ্টোকক্কাস মুক্ত হলুম। ১৯৪৬-৪৭ সালে এক বছরের মধ্যে পরপর আমার দু বার বেশীরকম ভাল্‌ভ্‌ ব্লক হয়, ফলে ১৯৪৭ সালের শীতের গোড়ায় ডাঃ সত্যবান রায় আমার টনসিল দুটি কেটে বাদ দেন। আমার ভাগ্য ভাল ১৯৩৪ সালের ভাল্‌ভ্‌ ব্লকের ফলে আমার হৃৎপিণ্ডের বাত হয়নি, এবং পরেও আমি এই রোগ থেকে রেহাই পেয়েছি। পরে এ বিষয়ে কথা হবে। আমি যে তিথিতে জন্মেছি তার দয়াতেই নিশ্চয় এসব সম্ভব হয়েছে!

ইংরেজি অনার্স নিয়ে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের পুরনো বাড়ির পবিত্র কোঠায় প্রবেশাধিকার পেলুম। দোতলার উত্তর পশ্চিম কোণের শেষপ্রান্তে যেখানে বাঁদিকের বারান্দাটি শেষ হয়েছে তার প্রান্তে ইংরেজি অনার্স ক্লাস। চত্বরটি হল যাকে বলা যায় মন্দির। তার মধ্যে অনার্স ক্লাসটি হল দেউল, তার মধ্যে দিয়ে ঢুকে আরেকটি ছোট্ট ঘর যাকে বলে গর্ভগৃহ বা প্রতিমার কক্ষ। এই ছোট কক্ষটি ছিল প্রোফেসর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নিজের ঘর, দশ ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া। তাতে ছিল ওঁর কাঠের টেবিল, ওদিকে ছিল তাঁর হাতলওলা চেয়ার, আর এদিকে ছিল একটিমাত্র হাতলবিহীন চেয়ার। যখন ডাক পড়ত, তখন প্রোফেসর যদি প্রসন্ন থাকতেন, তা হলে মুখ দিয়ে ছোট্ট শব্দ করে বসতে বলতেন। যদি অপ্রসন্ন থাকতেন তাহলে ঘোঁৎ করে একটু শব্দ করে এমন ভঙ্গী করে বসতে বলতেন যে কাপড়চোপড় ভিজে যাবার অবস্থা হতো। দ্বিতীয় ধরনের ডাকও একরকম পুরস্কারই বলা যায় কারণ মোটামুটি ভাল ছেলে না হলে তাঁর মুখ থেকে বকুনি খাবার জন্যে ব্যক্তিগত ডাকেরও সৌভাগ্য হতো না। এই দুই কারণ ছাড়া তাঁর ঘরে ঢোকার অধিকার আর কোন তৃতীয় কারণে তাঁর ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হতো না। নিজে থেকে কোন ছাত্র তাঁর ঘরে ঢুকে যাবে, এ ছিল কল্পনার অতীত। এই ছিল যাকে গ্রীকরা সম্ভবত বলত ডেল্‌ফিক পূজার উপকরণ। নেহাৎ আপনার ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, কিসে এ অধিকার অর্জন করা যায় কেউ জানত না। অন্য কোন বিভাগে এই গূঢ় বিধিনিয়ম ছিল না, এমন কি অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের বিভাগেও নয়। পুরুষানুক্রমে ইংরেজি বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপকদের অস্থি দিয়ে হয় এই ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা, তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবন কেটেছে ব্রাউনিংএর ব্যাকরণবিদদের মতো। সে জগতে প্রবেশপত্র পাওয়া যেন দ্বিজত্বলাভের সামিল। তার উপর যদি কেউ পরীক্ষায় তাঁর কাছে প্রথম শ্রেণীর মার্ক পায় তাহলে ত কৈলাসে প্রবেশের অনুমতির মতো হতো। আমাদের যুগে এই জগতে কোন

মহিলার স্থান ছিল না, একমাত্র ছিলেন সুজাতা রায়। তিনি ত বি-এ ক্লাসে পড়েননি, এম-এ ক্লাসে এসেছিলেন। এবং প্রোফেসর ঘোষের কাছে পড়া মানেই অনার্স পড়া।

কেউ যেন না মনে করেন এসব আমার অন্ধ ভক্তি বা পৌত্তলিকতার কথা। আমার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে এমন কয়েকজন ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন যাঁদের সমকক্ষ সে-সময়ে অক্সফোর্ডেও ছিলেন না। ১৯৩৯-৪০ সালে অক্সফোর্ডে যেসব ইংরেজির ছাত্রের সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলাপ হয়েছে বা শিক্ষকদের দেখেছি,—যেমন মার্টনের এড্‌মাণ্ড ব্লাণ্ডেনকে—তার ফলে এই ধারণা হয়েছে। তাছাড়া প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরিতে ইংরেজি সাহিত্যসংগ্রহ ছিল অবিশ্বাস্য রকমের মূল্যবান, পৃথিবীর খুব কম স্থানেই অত মূল্যবান ও বিস্তৃত সংগ্রহ আছে। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যেরকম চসার বা শেক্সপিয়র পড়াতেন ১৯৩৯-৪০ সালে অক্সফোর্ডে আমি সেরকম পড়ানো শুনিনি। অনেকেই হয়ত শুনে বিস্মিত হবেন, 'প্রেফেস টু দি লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্' উপর শ্রীকুমার বাঁড়ুজ্যের গবেষণার বই অক্সফোর্ডে ইংরেজির ছাত্ররা তখন শ্রদ্ধাসহকারে পড়ত। শ্রীকুমারবাবু যেভাবে লেকচার দিতেন এবং ইংরেজি উচ্চারণ করতেন তাতে মনে হতো কি খটমট গুরুগম্ভীর ইংরেজি না বলছেন, কিন্তু তাঁর লেকচার লিখে নেবার পর সেগুলি পড়লে মনে হতো, তাঁর ভাষা যেমন সুন্দর তেমনি সহজ, বাক্যগুলি ছোট ছোট ও ছন্দোময়। তারকনাথ সেন আমাদের সময়ে বেকন এবং এলিজাবিথান ও জর্জিয়ান যুগের গদ্য পড়াতেন, এবং অতি অল্প বয়সেই কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন। অপূর্ব চন্দ পড়াতেন জর্জিয়ান ও রেস্টোরেশন যুগের কাব্য, বিশেষত মেটাফিজিক্যাল কবিদের। ডান্ বা মার্ভেলের কবিতা তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। হিরণকুমার ব্যানার্জি, সোমনাথ মৈত্র, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত একেক বছর একেক বিষয় পড়াতেন। আমি যখন ১৯৩৬-এ কলেজে এম-এ ক্লাসে ঢুকেছি সে-সময়ে হাম্‌ফ্রি হাউস এলেন উনিশ শতকের কাব্য পড়াতে। অবশ্য এর মধ্যে কয়েকজনের উচ্চারণ বা ভুল মাত্রায় জোর দেবার দরুণ মূল ভাষার শব্দগুণ কিছু কিছু নষ্ট হতো। কেউ কেউ যেমন রুথকে বলতেন রাথ, গিটারকে বলতেন গুইটার। অপূর্ব চন্দ এসব ব্যাপারে আমাদের ডেঁপো তৈরি করতে ছিলেন ওস্তাদ। যেমন একদিন একজন প্রোফেসর আমাদের পাশ দিয়ে বারান্দায় দশ পা-ও বোধ হয় এগিয়ে যাননি, এমন সময়ে অপূর্ব চন্দ চেঁচিয়ে বললেন, 'লাল ফিতে কাকে বলে জানো?' আমরা যা জানি—অর্থাৎ সরকারি দীর্ঘসূত্রিতা—বলতে যাচ্ছি উনি ইতিমধ্যে চেঁচিয়ে হেসে উঠে বললেন, 'ঐ দেখ', বলে

প্রোফেসারটির শার্টে অফিসের লাল ফিতেয় গাঁথা গিল্টি-করা ক্রেমেঞ্জ বোতামগুলি আঙুল দিয়ে দেখালেন। চন্দ সাহেব তাঁর র‍্যান্‌কিন বাড়িতে তৈরি বিলিতি স্যুট আর ফরাসী সিল্কের টাই পড়তে খুব ভালবাসতেন। স্যর ওয়াল্টার র‍্যালের মতো মহিলাদের প্রতি খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেন। একদিন এম-এ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সেমিনার নিচ্ছেন ; হঠাৎ সুজাতা রায়ের হাত থেকে পেন্সিলটি ছিটকে প্রোফেসর চন্দর চেয়ারের পাটাতনের তলায় মেঝেতে ঢুকে গেল। চোখের পলকে চন্দ সাহেব মাটিতে উপুড় হয়ে প্রায় শুয়ে পড়ে হাত ঢুকিয়ে পেন্সিলটি বের করে মাথা ঝুঁকিয়ে 'বাউ' করে সুজাতা রায়ের হাতে সেটি দিলেন।

অনার্স ক্লাসগুলি দিনে অনেকগুলি আর অনেকক্ষণ করে হতো। তাছাড়া ছিল টিউটোরিয়াল আর লাইব্রেরির পড়া। প্রায় আশ্রমবাসের মতো। তবে শিক্ষকরা ছাত্রদের থেকে বেশী বই কম খাটতেন না। ফলে ফাঁকি দেয়া বা নালিশ করার রাস্তা ছিল বন্ধ। শ্রীকুমার ব্যানার্জি মশাইয়ের বাড়িতে কোনদিন গেছি বলে মনে পড়ে না। তবে তারকনাথ সেনকে প্রায়ই দেখা যেত সন্ধ্যা সাতটা অবধি ছাত্রকে বসিয়ে তার খাতা সংশোধন করছেন অথবা কিছু বোঝাচ্ছেন। রবিবার বিকালে সোমনাথ মৈত্রের বাড়ি যাওয়া ছিল। যে-কোন সময়ে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা করা যেত, কখনই তিনি ব্যস্ততার অজুহাত দিতেন না। কিন্তু যিনি শুধু একা আমাকে ১৯৩৫ সালের পুরো গ্রীষ্মের ছুটিটা কোমর বেঁধে পড়িয়েছেন তিনি খোদ প্রোফেসর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। প্রতি সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন তাঁর বাড়িতে ঘড়ির কাঁটা ধরে এগারোটায় হাজিরা দিতে হতো। তিনি দুপুরের খাওয়া সেরে তাঁর বাবার প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ঘরে অপেক্ষা করতেন। ওঁর বাবা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ৺ঈশানচন্দ্র ঘোষ, পাঁচ খণ্ডে যিনি বৌদ্ধ জাতক অনুবাদ করে বিস্তৃত টীকাসহ ছাপান। লাইব্রেরি ঘর ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটের বাড়ির দোতলায়। আমি ছাড়া পেতুম সাড়ে তিনটে, পৌনে চারটেয়। শেক্সপিয়রের নাটক কিনে, বাঁধাই খুলে, প্রতি পাতার ফাঁকে সাদা কাগজ ঢুকিয়ে নতুন করে আবার বাঁধাতে হতো। সেই বইয়ের ছাপা পাতায় মার্জিনে আর সাদা পাতায় লিখতুম প্রোফেসর ঘোষের নোট। তাঁর নোটসুদ্ধ লিয়ার, ওথেলো, মেজার ফর মেজার, টেম্পেস্ট, অ্যাজ ইউ লাইক ইট এবং হেনরি দি ফোর্থ দ্বিতীয় ভাগ, অথবা আমাদের অনার্স কোর্সের পাঠ্য হ্যামলেট এবং মার্চেন্ট অভ ভেনিস আমাদের গ্রোভ লেনের বাড়ি থেকে যে কোথায় গেল, এখন বড় আপসোস হয়। বড় খারাপ লাগে, আমি কোথায় শিক্ষকতা করে আমার গুরুদের ঋণ শোধ করব, না পেট ভরাবার জন্যে চাকরির

লোভে আমি পালিয়ে গেলুম। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোফেসারি করার সময়ে অনেক প্রতিজ্ঞা করেছি আমি আমার গুরুদের মত ব্রতী হব, কিন্তু বিলক্ষণ জানি আমি তাঁদের কড়ে আঙুলের যোগ্যও হতে পারিনি। ছাত্ররা যখন আমার চেয়ে ভাল শিখেছে, তখন আমার গর্ব হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আমার গুরুরা আমার পিছনে যত সময় অকাতরে দিতেন তার সিকির সিকিও খুশি মনে দিতে পেরেছি কিনা সন্দেহ।

আমাদের সময়ে ইকনমিক্স ছিল এক দিকে রাজনীতি ও অর্থনীতির বিবর্তন-ইতিহাস আর অন্যদিকে অর্থনীতির খিচুড়ি। অধ্যাপক ঘোষাল পড়াতেন অর্থনীতি—দুজন ঘোষাল ছিলেন, বড় ডাঃ ঘোষাল ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। ছোটকে আমরা বাচ্চা ঘোষাল বলতুম। অর্থনীতির বিবর্তন ইতিহাস পড়াতেন অধ্যাপক দুর্গাগতি চট্টোরাজ। কত বছর ধরে যে তিনি হিন্দু হস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন ভগবান্‌ই জানেন। প্রত্যেকটি ছাত্রকে চিনতেন। ক্লাসে আসতেন, পুরনো জরাজীর্ণ মোটা নোট বই নিয়ে, পাতা খুলে খুলে পড়ছে। এম-এ পাশ করার পর যখন প্রথম পড়াতে শুরু করেন তখন বোধ হয় উনি নোটগুলি লেখেন। কারোর দিকে না তাকিয়ে ছাত্রদের রোলকল করতেন, তারপর মুখ তুলে ছাদের দিকে চোখ নিবদ্ধ করে এক নিঃশ্বাসে বক্তৃতা দিয়ে যেতেন, গলার স্বর উঠত না নামত না, একবারও থামতেন না। অথচ কোন ছেলে যদি বিশেষ হট্টগোল বা অমনোযোগ দেখাত, ছাদের দিকে চেয়েই তিনি তার নাম করে থামতে বলতেন। সময় শেষ হলে হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে যেত, গটগট করে চলে যেতেন। হাবভাব দেখে মনে হতো অত বছর ধরে সুপারিন্টেণ্ডেন্টগিরি করে তিনি বুঝেছিলেন যে ছাত্রদের সঙ্গে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল, না হলে তাদের আবদার বেড়েই যাবে। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের দুটি সংকেত বাক্য ছিল। একটি রুসোর থেকে, অন্যটি হব্‌স্ থেকে। দুটিই তাঁরা সম্ভবত ওঁকে কল্পনা করে লিখেছিলেন। প্রথমটি ছিল: 'মানুষ জন্মেছে স্বাধীন হয়ে, কিন্তু সর্বত্র সে শিকলে বন্দী'; দ্বিতীয়টি, 'মানুষের জীবন নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব, হীন, পশুর মতো এবং হ্রস্ব।' এত বছর পরে যখনই দুর্গাগতিবাবুর কথা ভাবি তখনই মনে হয় তিনি পড়িয়েছিলেন বলেই আমার হব্‌স্, লক্‌, বার্কলি এবং হিউমের মর‍্যাল ফিলজফি সম্বন্ধে উৎসাহ ও সামান্য জ্ঞান হয়েছিল। সে জ্ঞানটুকু না হলে আমি ইংরেজি গদ্যে, উপন্যাসে, কাব্যে, ইংরেজজাতির অন্তর্নিহিত জীবনদর্শনের ধারাবাহিকতা ঠিক বুঝতে পারতুম না। তাছাড়া, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান না হলে ইওরোপীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের অন্তর্নিহিত তত্ত্বও বুঝতুম না যা নাকি দু'শ বছরের মধ্যে হাজার ফুলে বিকশিত,

হাজার তর্কে আলোড়িত হয়ে কেনে, অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল ও অ্যালফ্রেড মার্শালে থামল। ১৯৩৬ সালের আগে পর্যন্ত অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলাপ হয়নি, বি-এ পাশের পর তিনি আমাকে মাঝে মাঝে তাঁর ক্লাসে যেতে দিতেন।

প্রোফেসর বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গেও এসময়ে আমার আলাপের সৌভাগ্য হয়। সম্প্রতি তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে বাংলা ভাষায় তাঁর পথিকৃৎ কাজের পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। তাঁর বাংলা লেখার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কথোপকথনের ভাষার সাদৃশ্য আছে। আমার মনে হয় তিনি বার্নাড শ-এর 'বুদ্ধিমতী মহিলাদের সাহায্যার্থে' প্রবন্ধাবলী তাঁর আদর্শ হিসাবে নেন। আমার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা ছোট ছোট পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তাঁদের সঙ্গে যেতুম। দূর থেকে ঘরে কারোর ছায়া পড়লেই বুঝতেন প্রবন্ধ ভিক্ষায় তার আগমন। জিগ্যেস করতেন, 'কিছু দেবে, না দেবে না?' ঘরে দুটি টুকরি থাকত; একটিতে থাকত যেসব প্রবন্ধ আগে ছাপা হয়েছে এবং এখন টাকা দিতে হবে না, অন্যটিতে থাকত পূর্বে ছাপা হয়নি এবং ছাপতে চাইলে টাকা দিতে হবে। অবশ্য, সর্বোচ্চ দর্শনী ছিল মাত্র দশ টাকা।

১৯৩২-৩৬ সালের যুগে ভারতে ও পৃথিবীর অন্যত্র যেসব যুগান্তকারী ব্যাপার ঘটছিল সে-সব আমার মতো কীটের চোখে কী রকম মনে হতো? আগেই বলেছি প্রেসিডেন্সী কলেজ ছিল সুরক্ষিত জগৎ। উদ্দেশ্যই ছিল কয়েক বছর ধরে যতখানি সম্ভব পুঁথিগত ও শিক্ষকদত্ত বিদ্যা হজম করা, কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল সেই লক্ষ্য যথাসম্ভব উত্তমভাবে সম্পূর্ণ করা। যাদের বুদ্ধি ও ধীশক্তি ছিল তারা হতো বেশী লাভবান, মাস্টারমশাইরা তাদের প্রতি মনোযোগও দিতেন। ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তির কখনও ঘাটতি হতো না, মাস্টারমশাইরাও বিত্ত বা সমাজ-মর্যাদায় কে বড় কে ছোট তার তোয়াক্কা রাখতেন না। পাইকপাড়া রাজের বিমলচন্দ্র সিংহের দুই ধরনের সম্পদই ছিল, কিন্তু তা বলে মাস্টারমশাইদের কাছে তাঁর বিত্তের কদর বেশী ছিল মোটেই বলা যায় না। অথচ যেটুকু বাইরে থেকে শুনতুম, স্কটিশ চার্চ কলেজে পর্যন্ত বিত্ত ও সামাজিক মর্যাদার অতিরিক্ত খাতির বেশ ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে কিন্তু আভিজাত্য বিচার হতো বিদ্যা ও চিন্তাশক্তির ভারের উপর। সে হিসাবে প্রেসিডেন্সী কলেজ নিঃসন্দেহে অভিজাত ছিল বলা যায়। বর্তমান কালের সরকার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির আভিজাত্যের প্রতি অসহিষ্ণু ও ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ঐতিহ্য ও সুনামের যে ক্ষতি ও অসম্মান করেছেন তার জন্যে একহিসাবে ক্রোধ যেমন হয়, গর্বও তেমন হয়। যারা নিজেরা

ক্ষুদ্র এবং নিজেদের বিষয়ে বড়াই করার বিশেষ কিছু নেই, তাদের কাজই হচ্ছে যারা বড় তাদের কী করে টেনে নামানো যায়, নষ্ট করা যায়। কারণ, যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে তাঁরা এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের জীবনে ভীতি ও আতঙ্কের বস্তু হয়ে দাঁড়ান।

সে যাই হোক, আমার কীটদৃষ্টিতে ১৯৩২-৩৬ সাল কী রকম ছিল তাই দেখা যাক। আমরা ১৯৩২ সালে কলেজে ভর্তি হই। এই বছরে বঙ্গদেশে সন্ত্রাসবাদ তুঙ্গে ওঠে। একশ'টির বেশী রাজনৈতিক হত্যা হয়, ১৯৩১ সালে যা হয় তার বেশী। গল্প আছে, আগের কালের প্রিন্সিপাল এইচ. আর. জেম্‌স্ একবার হিন্দু হস্টেলের ছাত্রদের কিভাবে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। ইংরেজ বলে বিশ্বাস করে তাঁকে পুলিশ নাকি আগে থাকতে জানিয়েছিল, তারা অমুক দিন অমুক সময়ে হানা দেবে। তিনি তাড়াতাড়ি হিন্দু হস্টেলে রাত্রিতে গিয়ে ছেলেদের বলে-কয়ে অস্ত্রগুলি যোগাড় করে উধাও হন। ফলে পুলিশ হানা দিয়ে কিছু পায়নি। আমাদের সময়ে অবশ্য না কলেজে, না হিন্দু হস্টেলে, সন্ত্রাসবাদী কেউ ধরা পড়েনি। যুগান্তর বা অনুশীলন দলের দরদী অবশ্য অনেকে ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' কারোর ভাল লাগেনি, বিরুদ্ধ সমালোচনা অনেক হয়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তবু একটি অমূল্য চরিত্র ছিল, অমূল্য। 'চার অধ্যায়ে' তাও ছিল না। আমার এখন মনে হয়, 'চার অধ্যায়ে'র প্রতি বিরক্তি আসাতেই আমার 'শেষের কবিতা'র সমালোচনা—যা কলেজ পত্রিকায় বেরোয়—তা অত রূঢ় হয়েছিল। এই কয় বছর অবশ্য মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, কাঁথি, এগরা, পটাশপুর, সবঙ্গ, পিংলা থানায় কংগ্রেস আলোড়নের মশালে সারা দেশ আলোকিত হয়। তা সত্ত্বেও, ১৯৩১-৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ব বা উত্তরবঙ্গে তেমন জোরদার হয়নি, দুর্বলই ছিল বলা যায়। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সূর্য সেন যখন ধরা পড়েন তখন অবশ্য নতুন করে শোরগোল পড়ে। কলেজে এবং অন্যত্র তখনই আবহাওয়া আস্তে আস্তে বদলাতে শুরু করেছে। মার্ক্সীয় দর্শনের পদক্ষেপ ঘটেছে। হিন্দু হস্টেলে গোলাঞ্জ এবং লেফ্‌ট্ বুক ক্লাবের বই আসতে শুরু করেছে। গোলাঞ্জের প্রকাশিত বই বিষয়ে আমাদের এত ভক্তি হল যে অনেকেই গোলাঞ্জের উল্লেখ করত কমরেড গোলাঞ্জ বলে। গোলাঞ্জ ছিল ইহুদী প্রতিষ্ঠান, মুনাফা করাই ছিল উদ্দেশ্য।

১৯৩৩ সালে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে কংগ্রেসের মধ্যে আবার দলাদলি আর ছাড়াছাড়ি শুরু হল। প্রধান বিরোধী ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু ও বিধানচন্দ্র রায়। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের শবযাত্রা আমি রসা রোডে

প্রীতিতোষ রায়ের বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে দেখি। তার আগে একটি ঘটনায় আমার প্রাদেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা জন্মায়। কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রার্থী ছিলেন। তিনি নিঃসন্দেহে বিশেষ যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য! তখন সকলের মুখে ধুয়া উঠল, কোথাকার নামগোত্রহীন মেদিনীপুরী এক কেয়টের ('কৈবর্তের') বাচ্চা হবে সি-ই-ও! সে কলকাতার কী জানে? এর দু-এক বছর পরে ১৯৩৫ সালে সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যখন চালু হল, তখন অধিকাংশ উঁচু জাতের রাজনৈতিক নেতারা যেভাবে দেশের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের জমিজমা রক্ষা ও বৃদ্ধির লোভে ব্যস্ত হয়ে একান্ত ঘৃণা ও দম্ভবশে বঙ্গের কৃষক সমস্যা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন তা দেখে আমার বিতৃষ্ণা আরো বাড়ে। লবণ সত্যাগ্রহ, চৌকিদারী করপ্রদান রোধ, ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট সে সব ঠিক আছে, সে-সবে ত কোন ভদ্রলোকের হাড়গোড় ভাঙবে না, জাত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। অন্যদিকে, ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে মৌলানা ভাসানী জমিদারীপ্রথা বর্জন, তার সঙ্গে ঋণের ও সুদের হার মকুব আর কমানো ব্যাপারে যে আন্দোলন শুরু করেন, তাতে বঙ্গীয় কংগ্রেস থেকে মোটেই সাড়া মিলল না। উল্টে, তাঁরা যত রকমে পারলেন সে-আন্দোলন যাতে নির্মূল হয় তার উদ্দেশে দল ভাঙা, নতুন দল পাকানো, হাওয়া পালটানোর আশায় নানা খুচরো আন্দোলন শুরু করলেন। ফলে তাঁরা ভাসানীকে আরো গালভরা বিপ্লব এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাভরা আন্দোলনের পথে পিছন থেকে সজোরে ঠেলে দিলেন।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফজলুল হক ও আজিজুল হকের মতো নেতারা বঙ্গীয় কৃষিঋণ লাঘব আইন প্রবর্তনে তৎপর হলেন। তাঁরা নিজেরা উচ্চ মধ্যবিত্ত, জমিজমার মালিক ছিলেন। ফলে তাঁদের রুচিতে অতি-বিপ্লবী অথবা সাম্প্রদায়িক শোরগোল শুরু করা বাধল। অথচ ভেবে দেখলে দেশভাগের আগে বা পরে যা কিছু হিতকর এবং পরিবর্তনমূলক আইন হয়েছে, এবং সে আইন মোটামুটি দৃঢ় হাতে জারি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বঙ্গীয় কৃষি-ঋণ আইনের মতো কোন আইন অত সম্যকভাবে, বিশেষত তখনকার পূর্ববঙ্গে, কার্যকরী করা হয়নি। তেভাগা তো নয়ই, অপারেশন বর্গা বা উদ্বৃত্ত জমি বিলিও নয়। বরং ইদানীন্তন সময়ে নতুন আইনের অজুহাতে অধিষ্ঠিত মধ্যবিত্তশ্রেণী ও জমির উপস্বত্বভোগীদের রক্ষা করে তাদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং রাজনৈতিক ক্যাডারের সৃষ্টির নামে আরেক স্তর অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত, কোন কোন বিষয়ে আরো উৎকট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। গত শতকের সৃষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যা-

ও সংস্কৃতি অর্জনের পিছনে যান, এখনকার নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিছক স্বার্থ ও বিত্তের সন্ধানে। ১৯৩০-৩১ সালেই বাবার বন্ধু মনোরঞ্জন সরকারের কাছে শুনেছিলুম বাখরগঞ্জের এবং মেদিনীপুরের সেট্‌ল্‌মেণ্ট রিপোর্টে বীটসন-বেল, জে-সি জ্যাক এবং এ-কে জেমসন প্রভৃতি অধ্যক্ষরা এক টুকরো জমির উপর, বাখরগঞ্জে চৌষট্টি পর্যন্ত এবং মেদিনীপুরে ত্রিশ স্তর পর্যন্ত উপস্বত্বভোগীদের নথিভুক্ত করেছিলেন। সে তালিকা দেখলে যে ছবি স্বতঃই মনে ভাসে তা হচ্ছে ন্যুব্জপৃষ্ঠ, কুব্জদেহ, হাড়-জিরজিরে এক চাষীর পিঠে একের পর এক চৌষট্টি বা ত্রিশ থাক বানর আরামে বসে চাষীর তৈরি কলা খাচ্ছে। মনোরঞ্জনবাবু আর বাবার কাছে আরো শুনেছি, এবং পরে নিজের চোখে দেখেছি ভয়াবহ বন্ধকী তমসুকের কথা। এর কৃপায় অশিক্ষিত নিরীহ চাষীকে তার ঘরে উৎসবের বাবদে টাকা দুয়েক ধার নিতে রাজি করাতে পারলেই হল। দশবছরের মধ্যে চক্রবৃদ্ধিহারে সেই দুই টাকার সুদ বাড়তে বাড়তে, মোট দাবী অনায়াসে তিন হাজার টাকার উপরে উঠত। ফলে সেই টাকার দায়ে তাকে সব জমিটুকু উপস্বত্বসহ সুদখোরের কাছে বন্ধক রাখতে হতো। বন্ধকী তমসুকের ব্যবসায়ে সুদের হার এত চড়া বলেই বাঙালী মধ্যবিত্ত জমির মালিকরা কদাচ ব্যবসা, শিল্প বা পেশার দিকে যাবার কথা ভাবতেন, কারণ আর কোন লগ্নিতেই এত টাকা আয় সম্ভব ছিল না, অন্যপক্ষে এ লগ্নিতে না ছিল কোন পরিশ্রম, না ছিল লোকসানের কোন ভয়। এরপরের ধাপ আসত যখন চাষীকে দেওয়ানী আদালতের মামলায় ফেলা হতো এবং সে মোকদ্দমার ফলে তার ভিটেমাটি, বাড়ি, চাষজমি এবং যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে উঠত, এবং চুপি চুপি নিলামের একমাত্র ডাকে নামমাত্র দরে উত্তমর্ণের হাতে সব কিছু চলে যেত। ১৯৩৭ সালে নতুন আইনের বলে এই সুদের হার কমিয়ে এমনভাবে বাঁধা হল যাতে ঋণশালিসী বোর্ডে গিয়ে বেচারী চাষীর কোনও-রকমে জমি ফিরে পাবার আশা একটু অন্তত থাকে। খাতকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল পূর্ববঙ্গে এবং তাদের অধিকাংশই ছিল গরীব মুসলমান চাষী। কংগ্রেসের বাঙালী হিন্দু নেতৃত্ব এই আইন পাশের সময়ে বিশেষ বিরোধিতা না করলেও, আইন বলবৎ করার সময়ে কোন বলিষ্ঠ সমর্থন দেখায়নি, উল্টে কার্যত নানা বাধার সৃষ্টি করে। ত্রিশ দশকে ব্যঙ্গ করে এই আইনকে তার আদ্যাক্ষরগুলি উচ্চারণ করে ব্যাড অ্যাক্ট বা অপদার্থ বলে উল্লেখ করা হতো। এমন কি বঙ্গের কিষাণ সভা আন্দোলনও ঋণ মকুব ও ভাগচাষীর পক্ষে সম্পূর্ণ ও অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে মৌলানা ভাসানীর সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট অভিযান পরাস্ত করতে তেমন কোন তৎপরতা দেখায়নি। বরং এ বিষয়ে বিহারে স্বামী সহজানন্দের আন্দোলন ও

অভিযান অনেক বেশী তৎপর ও বলিষ্ঠ হয়। কিন্তু সে আন্দোলনকে বঙ্গের কিষাণ সভা অকুণ্ঠভাবে সমস্ত শক্তি দিয়ে সমর্থন জানায়নি। নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে ভাসানীও হাত মেলাতে বিশেষ রাজি হননি। তার বদলে বঙ্গের কিষাণ সভা মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি বেশী ঝুঁকল, না থাকল ভূমিসংস্কার বিষয়ে কোন বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য কার্যবিধি, সূচী বা ফতোয়া, যেমন নাকি ভাসানী বা সহজানন্দের ছিল। আমার একটু ক্ষোভ হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের মতো সজাগ ব্যক্তিও, নিজের হাতে জমিদারী পরিচালনার ফলে, যাঁর বন্ধকী তমসুক এবং সেই ব্যবসার ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞান ছিল—অথবা 'রায়তের কথা'র লেখক প্রমথ চৌধুরীও এবিষয়ে স্পষ্টভাবে অথবা পরোক্ষে সহজানন্দ বা ভাসানীকে সমর্থন জানাননি। তা যদি করতেন তা হলে বঙ্গদেশের জীবন অত তাড়াতাড়ি এবং অত ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতা বিষে দুষ্ট হয়ে এত ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করত না। আজিজুল হক সাহেবের ছেলে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার সহপাঠী ছিল এবং ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আমি মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়ি গেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে আজিজুল হক সাহেব একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, যদি বঙ্গীয় আইনসভায় কংগ্রেসের বাঙালী-হিন্দুরা ঋণ-সালিশী আইনটিকে সোৎসাহে সমর্থন ও গ্রহণ করে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতেন তাহলে তাঁদের মন্ত্রিসভা গোঁড়া মুসলিম লীগের খপ্পরে পড়ত না। কংগ্রেস থেকে এই সমর্থনের অভাবেই তিনি এবং ফজলুল হক ক্রমশ দুর্বলবোধ করতে লাগলেন। তার আগে ১৯৩২ সালে বাবা আর মনোরঞ্জন সরকার এবং পরে ডিরেক্টর অভ ল্যাণ্ড রেকর্ড্‌স্‌, বিজয়চন্দ্র মুখুজ্যে ও নেপালচন্দ্র সেন মশাইদের কাছে শুনেছি যে বন্ধকী-তমসুকের খাতকরা অধিকাংশই মুসলমান, না হয় অনুন্নত তপশীলী হিন্দুজাত ও অন্যান্য উপজাতি ছিল।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক, গান্ধী-আরউইন চুক্তি, এমন কি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকও আমার মনে বিশেষ দাগ কাটেনি। হয়ত স্কুলে পড়তুম তাছাড়া বয়স অল্প ছিল বলে। সে বয়সে আমার মন কিসের পিছনে ছুটেছিল বলছি। ১৯৩২ সালের অগাস্ট মাসে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দিলেন। ফলে ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরে গান্ধীজি আমরণ অনশন ধর্মঘট সংকল্প নিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পরিবর্তিত হয়ে এল পুণা চুক্তি। পুণাচুক্তির অব্যবহিত পরে গান্ধীজি সর্বভারতীয় অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সংগঠনে কৃতসংকল্প হলেন। অথচ তিনি বি-আর আম্বেদকরকে দলে টানার বিশেষ চেষ্টা করলেন না। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে হরিজন পত্রিকা প্রকাশিত হল। গান্ধীজির পক্ষে এদিকে মনোনিবেশ করা

বহুলোকেরই অপছন্দ হল, এমনকি জওহরলালেরও। তাঁরা মনে করলেন তিনি দেশকে অযথা আসল সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট করতে উদ্যত। ১৯৩৪ সালের বিহারের ভূমিকম্পকে গান্ধীজি যখন বিধাতার অভিশাপ বললেন তখন শিক্ষিত ব্যক্তিরা ক্ষুব্ধ হলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানালেন। গান্ধীজি নিশ্চয় ইচ্ছা করেই এই ধরনের অন্ধ মতবাদ প্রকাশ করেন, ইচ্ছা ছিল হরিজনদের তাঁর সংগ্রামে ও দলে পূর্ণভাবে টানা। সেই সময়ের মধ্যে অস্পৃশ্যজাতি ও উপজাতিদের জীবনধারণ, সমস্যা ও অবস্থা সম্বন্ধে আমার সামান্য ধারণা হয়েছে। ফলে, গান্ধীজির এই প্রচেষ্টা আমার অত্যন্ত যথাযথ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নীতিগত ক্ষেত্রে কেন যে বি-আর আম্বেদকরকে নিজের কাছে টানার চেষ্টা করলেন না বুঝতে পারলুম না। একদিকে মুসলমানরা পরিত্যক্তবোধে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যেই তারা কিছুটা বিরোধী এবং সমান্তরাল শক্তি হিসাবে দেশের রাজনীতিতে স্থান করে নিয়েছে। অন্যদিকে ই-ভি নায়েকার তার অনেক আগেই দক্ষিণে অর্থাৎ মাদ্রাজে তাঁর আন্দোলন শুরু করেছেন, এবং পশ্চিমে বি-আর আম্বেদকর মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন। এই সন্ধিক্ষণে বৃটিশ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিশ্চয় গান্ধীজির চোখে সমূহ বিপদ হিসাবে দেখা দেয়। তাঁর নিশ্চয় মনে হয় তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ওদিকে জিন্না ক্রমশ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছেন। তলার দিকে হরিজনরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামের দফা হবে কাহিল। ১৯৩২-৩৩ সালের অসহযোগ আন্দোলন কেমন যেন আপনা থেকেই মিইয়ে গেল। সে-বিবাদ থেকে রক্ষা পেতে গেলে ভারতের নারী-সমাজকেও জাগিয়ে তুলতে হবে, সংগ্রামের ভিতর আনতে হবে। তবে ১৯৩৩-৩৪ সালে যে কয়টি 'হরিজন' পত্রিকার সংখ্যা আমি দেখেছি তাতে আমার মনে হতো কেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরাসরি শূদ্ররাজের ভবিষ্যৎ ঘোষণা করেননি। কেন শুধু রামরাজ্যের কথা বলতেন। গান্ধীজি বারবার বলতেন তিনি বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী এবং বর্ণাশ্রমই তাঁর মতে হিন্দুসমাজের ভিত্তি। যে পরিবর্তনের ভিত্তি স্বামী বিবেকানন্দ প্রস্তুত করে গেছলেন—ভারতের ভবিষ্যৎ শূদ্ররাজের অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং যতক্ষণ না সমস্ত নীচ জাতি ও উপজাতিরা অন্য সকল তথাকথিত উঁচু জাতির সমান হচ্ছে, এবং বিশেষ করে নারীরা পুরুষের সমান হচ্ছে, ততক্ষণ ভারতের ভবিষ্যৎ পূর্ণতালাভ করবে না—অথচ যে বিবর্তন তিনি অসমাপ্ত রেখে গেছলেন, ঠিক সেই ধাপ থেকে গান্ধীজি কেন শুরু করলেন না? গান্ধীজি হরিজনদের শিক্ষাগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবিকাগত কোন সমস্যারই আমূল সংস্কারের দিকে জাতিকে আহ্বান

করলেন না। স্বামীজি যে বলেছিলেন সমাজের এক স্তর সমাজের অন্যসব স্তরকে দাসশ্রেণীভুক্ত করে রাখতে চায় এর থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করতে হবে তা গান্ধীজি সর্বান্তঃকরণে নিলেন না। তা যদি করতেন তাহলে তিনি ডাঃ আম্বেদকরের পালের হাওয়া নিজের দিকে টেনে নিতে পারতেন।

যতই দিন গেল আমার মনে ধারণা বদ্ধমূল হল যে ভারতীয় মার্ক্সিস্টরা হয়ত বা এই ব্যাপারে ভাবের ঘরে চুরি করে হিন্দু বর্ণাশ্রমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন, বর্ণাশ্রমকে পরোক্ষে মেনে নিয়েছেন। যেহেতু ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উচ্চবর্ণ হিন্দুর আধিক্য বেশী, সেহেতু মার্ক্সীয় দলগুলির নেতৃস্থলে হিন্দু উচ্চবর্ণ জাতির গরিষ্ঠতা অত্যন্ত চোখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত বা বামফ্রণ্টের মন্ত্রীমণ্ডলীর কথাই মনে করা যাক: সারামন্ত্রীমণ্ডলীতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য মন্ত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা রীতিমত চোখে পড়ে। যদিও কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথমাবস্থায় মুসলান সভ্য অনেক ছিলেন, এখন আর সে পরিমাণ নেই, নিচু জাতি বা উপজাতিরাও মোটামুটি নেতৃত্বস্থান থেকে বঞ্চিত। এ বিষয়ে তাঁরা সব জাতির সমতা আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেননি—যার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত ছিল সার্বভৌম সাক্ষরতা ও শিক্ষা। তার উপরে অদ্যাবধি কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। ভাবখানা ছিল এবং এখনও আছে পুঁজিবাদী সমাজে সমতা আসা সম্ভব নয়। একমাত্র সাম্যবাদীরা যখন সারাভারতময় পূর্ণ ক্ষমতায় আসবেন, তখন সবকিছু আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে। যতদিন না তা আসবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলালের মতো যেন তেন প্রকারেণ তাঁদের যেখানে যেটুকু ক্ষমতা আছে, সেখানে টিকে থাকাই সবথেকে বড় কর্তব্য। এবং 'তখন সকলে কহিল, বাহবা, বাহবা নন্দলাল।' সমতা আর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষরোধ দুটি ভিন্ন জগৎ। পুলিশ আর প্রশাসন দিয়ে দ্বিতীয়টি রোধ করা যায়, কিন্তু প্রথমটি আনতে গেলে চাই উঁচু জাত ও প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতা কমানো, এবং দৃঢ়চিত্তে বারবার জোর করে কমানো। সেটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। সেটি করতে গেলেও পুলিশ ও প্রশাসনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসন ত উঁচু জাত ও প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রধান অস্ত্র। সে অস্ত্র পরিশুদ্ধ করানো শক্ত। সে যাই হোক, আমার কথায় ফিরে আসি। চৌরঙ্গী বাসস্টপে ১৯৩৪ সালে আমি একজন কাগজওলার কাছে 'হরিজন' পত্রিকা কিনতুম। মনে আছে উঁচুগলায় তাঁর সুর করে হাঁক: এই যে গান্ধীবাবা, হরিজন, হরিজন। ১৯৮৪ সালে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আবার তাঁকে দেখলুম ছেলেদের বই আর কমিক বিক্রি করছেন। আমাকে চিনতে পারেননি, কিন্তু আমি মুহূর্তে চিনতে পারলুম, হঠাৎ মনে হল কত আপন। এখন যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমিও বৃদ্ধ হয়েছি, শরীরে যতটা নয় আত্মায়।

তিনি হয়েছেন শরীরে, যেটি আরো দুঃখের। মাঝের পঞ্চাশ বছরে আমি জীবনে বেশ গুছিয়ে নিয়েছি, তিনি একটুও পারেননি। অথচ আমার চেয়ে তিনি জীবনে যে কিছুমাত্র কম পরিশ্রম করেছেন বলে আমার মনে হলনা।

১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি উনিশ শতকের রাজনীতি ও অর্থনীতির একটি মামুলী ইতিহাস কিনি। কার লেখা মনে নেই। পরিশিষ্ট হিসাবে মার্ক্সের কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো ছাপা ছিল। কি করে সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে বইটি বাজারে এল এখনও ভাবি। পরে এমিল বার্নসের হ্যাণ্ডবুক অভ্ মার্ক্সিজম যখন বাজারে এল তাতেও কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোটি ছিল। ইতিমধ্যে আমি রবার্ট ওয়েন, জন স্টুয়ার্ট মিল, এবং সিডনি ও বিয়াট্রিস ওয়েবের বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসটি পড়েছি। ম্যানিফেস্টোটি সম্পূর্ণ এক নতুন জগৎ উদ্ভাসিত করে, যার আভাস আমি 'রাশিয়ার চিঠি' ও গোর্কীর 'মা'য়ে পেয়েছি। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে ভি. ভি. গিরি ও এন-এস যোশীর কিছু লেখা সংবাদপত্রে পড়েছি। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত, বিশেষত গিরনি কামগর ইউনিয়নের, ধর্মঘটের বিষয়ে কিছু পড়ি। গিরনি কামগর তখন নতুন সংগ্রামের প্রতীকের পর্যায়ে উঠেছে। ১৯৩৫ সাল থেকে আমি স্বদেশ ও বিদেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে মোটামুটি পড়াশোনা করি। অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে একাধারে কৃষক শ্রেণী, হরিজন ও গিরিজনের ন্যায্য স্থান কী হতে পারে, সে বিষয়ে 'রাশিয়ার চিঠি' বইটি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। এই ধরনের পড়াশোনা ও চিন্তার ফলে দেশে তখন যে সব রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল সে-সম্বন্ধে কেন যেন আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। এমন কি ১৯৩৫ সালে নতুন সংবিধান যখন পাশ হল এবং তার পরে প্রাদেশিক স্বায়ত্তানুশাসন চালু হল, তার ফলে কী কী অধিকার আমরা পেলুম, সে বিষয়ে আমার জ্ঞান খুব স্পষ্ট হয়নি, যদিও ১৯৩৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় আমাদের এবিষয়ে পাঠ্য হিসাবে কিছু পড়তে হয়েছিল।

সত্যি বলতে, ইওরোপে তখন যা ঘটছিল দেশের তুলনায় তা অনেক বেশী উত্তেজনাময়। ভারতবর্ষের অন্যত্র যা ঘটত সে সব ঘটনা কলকাতাবাসীর কাছে অনেক দূর বলে মনে হতো, যদি না সেসব ঘটনা বঙ্গদেশেও প্রতিক্রিয়া আনত। কিন্তু বঙ্গদেশ তখন নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বেই মশগুল, এবং সে ঝগড়া কোন সময়েই বিশেষ পরিচ্ছন্ন হতো না, উল্টে জটিল ও কর্দমাক্ত হতো। অন্যপক্ষে ইওরোপে তখন যা ঘটছিল মনে হচ্ছিল চূড়ান্ত একটা কিছু হবে। মুসোলিনি হুহু করে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৩২ সালে যখন কলেজে ঢুকলুম তখন নাৎসিরা রাইশস্ট্যাগ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী আসন পেয়েছে। একদিকে নাৎসি অন্যদিকে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবং কম্যুনিস্টদের লড়াই শুরু হয়েছে। একদিন এ হারে, ও

অন্তদিন ওরা। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারি মাসে অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলার চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন। স্বীকার করতে এখন লজ্জা করলেও, স্বীকার করতেই হবে আমি তখন ছিলুম হিটলারের ভক্ত। এই ভক্তি চলে ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসের পর। ঐ মাসে হিটলার ফিউরর পদে অভিষিক্ত হন এবং আমাদের কাগজে নিয়মিতভাবে হিটলার, গোয়েরিং ও গোয়েব্‌ল্‌সের ছবি বেরোতে শুরু করে। আমার বিতৃষ্ণা শুরু হল ১৯৩৫ সালের মাঝামাঝি থেকে, যখন আরো কিছু পড়াশোনা করেছি। তার উপরে ছবিতে তাদের অর্ধোন্মাদের মতো মুখচোখের ভঙ্গী দেখে আমি বেশ ভড়কে যেতুম, বিতৃষ্ণা আসত গোয়েরিং আর হিটলারের মোটা রক্তখেকো চেহারা, আর গোয়েব্‌লসের মর্কটের মতো বিকৃত বামনদেহ দেখে। এর আগে পর্যন্ত আমি এমন কুহকে ছিলুম যে এপ্রিল ১৯৩৩এ যখন ইহুদীদের উপর অত্যাচার শুরু হল, তখনও আমার চৈতন্যোদয় হয়নি। ইহুদীনিধন যজ্ঞ সম্বন্ধে আমার চৈতন্য হয় অনেক পরে যখন বড় বড় লেখক ও শিল্পীরা জার্মানি ত্যাগ করতে বাধ্য হন, এবং আমি 'প্রোফেসর মামলক' ফিল্মটি দেখি। এমন কি ১৯৩৫ সালে যখন রাইশস্ট্যাগ পুড়ল তখনও ইতিহাস কোনদিকে ছুটে যাচ্ছে তার সম্যক চেতনা আমার হয়নি।

আমার যতদূর মনে আছে ১৯৩৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনালে গৃহীত আসল প্রস্তাবগুলি ১৯৩৬ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসের আগে পর্যন্ত কলকাতায় ভালভাবে প্রচার হয়নি। সেই প্রস্তাবের মূল কথা ছিল, ফ্যাশিস্ট রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াবার উদ্দেশে সব গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলির প্রতি আবেদন ও একটি সাধারণ নীতি অবলম্বন। ১৯৩৬ সালে যখন আমরা বি-এ পরীক্ষা দিই তখন একের পর এক অনেক কিছু দ্রুতগতিতে ঘটতে শুরু করে। কী ঘটছে, কেন ঘটছে আস্তে আস্তে কারণগুলি স্পষ্ট হতে লাগল। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্পেনে পপুলার ফ্রণ্ট সরকার হল, আর পরের মে-মাসে ফ্রান্সেও। অক্টোবর ১৯৩৬-এ স্পেনে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাশিস্ট দল বিদ্রোহ শুরু করে, সেই নভেম্বরে ম্যাড্রিডের অবরোধ শুরু হয়। আগেই বলেছি আমার চৈতন্যোদয় হল যখন ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্রিগেড তৈরি হয়ে রাল্‌ফ্‌ ফক্স ইত্যাদি ফতোয়া দিলেন। আমি সংক্ষেপে শুধু যে-ঘটনাগুলি আমার জটপাকানো স্মৃতিতে গেঁথে ছিল এবং আছে তারই উল্লেখ করেছি। কেবল সন তারিখের ব্যাপারে আমি বই থেকে মিলিয়ে লিখেছি। ১৯৩৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আমি আসলে তদানীন্তন মার্ক্সিস্ট রচনা ধারাবাহিক ভাবে পড়তে শুরু করি। তখন আমি উনিশ পেরিয়েছি; ইংরেজি মতে টীন্‌স্‌ এবং আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট জীবন শেষ হয়েছে।

তারকনাথ সেন আমাকে 'ক্যাপিটাল' পত্রিকার সাপ্তাহিক মন্তব্য, ডিচার্স ডায়েরি নিয়মিত পড়তে উপদেশ দেন। বলেন কলমটি নিয়মিত পড়লে ইংরেজি রচনার সাহিত্যিক আড়ষ্টতা ভাঙবে, গুরুগম্ভীরভাব কমবে। সেদিকে কতটা উন্নতি হয়েছিল বলতে পারি না, তবে পত্রিকাটির নামটি সার্থক ছিল। যদিও ভারতে কোথায়, কত টাকা কিভাবে লগ্নি হচ্ছে, কোথা থেকে সে টাকা আসছে সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না, তবুও বঙ্গদেশে আর পূর্বাঞ্চলে কোথায় নতুন নতুন শিল্পের পত্তন হচ্ছে সেটুকু দেখতুম। ছেলেবেলা থেকে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর নীতিবোধের উপর মানুষ হয়েছি এবং এখনও তাই আছি। সাচ্ছল্যের জন্যে টাকার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, ছেলেবেলা থেকে সেই উপদেশ শুনেছি, সেইসঙ্গে আরো শুনেছি যে টাকার পিছনে অনন্যমন হয়ে, অথবা সদসৎ জ্ঞান হারিয়ে হন্যে হয়ে ছোটা হল নোংরামি ও ভ্রষ্টাচার। বাঙালীর দ্বিতীয় নীতিদণ্ডে যে পতাকা সবথেকে উঁচুতে উড়ত, তার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা থাকত চারুকলা ও সাহিত্য। ১৯৩৩ সালে আই-এস-সি পড়ার সময়ে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময়ে একদিন শুনি প্রোফেসর পঞ্চানন নিয়োগী আর ডাঃ কুদ্রৎ-এ-খুদার মধ্যে কথা হচ্ছে, শেয়ার বাজারে তখন যে যে শেয়ার উঠছে তার মধ্যে কী কী শেয়ার কেনা নিরাপদ। শুনে আমি কিছুটা আশ্চর্য ও সেইসঙ্গে বিমর্ষবোধ করেছিলুম। এ কী ফিলিস্টাইন কথা! কোথায় জটিল অর্গ্যানিক মলিকিউলের বিষয়ে আলোচনা শুনব, না তুচ্ছ টাকা নিয়ে আলোচনা! তখন ষোল বছর মাত্র বয়স, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছলুম। ১৯৩৪ সালে বি-এ-তে পাসকোর্সের ইকনমিক্স্ এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মার্ক্সীয় তত্ত্ব পড়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু প্রসার হয়। শত্রুর স্বরূপ জানতে হবে। 'ক্যাপিটাল' পত্রিকা পড়ে একটা বিষয়ে আমার মনে ভাল রকম ধারণা হয়। চারদিকে এত বৃটিশবিরোধী আন্দোলন চলছে, নতুন সংবিধান চালু হচ্ছে অথচ পূর্ব এবং উত্তর ভারতে বৃটিশ লগ্নি একটুও না কমে বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল ; ভাবখানা বৃটিশ রাজত্ব যেন চিরকাল থাকবে সেই সঙ্গে কলকাতায় গুজরাটী ও রাজস্থানী পরিবারদেরও শিল্প ও ব্যবসায়ে বেশ সমৃদ্ধি ও চাকচিক্য এল। পূর্বভারতে, বিশেষত কলকাতায়, সোনারূপার বাজার বাড়ল এবং লাহা পরিবারদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। সোনার বড়াল বাটের কথা এখনও অনেকের মনে থাকতে পারে। সেই সঙ্গে বাঙালীদের একচেটিয়া ছিল কলকাতার জমিজমা। এ বিষয়ে পুরোধা ছিলেন পূর্ববঙ্গের ঢাকা-বিক্রমপুরের ভাগ্যকুল রাজারা, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কলকাতার শোভাবাজার এবং ঐ অঞ্চলের পাল ও সাধুখাঁ বংশরা। পাল ও সাধুখাঁরা ছিলেন চার বণিক বংশের অন্তর্গত এবং ভাগ্যকুলরা

ছিলেন তেলি। সকলেই ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিশেষ পটু, উপরন্তু দানধ্যানে অগ্রণী। উত্তরে পার্ক স্ট্রীট এবং দক্ষিণে এলগিন রোড এই এলাকার মধ্যে যত ভাল ভাল বাড়ি ছিল তার একটি বেশ বড় অংশের মালিক ছিলেন তাঁরা। ১৯৩৫-৪৬ দশকে বাঙালীদের উদ্যমে জমিজমার ব্যবসা বেশ ফেঁপে ওঠে, দক্ষিণে ভবানীপুর, কালিঘাট, যাদবপুর, গড়িয়ার দিকে আর দক্ষিণ-পশ্চিমে নিউ আলিপুর আর বেহালার দিকে ১৯৩০-৩২ সাল থেকেই এই অভিযান শুরু হয়।

ওষুধপত্র তৈরির জগতে সারা ভারতে অগ্রণী ছিল বেঙ্গল কেমিক্যাল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উৎসাহে সুতা, কাপড়বোনা এবং গেঞ্জি তৈরির কারখানায় বঙ্গদেশ আশ্চর্য সাফল্যলাভ করে। ১৯৩১ সালে সুদূর সিমলা পাহাড়েও পাবনা শিল্প-সঞ্জীবনীর খুব সুনাম ছিল। প্রসাধন দ্রব্যেও কলকাতার বিশেষ সুনাম ছিল। নানারকম সাবান, গায়ের ও মাথার তেল, পাউডার, ক্রীম, স্নো ইত্যাদির অনেক সংস্থা হল। কুন্তলীন-মালিকের নামে 'ধন্য হোক এইচ বোস' বহুদিন আগে থেকেই চালু ছিল, আমাদের সময়ে হিমানী গ্লিসারিন সোপ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছড়া লিখলেন। তখন সব বিখ্যাত বাঙালীমাত্রেই বাঙালীদের তৈরি যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্যের প্রশংসাপত্র লিখে দিতেন। ১৯৮৯ সালের রবীন্দ্র জন্মদিবস উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকায় একটি সচিত্র প্রবন্ধ বের হয়, একা রবীন্দ্রনাথই কত প্রকারের বাঙালীর তৈরি পণ্যের প্রশংসাপত্র লিখেছিলেন সে বিষয়ে। অথচ আজ আপনি দুর্গাপূজার সময়ে গড়িয়াহাট বাজারে যান : তাঁতের শাড়ি ছাড়া আর খুব কম জিনিসই পাবেন যা নাকি পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয়, এমন কি মাটির তৈরি অনেক জিনিসও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আসে। ত্রিশের দশকে যে শিল্পটি নতুন করে চাড়া দিয়ে ওঠে তা ছিল ধাতু ঢালাইয়ের কারখানা। কর্মবীর আলামোহন দাশ দাশনগর পত্তন করেন। স্পষ্ট মনে আছে আলামোহনবাবু নিজে এসে বাবাকে সামান্য কয়েকটি শেয়ার বিক্রি করে যান, বাবা দরখাস্ত করেছিলেন বলে। বঙ্গদেশের, বিশেষত কলকাতার, তখন বেশ বাড়বাড়ন্তই ছিল বলা যায়। বিশ্বব্যাপী মন্দায় চায়ের বাজার খুব পড়ে গিয়েছিল, এসময়ে তারও আবার উন্নতি হল। ফলে ১৯৩৬ সালে চায়ের শেয়ার কিছু বিক্রি করে বাবা খুকির বিয়ের খরচের টাকা কিছুটা তুললেন। তবে বাঙালীরা নতুন উদ্যম দেখালেন দুই ক্ষেত্রে : ব্যাঙ্ক খুলে এবং তাতে আমানত যোগাড় করে এবং শহরের জমি সংগ্রহ করে, সমবায় ও ব্যক্তিগত ভিত্তিতে পাইকারিভাবে আবাস নির্মাণ করে। নলিনীরঞ্জন সরকার হলেন এই দুই বিষয়ে অগ্রণী, বস্তুতপক্ষে যাদুকর বলা যায়।

নলিনীবাবুর কথায় আমার 'হরিজন' পত্রিকার ফেরিওলার কথা মনে পড়ে

গেল। তখন ভ্রাতুস্পুত্রীস্থানীয়া একটি অল্পবয়স্ক মহিলাকে কেন্দ্র করে নলিনীবাবু সম্বন্ধে নানা গুজব এমন কি আদালতে মামলাও উঠেছে। সে সময়ে 'হরিজন' ভদ্রলোক 'কাকাবাবু' বা 'বড়কাকা' সম্বন্ধে মুখে মুখে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অনেক মুখরোচক ছড়া কাটতেন হাতের সংবাদপত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে। সে সময়ে বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলাও চলছে। 'হরিজন' ফেরিওলা ভাওয়ালের মেজরানী সম্বন্ধে যে ছড়াটি কাটতেন এখনও মনে আছে। কথিত ছিল ভাওয়াল সন্ন্যাসীর তথাকথিত মৃত্যুর পর মেজরানী প্রকাশ্যে বিধবার মতো আচরণ করতেন:

ভাওয়ালের মেজরানী
দিনে খান কাঁচকলা
রাত্তিরেতে পাঁঠার ঝোল।

নলিনীবাবুর নামের সূত্রে ১৯৪৮ সালে শ্রীকিরণশঙ্কর রায়মশাইয়ের মুখে শোনা একটি গল্প মনে পড়ে গেল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন। কিরণবাবু সাহিত্যিক হিসাবে তখন প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, অতএব তিনি শরৎবাবুর মরদেহের শ্মশানযাত্রী হয়ে কেওড়াতলা ঘাটে উপস্থিত হলেন। দাহ শেষ হলে উনি সোজা নলিনীবাবুর বাড়ি যান। নলিনীবাবু শোবার ঘরে বিছানায় চিৎ হয়ে বিষণ্নমনে শুয়ে আছেন। বড়কাকা সম্বন্ধে মামলা তখন চলছে, উপরন্তু শরৎবাবুর মৃত্যু। কিরণবাবু ঘরে ঢুকলে নলিনীবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে দাহকর্ম শেষ হয়েছে কিনা জিগ্যেস করলেন। কিরণবাবু বল্লেন, হাঁ। একটু চুপ করে বললেন, শ্মশানে জনা চল্লিশের বেশী লোক হয়নি। শুনে নলিনীবাবু বিছানায় আরেকটু নেতিয়ে পড়লেন। কিরণবাবু তখন বললেন, কিন্তু নলিনীবাবু, আপনি বা আমি যখন মরব তখন কেওড়াতলায় অন্তত হাজারখানেক লোকের ভীড় হবে। শুনে নলিনীবাবু যেন একটু উৎফুল্ল হলেন। মাথাটি বালিশের উপর তুলে বললেন, আপনি সত্যিই তাই মনে করেন! কিরণবাবু বললেন, নিশ্চয়, তার মধ্যে অবশ্য ন'শ' নব্বই জন থাকবে নিজের চোখে দেখতে, শালা সত্যিই মরেছে কিনা। নলিনীবাবু আবার বিছানায় ঢলে পড়লেন।

নলিনীবাবুর সঙ্গে এলেন কুমিল্লার বিখ্যাত দত্তবংশের শাখাপ্রশাখা। ১৯৩৬ সাল নাগাদ কলকাতার যে কোন দুটি বড় রাস্তার মোড়ে কোন না কোন বাঙালী ব্যাঙ্কের শাখা দেখতে পাওয়া যেত। তারও বড় কথা হচ্ছে, ইঙ্গবঙ্গ বা সাহেবী অফিসের বাঙালী সাহেবরা যাঁরা গ্রিণ্ডলে বা হংকং সাংহাই ব্যাঙ্কে টাকা জাতে ওঠার চিহ্ন বলে ভাবতেন তাঁরা ছাড়া, অধিকাংশ বাঙালীই বাঙালীর ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন বলা যায়। বিশের দশকে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির যেরকম খারাপ দশা

হয়েছিল, ত্রিশের দশকে নলিনীরঞ্জন সরকারের উদ্যোগে সেগুলির অবস্থা বেশ ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে দেশী জীবনবীমা এবং অন্যান্য ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিগুলি সুদ্ধ নলিনীবাবুর নেতৃত্বে ফেঁপে উঠল। বাঙালীর আত্মবিশ্বাস ও উদ্যম ফিরে এল। এল বেঙ্গল এনামেল, বেঙ্গল পটারি, বেঙ্গল ট্যানারি, বেঙ্গল স্টীম লণ্ড্রি, বেঙ্গল এই, বেঙ্গল ঐ, শতেক রকম প্রচেষ্টা। নানা প্রযুক্তি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ কলেজ ও কারিগরি শিক্ষানিকেতন ছাতার মতো গজিয়ে উঠল। তখনকার দিনে ভারতবর্ষের যে কোন শিল্পকেন্দ্রের এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে শতকরা অন্তত ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন হতেন হয় শিবপুর না হয় যাদবপুরের পাশ। এখন সে স্থলে হয়েছে যাদবপুর ও খড়গপুরের আই আই টি। তাছাড়া বিভিন্ন পেশায় বাঙালীরা অগ্রগণ্য ছিলেন বলা যায়, যেমন, ব্যারিস্টার, অন্য আইনজীবী, এটর্নি, নামকরা শল্যচিকিৎসক, চিকিৎসক, হাসপাতাল। তখনকার দিনে বড় ডাক্তারদের মধ্যে পশ্চিমভারতের ডাঃ জীবরাজ মেহতারই যা নাম শোনা যেত। তাছাড়া প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙালী, যেমন বিধানচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, ললিতমোহন বাঁড়ুজ্যে। গান্ধীজির অসুখ হলে বিধানবাবু যতক্ষণ গিয়ে না দেখতেন ততক্ষণ দেশবাসী আশ্বস্ত হতো না। সবচেয়ে কৌশলী কারখানা শ্রমিক বলতে বাঙালীদেরই বোঝাত; কোন কাজ বাঙালী কারিগর হাতে নিলে মালিক নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

এই সব জাগতিক, অর্থনৈতিক ও পেশাদারি উন্নতির ফলে যাবতীয় সৃষ্টি ও কলাশিল্পেও, এমন কি মনোরঞ্জন কলাশিল্পেও অদ্ভুতরকম এক উৎকর্ষের জোয়ার এল। আমার নিজের দৃঢ় প্রতীতি যে যদি কোন দেশ বা জাতির শিল্প, বাণিজ্য, অর্থোপার্জন ও ধনোৎপাদনের অবনতি হয়, তাহলে তাদের নগরসংস্কৃতির দ্রুত অবনতি অনিবার্য, এবং সেইসঙ্গে অনিবার্য হবে তাঁদের মৌলিক শিল্প সাহিত্য, এবং যাবতীয় কলা সৃষ্টি। স্বাস্থ্য নষ্ট হলে কিছু দিন পাউডার পমেটমের চাকচিক্যে চলে, যাকে ইংরেজিতে বলে কজমেটিক ডেকাডেণ্ট কালচার। সে-কালচারেরও কিছুদিন চটক থাকে যেমন ছিল চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে। কিন্তু জরা আক্রমণ করলে সে চটকও খসে খসে পড়ে, যেমন আজ পড়ছে, দৈন্য আর জরা কিছুতেই ঢাকা যাচ্ছে না। কিন্তু যা বলছিলুম: মঞ্চশিল্পে এল এক অপূর্ব জোয়ার। একটি সম্পূর্ণ নতুন মঞ্চশিল্প এল: নৃত্যনাট্য। একদিকে উদয়শঙ্কর, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ নাট্যমঞ্চে নতুন ধরনের নৃত্যের প্রবর্তন করলেন; এক সম্পূর্ণ নান্দনিক জগৎ এবং উপভোগের অভিজ্ঞতা বাঙালী পেল। অন্যদিকে আমাদের অতি বর্ণাঢ্য থিয়েটার-ঐতিহ্যকে নতুন ঐশ্বর্যমণ্ডিত করলেন শিশির ভাদুড়ী, প্রভা, কঙ্কাবতী প্রভৃতিরা। তবে সবচেয়ে গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করলেন বি-এন সরকার এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত

নিউ থিয়েটার্স। নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিও থেকে যেসব ফিল্ম্ সৃষ্টি হল সেগুলি হল অতি মার্জিত রুচির বাহক, চারুকলা জগতে এল ফিল্ম্ সম্বন্ধে নতুন নতুন সামাজিক বোধ। নিউ থিয়েটার্সের কল্যাণে সারা ভারতে বাঙালীর কদর বেড়ে গেল। নিউ থিয়েটার্স বাংলা মানস, সমাজ ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রতীক ও বাহক হয়ে উঠল, যে হিসাবে ফরাসী ফিল্ম্, ফরাসী সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতীক ছিল এবং এখনও আছে। সে-ধরনের বাঙালী সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে আধুনিক বাঙালী ডিরেক্টরদের ফিল্ম্গুলিকেও বলা যায় না, যদিও আধুনিক বাঙালী ডিরেক্টররা আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন। বলতে গেলে ভারতের ফিল্ম্ জগতে এখন দুধরনের মিশ্রণ-শিল্প তৈরি হচ্ছে। এক বম্বে-মাদ্রাজ মিশ্রণ, অন্যটি উত্তর-পথের-পাঁচালী মিশ্রণ। কিন্তু পথের পাঁচালী কালজয়ী ও দেশোত্তর হয়েছে, কেননা সেটি একটি বিশেষ দেশের, বিশেষ স্থানের, বিশেষ মুহূর্তের স্বরূপ নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। অন্য পুরস্কারজয়ী বাংলা ফিল্ম্গুলি ঠিক তা হয়নি। নতুন ফিল্মের সঙ্গে এল নতুন নতুন সিনেমা হল। প্রথমে এল চিত্রা, তারপর রূপবাণী, রবীন্দ্র-নাথের নামকরণে ধন্য। তাদের দেখাদেখি মেট্রোগোল্ডউইন মেয়ার তৈরি করল মেট্রো সিনেমা। মেট্রোর সঙ্গে এল নতুন ধারা! এল মেট্রো পাড়ের শাড়ি, মেট্রো প্যাটার্ন চুড়ি ইত্যাদি।

আরো একটি কথা ভুললে চলবে না। ত্রিশের দশকে যন্ত্রসঙ্গীত এবং কণ্ঠ-সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। যত বড় বাজিয়ে বা গাইয়েই হোন, কলকাতার বাইরে তাঁদের যত নামই হোক না কেন, তাঁদের মন তবুও ভরত না যতদিন না তাঁরা কলকাতায় এসে অকুণ্ঠ বাহবা পেতেন। ধ্রুপদী বা দেশী, প্রাচীন বা আধুনিক রবীন্দ্রসঙ্গীত অথবা আধুনিক সব কিছুতেই কলকাতার বাহবা পাওয়া নিতান্ত কাম্য ছিল। এখনও কলকাতার সে সুনাম আছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ উঠে পড়ে লেগেছেন সে সুনাম নষ্ট করতে। মধ্যপ্রদেশ দ্রুতপদে ভূপালকে কলকাতা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীপদে প্রতিষ্ঠিত করার আশায় বদ্ধপরিকর হয়েছে। অন্যদিকে মনে করুন আমাদের সরকার ১৯৮৬ সালে কোটি কোটি টাকা খরচা করে 'হোপ' নামক 'মোচ্ছব'টির অবতারণা করলেন। এই উৎসবে যে রুচি ও উল্লাস প্রকাশ পেল ত্রিশ দশকে তা কল্পনাতীত ছিল। রুচির বিকৃতি কি রকম দ্রুত ঘটেছে ও ঘটছে দেখুন। আমি যে পাড়ায় থাকি সেখানকার পোস্টাফিসে যিনি কেরানী ছিলেন তিনি 'হোপ' রাত্রির জন্যে পাঁচটি টিকিটের পিছনে পনেরো শ' টাকা খরচ করলেন। অথচ আগে ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, বড়ে গোলাম আলি বা নিখিল বাঁড়ুজ্যের জন্যে লোক সারারাত ফুটপাতে

দাঁড়িয়ে থাকত। আজকাল কিন্তু ভারতীয় ওস্তাদদের গান হয় কলাকেন্দ্রে অথবা বিড়লা সভাঘরে, যেখানে বাইরে দাঁড়িয়ে গান শোনার স্থানও অতি কম। ১৯৩৩ সালের ৪ঠা মার্চ প্রেসিডেন্ট রুজেভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্টপদ গ্রহণের বক্তৃতায় বলেছিলেন 'আমাদের যদি কিছু ভয় করতে হয়, তবে সেটি হচ্ছে ভয়।' ত্রিশ দশকে বাঙালীরা এ উক্তিটির মর্ম বেশ বুঝত ও সেইমত কাজ করত মনে হয়।

সাহিত্যেও নতুন জোয়ার এল, আনলেন পূর্ববঙ্গ থেকে একদল অল্পবয়স্ক সম্পূর্ণ নতুন লেখক। অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া। তাঁদের লেখায় এল এক নতুন ধরনের জীবনধর্ম, তার সঙ্গে জাহির করারও একটু রেশ আছে: এলিয়ট-বর্ণিত মুখে ব্রণওলা যুবকের মতো, চোখে প্যাঁটপেঁটে চাউনি। ব্রণগুলি এসেছিল তদানীন্তন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান লেখকদের প্রসাদে। যথা, সেল্‌মা লাগেরলফ, য়োহান বোইয়ার, কৃনুট হামসুন। মনে আছে বুদ্ধদেব বসু তাঁর লেখায় জানিয়ে দিলেন তিনি টমাস ব্রাউনের 'আর্ন বেরিয়াল', আইজাক ওয়ালটনের 'কম্প্লীট অ্যাঙ্‌লার', রবার্ট বার্টনের 'অ্যানাটমি অভ মেলাংকলি' পড়েছেন। কিন্তু সে-সব বই ত প্রেসিডেন্সী কলেজের বি. এ. অনার্সের ছাত্ররাও পড়েছে, সুতরাং এমন কি নতুনত্ব আছে? তবুও ছিল নতুন সুর, নতুন শক্তি। কলকাতার লেখকরা ঈর্ষিত হয়ে নাক উঁচু করে বলতেন ওটি ঢাকায় জন্মানর গুণ, বাঙ্গাল রক্ত। সোজাসুজি বাঙ্গাল বা পাড়াগেঁয়ে না বলে ঘুরিয়ে বলা যে তাঁদের লেখায় বনেদিয়ানার অভাব আছে। তা সত্ত্বেও নতুন লেখকরা যে সম্পূর্ণ টাটকা হাওয়া আনলেন, বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিদ্রোহ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, এমন কি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। কলকাতার লেখকরা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' পড়ে আমার যে কি রকম উত্তেজনা হয়েছিল আমার এখনও মনে আছে। সেইসঙ্গে অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রও আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন। তাঁর ভাষায় কাব্যপণা ছিল না, বরং আটপৌরে ভাষা ও নিত্য-নৈমিত্তিক ছবির ছিল প্রাচুর্য। 'যেদিন ফুটল কমল' অথবা কাকজ্যোৎস্না ধরনের বই অবশ্য ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় বা অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখার মতো শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'পদ্মানদীর মাঝি' যেন বিরাট ঝঞ্ঝাবাত্যার মতো আমাদের অনেক কিছু ভেঙে, গুঁড়িয়ে উড়িয়ে দিয়ে গেল। বাংলার সাহিত্যের পক্ষে আগেকার যুগের ফিরে যাবার পথ বন্ধ হল।

১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশিত হল। কাব্য জগতে যেন দমকা হাওয়া এসে অনেকগুলি জানলা খুলে দিল, নতুন জগৎ এল,

যার পরিচয় শুধু ইংরেজি কাব্যেই আগে পেয়েছি। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যার প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় বের হল সমর সেনের কবিতা। আমার মাথা ঘুরে গেল। শুনলুম তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ছাত্র, আমারই ক্লাসের ইংরেজি অনার্স পড়ছেন। নিজের কাছে স্বীকার করতেই হল যে সমর সেন আমার চেয়ে অনেক মেধাবী। ফলে, সমর যখন বি.-এ তে প্রথম হল তখন সে স্বীকারোক্তিটি আমার মেনে নিতে বাধল না, যদিও রচনার পেপারে আমি সব থেকে বেশী মার্ক পেয়ে সোনার মেডাল পাওয়াতে আমার ভালই লেগেছিল। 'পরিচয়' পত্রিকা তার আগে থেকেই বের হতে শুরু করেছে এবং বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। নতুন ঢেউ সম্বন্ধে গর্বিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। সকলেরই প্রত্যাশা হঠাৎ বেড়ে গেল। নিজের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, দুটি জিনিস ঘটল। এক কম্যুনিজম বিষয়ে ও কম্যুনিস্ট সাহিত্য পড়ার সুযোগ প্রশস্ত হল। দুই, নতুন বাংলা সাহিত্য নিয়ে রাস্তায়, ঘাটে, চায়ের দোকানে আলোচনার আনন্দের আস্বাদ পেলুম। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে আমার আণ্ডারগ্রাজুয়েট জীবন এক নতুন প্রাণোচ্ছলতায় এসে মিশল। ইতিমধ্যে কিছু বিদ্যার্জন করেছি, সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান-ধারণাও কিছু বেড়েছে। সেই সঙ্গে, আগেই যা বলেছি, টীন্‌স্ জীবন শেষ করে বিশ বছরে পড়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬-৩৮

রাঙামামার বড় ছেলে তুতে, ভাল নাম সৌরীন, আমার থেকে ছিল বছর তিনেক ছোট। বড় হয়ে টিটাগড় পেপার মিলে খুব উঁচু কাজ করে, ফলে বহুবছর ধরে কারখানার শ্রমিকরা তাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করত। দেখতেও ছিল সুপুরুষ। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর বিষ্ণু ঘোষ তাকে নিজের আখড়ায় ছেলেবয়স থেকে ব্যায়াম শিখিয়ে, তুতের ষোল বছর বয়সে তাকে 'মিঃ বেঙ্গল' খেতাব পাইয়ে দেন। ১৯৩২ সালে কলকাতায় এসে আমার যদিও ম্যালেরিয়া সেরে গেল, তবুও অন্যান্য অসুখ রয়ে গেল। উপরন্তু ১৯৩৪ সালে হল গোদের উপর বিষফোড়া: হল হার্টের ভাল্‌ভ ব্লক। ১৯৩৬ সালে আমার বি-এ পরীক্ষার অল্পদিন পরে তুতে আমাকে বিষ্ণু ঘোষের আখড়ায় নিয়ে গেল। তিনি আমাকে ভর্তি করে নিলেন। মাস দুয়েকের

মধ্যে আমার শরীরের গড়ন ফিরে গেল নিয়মিত ব্যায়ামের সঙ্গে রোজ সকালে কল বের হওয়া ভিজানো ছোলা আর বাদামবাটা খেয়ে গায়ে শক্তিও হল।

মা ঠিক করলেন আমার হাওয়া বদল প্রয়োজন। মধ্যপ্রদেশে গণ্ডিয়া থানায় আমার সেজ মাসীমা, যাঁকে সেজকী বলতুম, তিনি থাকতেন। সেজকী আর মেসোমশাইয়ের যত্নে চার সপ্তাহের মধ্যে আমার অনেক পাউণ্ড ওজন বেড়ে গেল। ছুটিতে পড়ার জন্যে কিছু বইও নিয়ে গেছলুম। গণ্ডিয়ায় আমাদের বাড়ির সমুখ দিয়ে উদ্ভিন্নযৌবনা গন্দ্ মেয়েরা মাথায় মোট নিয়ে যখন আনাগোনা করত, তখন তাদের দেহের গড়ন, বিশেষত বুকের, পেটের ও গুরু নিতম্বের ভঙ্গী ও চলন, হাতের বুড়ো আঙুলের মতো ঈষৎ ভিতর দিকে বাঁকা শিরদাঁড়ার বঙ্কিম রেখা, উরু ও পায়ের ডিমের গোল সুঠাম আকার—সব কিছু মিলিয়ে মনে হতো ভারতীয় ভাস্কররা নারীদেহ ও রূপের আদর্শ মাপজোপ নিশ্চয় এদের সমুখে রেখে নির্ণয় করেছিলেন। তাদের দেহে যেমন ছিল ধরাছোঁয়ার অতীত পবিত্র ও নিষ্পাপ ভাব, তেমনি ছিল মাটির দুর্মর কামনা ও আকর্ষণ। অনেক বাঙালী মেয়ের সৌন্দর্যও অতুলনীয় মনে হয়েছে, কিন্তু এরকম দেহরেখা, স্বাস্থ্য, লাবণ্য, এবং সরল খোলাখুলিভাব বাঙালী মেয়েদের মধ্যে তেমন দেখিনি। পঞ্চাশ বছর আগেও বাঙালী মেয়েদের কেমন যেন একটু মর্মরময়ী, দেবীভাব থাকত, ধরাছোঁয়ার বাইরে, ভয় হতো তাদের দিকে একপলকের বেশী তাকালে বোধ হয় ভস্ম করে দেবে। ষাটের দশক থেকে অবশ্য বাঙালী মেয়েদের হাবভাব একটু সহজ ও মাটিতে গড়া বলে মনে হয়। তা সত্ত্বেও আজও রাস্তায় কোন বাঙালী মেয়ের দিকে হাসিমুখে তাকালে তাকে কদাচিৎ পাল্টা হাসতে দেখেছি, এমন কি তার হাত থেকে যদি অসাবধানে ছাতা বা বই পড়ে গিয়ে থাকে তা হলেও। ভুরু কুঁচকে যাবেই ; আপনার ভয় হবে এই বুঝি চক্ষুর ধর্ষণ থেকে উদ্ধারের জন্য এখনই চীৎকার করে লোক জড়ো করবে। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে একমাত্র নেপালী ও সাঁওতাল বা ওরাওঁ মেয়ের কথা বলতে পারি যাঁরা, আপনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে হাসলে, পাল্টা মিষ্টি হাসি হাসবেন।

গণ্ডিয়া থাকতে আমি তিনটি ছেলের সঙ্গে একটি টি-মড্‌ল্ ফোর্ড গাড়িতে একবার নাগপুর গেলুম। চার বন্ধুতে মিলে পিছনের সীটে বসে গল্প করতে করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে মনে হল গাড়ি যেন বড় আস্তে আস্তে যাচ্ছে। ড্রাইভারকে বলাতে হঠাৎ গাড়ি ঝন ঝন করে এমন বিকট শব্দ শুরু করল, আমরা ভাবলুম না জানি কত বেগেই না ছুটেছে। ভিতরে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আমরা গল্প করছিলুম, বাইরে চোখ ফিরিয়ে দেখি একটি লোক বেশ ধীরে সাইকেল চালিয়ে

আমাদের গাড়ি পেরিয়ে এগিয়ে গেল। পরবর্তী জীবনে যখনই কোন মন্ত্রীসভা ক্ষমতাগ্রহণের পর তাঁদের নতুন যুগান্তকারী কর্মসূচী ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করেছেন আমার তখনই সেই টি-মড্‌ল্‌ ফোর্ডে চড়ে ঘোরার কথা মনে পড়ে যায়।

আমার ছোট দিদি, খুকির বিয়ে ঠিক হওয়ায় আমি গণ্ডিয়া থেকে ফিরে এলুম। হঠাৎ একদিন রবিবার সকালে সদর দরজায় টোকা শুনে দরজা খুলে দেখি অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। বললেন, বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমার ত হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাবার দাখিল। প্রফুল্লবাবু বাবাকে বললেন, আমি নাকি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি, তবে দ্বিতীয় (আবার !!) হয়েছি, দুজন মাত্র ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। স্নিগ্ধ গলায় বললেন তিনি আশা করেছিলেন আমি প্রথম হব, তবে আমি রচনা পেপারে সোনার মেডাল পাব। এর পর তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে উঠতে বললেন, তিনি আমাকে প্রিন্সিপাল রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের কাছে নিয়ে যাবেন। আমার ত স্বশরীরে স্বর্গলাভের অবস্থা!

অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের বাড়ি ছিল ৬০বি হরিশ মুখুজ্যে রোডে। গিয়ে দেখি প্রিন্সিপাল ঘোষ তাঁর হেলান-দেয়া আরামকেদারায় আধশোয়া অবস্থায় পড়ছেন। তখনকার দিনে সে ধরনের চেয়ার প্রায় বাড়িতেই থাকত। আমাদের বাড়িতেও বাবার ছিল। চেয়ারের দুহাত বরাবর চ্যাপ্টা লম্বা হাতল দুটি আলাদা অংশে ভাঁজ করে ঢোকানো থাকত, নিচের হাতলটি সোজা করে তার উপর দুই পা তুলে ছড়িয়ে শুতে হতো। ডাকবাংলাগুলিতেও থাকত। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ আর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বিপরীত স্বভাবের ব্যক্তি বলে মনে হল। রবীন্দ্রনারায়ণের ছিল খুব নরম চাউনি, নরম ঝোলা গোঁফ, আর ভারি নরম শান্ত গলা ও ব্যবহার। অন্যদিকে প্রফুল্লচন্দ্রকে বাঘ বললেই ভাল হতো। দুই বন্ধুর নমস্কার সম্ভাষণ শেষ হলে প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনারায়ণকে বললেন, 'অশোককে এনেছি, আমার ছাত্র।' আমি নিচু হয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করে তাঁর ইঙ্গিতমত আরামকেদারার বাঁ পাশে তক্তপোষে বসলুম। এই তক্তপোষে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রাত্রে শুতেন। স্ত্রী অনেকদিন পূর্বে মারা গেছেন। তক্তপোষের উপর চতুর্দিকে ছড়িয়ে রাখা বই দেখে আমি অবাক। এলিয়টের 'সিলেক্টেড এসেজ', পাউণ্ডের 'ক্যাণ্টোজ', উইলসন নাইটের 'দি হুইল অভ ফায়ার', ক্রাইটেরিয়ন ও স্ক্রুটিনি পত্রিকার নানা সংখ্যা ইত্যাদি। আমি তখন অবাক হয়ে ভাবছি, একজন প্রোফেসর, বিশেষ করে, প্রিন্সিপালের এসব বই পড়ার সময় হয়? ইচ্ছা হয়? আমার কলেজের প্রফেসররা অন্তত এসব বই দেখলে নাক সেঁটকাবেন। আমি অন্তত প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে এলিয়টের লেখা হ্যামলেট প্রবন্ধের কথা কোনদিন বলতে সাহস করিনি, যদিও তার কাছে

হ্যামলেট পড়তে পারা এখনও আমি অপার সৌভাগ্য বলে মনে করি। আবার দেখি তাঁর বিছানায় 'পরিচয়' আর 'কবিতা'র সংখ্যাও কিছু কিছু রয়েছে। তখনই মনে মনে স্থির করলুম, ইনিই হলেন এখন থেকে আমার নতুন গুরু।

সেদিন থেকে আমার তিন বছর ব্যাপী নতুন শিষ্যত্ব শুরু হল। শেষ হল ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অক্সফোর্ডে যাবার মুখে হাওড়া স্টেশনে বম্বের ট্রেনেতে চড়ার দিন। এমন রবিবার খুব কমই গেছে—এমন কি মার বেশী রকম অসুখের সময়েও—যখন আমি গ্রোভ লেন থেকে হেঁটে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের বাড়ি গিয়ে তাঁর কাছে দুতিন ঘণ্টা অন্তত কাটাইনি। তাতেই শেষ নয়। তিনি আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পড়ালেন মেটাফিজিক্যাল কবিদের কাব্য, কিছু কন্‌গ্রীভ, রোমান্টিক কবিদের বিশেষত কীট্‌স্, শেলী এবং কোলরিজ। তাঁর কাছে এপিসাইকিডিয়ন এবং অ্যাডোনেস পড়া আমার চিরকাল মনে থাকবে। রবিবার সকালে প্রায়ই লোকজন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত বলে তিনি ঠিক করলেন, আমাকে সন্ধ্যাবেলায় পড়াবেন। সাধারণত সন্ধ্যা সাতটায় পড়াতে শুরু করতেন, ন'টার আগে শেষ হতো না, একেক দিন দশটা হয়ে যেত। পড়া শুরু হল ১৯৩৬-এর নভেম্বরে, একনাগাড়ে ষোল মাস চলল। তার মধ্যে তিদি গল্পচ্ছলে পড়ালেন গ্রীক ট্র্যাজেডি, প্লেটোর ফিডিয়াস ও অ্যারিস্টট্‌ল্, ওভিডের মেটামরফোসিস, ভার্জিল, সেনেকা, দান্তে, ত্রুবাদুর কবিদের। এর উপর ছিল বাইব্‌ল্ পড়া। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন ১৯৭৪ সালে পড়াতে শুরু করি তখন সংকল্প করি আমার গুরুদের মতো আমিও আমার ছাত্রদের পিছনে অকাতরে সময় দেব। আমরা ছাত্রছাত্রীরা সকলেই খুব ভাল ছিল, পড়াতুম এম-ফিল, পরিচালনা করতুম পি-এইচ-ডি গবেষণা। ছাত্রছাত্রীরা অনেক পড়ত, অনেক বিষয়ে আমাকে তারা ছাড়িয়ে যেত, পড়াতে ভালও লাগত। কিন্তু আমার গুরুরা আমার মন যতদিকে খুলে দিয়েছিলেন, আমি ডেমোগ্রাফি পড়াতে গিয়ে ততখানি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব বা স্ট্যাটিস্টিক্সে অতোখানি উৎসাহ দেবার চেষ্টা করিনি। এখন ভাবি, আমার গুরুরা আমার জন্যে যত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সে আমার অসাধ্য জেনেই আমি বোধহয় শিক্ষকতা করার দুঃসাহস ছেড়ে চাকরির পিছনে ছুটেছিলুম।

বি-এ ফলাফলের পর আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস শুরু করলুম। ক্লাস শুরু হবার আগে একদিন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের বাড়ি গেছি; 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বই সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে, এমন সময়ে জিগ্যেস করলেন, বিষ্ণু দে'র সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে কিনা। হয়নি বলাতে তিনি পরের

রবিবার সকালে আসতে বললেন। বিষ্ণু দে রিপন কলেজে পড়াতেন, সেখানে রবীন্দ্রানরায়ণ প্রিন্সিপাল ছিলেন। পরের রবিবার হরিশ মুখুজ্যে রোডে ঠিক সময়ে গেছি। অল্পক্ষণ পরেই লম্বা, শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে চেহারার এক ভদ্রলোক এলেন। চেহারা দেখলেই নজরে পড়ে। পরণে কালো নরুনপাড় কাঁচি ধুতি। আজকাল খুব কম হয়। বছর কুড়ি আগে পর্যন্ত বর্ধমান জেলার দেবীপুর গ্রামে তৈরি হতো, পাতলা রুমালি রুটির মত খাপি সাদা খোল, দেখলেই বোঝা যায় উৎকৃষ্ট বুনন অথচ চোখধাঁধানো নয়, আজকাল চওড়া চওড়া মুগা বা মুগারঙের রেয়নের ধাক্কা পাড় ধুতির মতো এত খেলো নয়। কাঁচি ধুতির উপর সাদা ধবধবে পুরু কেম্ব্রিকের তৈরি পাঞ্জাবি। মুখ একটু লম্বাটে, বিষ্ণুবাবুর নিজের ভাষায় 'ডিমের মতো'। মুখের আদল প্রায় মেয়েলি, তার মধ্যে বিরাট, টানা দুটি চোখে পরিষ্কার, কালো, জলজলে কথা বলা চাউনি। খাঁড়ার মতো বাঁকানো নাক। সুগঠিত পূর্ণ অধর, তার তলায় সুঠাম, ঈষৎ-চাপা চিবুক। মাথায় ঘন লম্বা চুল, চিরুনী বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার করে পিছনের দিকে টেনে আঁচড়ানো, সমুখে সিঁথির সামান্য ইঙ্গিতমাত্র আছে। দেখেই মনে হয় মার্জিতরুচি, তবে সরল খোলামেলা স্বভাব হয়ত নয়। সুন্দর, পরিপাটি পোশাক, তবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানর বিপরীত। বহু বছর পরে অ্যালিস্টেয়ার কুকের লেখা বার্ট্রাণ্ড রাসেল বিষয়ে প্রবন্ধটি পড়ি। কুক লিখছেন, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নীল রক্ত ছিল বেশ বোঝা যায়, যখন অ্যান্টনি ইডেন সম্বন্ধে তাঁর কিরকম ধারণা জিগ্যেস করায় তিনি বললেন 'বড় বেশী সাজগোজ করে, ভদ্রলোক নয়'। পড়ে আমার বিষ্ণুবাবুর কথা মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক মনে হয়ে, ভাল লেগেছিল। বিষ্ণু দে-ও তাঁর গলায় আন্তরিকতা ঢেলে আমাকে তাঁর ১৯নং প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতে যেতে বল্লেন। তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে আমারও খুব ভাল লাগল। বিষ্ণু দে'র কবিতা তখন নিয়মিত 'পরিচয়' ও 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, ওঁর কবিতাও আমার অত্যন্ত ভাল লাগত, এখনও লাগে। অন্যপক্ষে, যেহেতু আমি ইংরেজি অনার্সে ভাল করেছি এবং রবীন্দ্রনারায়ণ তাঁকে ডেকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, সেহেতু বিষ্ণুবাবুর বোধ হয় আমার বিষয়ে কিছু আগ্রহ হল।

বিষ্ণু দে ও তাঁর স্ত্রী প্রণতি কমবয়সী লোকদের সঙ্গে আলাপ করে খুব তাড়াতাড়ি তাদের নিজেদের সংসারে আপন করে নিতে পারতেন। তাদের অনেক অত্যাচারও সহ্য করতেন। ইতিমধ্যে সমরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। সমরের সঙ্গে বিষ্ণুবাবুর বোধ হয় তার আগে বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে আলাপ হয়। সমর আর আমাকে বিষ্ণুবাবু চঞ্চল চাটুজ্যের সঙ্গে আলাপ করিয়ে

দেন। চঞ্চল ছিল একাধারে কবি, সুপণ্ডিত, সুপুরুষ, এবং শেয়ার-বাজারের লোক। জানাশোনা বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র তারই একটি মোটরকার ছিল। নিজে চালাত। বিষ্ণুবাবুর বাড়ির প্রায় সংলগ্ন ১২নং মহীশূর রোডে একান্নবর্তী পরিবারে থাকত। অল্পদিনের মধ্যে লোকে চঞ্চল, সমর আর আমাকে বৈষ্ণব, অর্থাৎ বিষ্ণুর ভক্ত, বলতে শুরু করল। কথাটিতে সমরের আপত্তি ছিল কিনা কোনদিন বলেনি, তবে চঞ্চল বা আমার ছিল না। আলাপ হতে না হতেই বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ওরফে বটুকদার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন। বটুকদার সঙ্গে চঞ্চলের আগে থেকে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত নিয়ে আলাপ ছিল। আমার মতে বটুকদার ছিল সত্যিকারের প্রতিভা, যদি প্রতিভার অনেক গুণের মধ্যে একটি গুণের বেশ আধিক্য থাকে, যাকে বলে উৎকেন্দ্রিকতা, আর কোন কিছু আরাধ্য হলে সব পণ করে তার পিছনে ছোটা। এই দুটি গুণ থাকার জন্য জীবনে জাগতিক হিসাবে তিনি সফল হননি, কমল মজুমদারের মতো। বটুকদার মতো প্রতিভাবান আর আপনভোলা ব্রতীলোক সহজে মেলে না। এঁরা সকলেই কবিতা লিখতেন, আমার তকমা ছিল সমঝদারের। কিছু পরে কামাক্ষীপ্রসাদ চাটুজ্যে ও সুভাষ মুখুজ্যে দলে যোগ হল। সুভাষ ছিল বয়সে সবথেকে ছোট। সমর কামাক্ষীর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে সুভাষকে বলেছিল, 'তুমি দেখছি আমাদের ভাত মারবে।' আমি তার সম্বন্ধে বলতুম 'বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়'। চঞ্চল আর আমাকে সঙ্গে করে বিষ্ণুবাবু একদিন যামিনী রায়ের বাড়িতে —বাগবাজারের আনন্দ চাটুজ্যে লেনে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন। সেই সময়ে আমি নিজে থেকে ডাকে 'পরিচয়' সম্পাদককে আমার অনূদিত ডি-এইচ-লরেন্সের 'শ্যাডো ইন্ দা রোজ গার্ডেন্' গল্পটি 'গোলাপবাগানে ছায়া' নাম দিয়ে পাঠিয়েছিলুম। অনুবাদটি 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর একদিন বিষ্ণুবাবু বললেন সুধীনবাবু আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, শুনেছেন আমি ইংরেজি অনার্সে ভাল করেছি এবং আমার অনুবাদও ভাল লেগেছে। এইখানে পাঠককে বলে রাখি, তখনকার দিনে ইংরেজি অনার্সে ফার্স্টক্লাস পেলে, বাংলা লেখার জন্যেও সাহিত্যিক মহলে খাতির পাওয়া যেত। 'পরিচয়' পত্রিকার সাপ্তাহিক আড্ডা তখনকার কালে বেশীর ভাগ সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের পৈতৃক বাড়িতে হতো। রাস্তার উপর বারান্দার নিচু পাঁচিলের উপর ইঁট ও চূণ সুরকির তৈরি, রঙীন 'স্টাকো'য়, সেপাই বরকন্দাজ গড়া ছিল, লোকে বলত পুতুল বাড়ি। পাড়ার নাম ছিল হাতীবাগান। সুধীন্দ্রনাথরা ছিলেন হাতীবাগান দত্তদের সরিক, পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ, আইনজ্ঞ, দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিষ্ণুবাবু আমাকে একদিন সেখানে নিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের প্রিয় শিষ্য বলে আলাপ করিয়ে দিলেন। এর পর তাহলে বলতে গেলে তিনটি আড্ডার স্থান হল। প্রধান আড্ডা হল, বলা বাহুল্য, গোলাম মহম্মদ রোডে বিষ্ণু দের বাড়িতে, দ্বিতীয় হল ২০২ রাসবিহারী এভেনিউতে বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে, এবং তৃতীয় হল কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে পরিচয়ের বৈঠকে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'পরিচয়' আড্ডা আমার কাছে এখনও লিবরল ও হিউম্যানিস্ট আদর্শের উৎকৃষ্ট প্রতীক বলে মনে হয়। বিশেষত ১৯৬৭ সালের পর কলকাতার আড্ডার অস্তিত্ব যখন প্রায় আর অবশিষ্ট নেই বললেই হয়। সম্পাদক হিসাবে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু, পত্রিকার লেখক বা অতিথিদের উপর তাঁর নিজের মতবাদ কোনভাবেই কখনও চাপাবার চেষ্টা করেননি বলা যায়। অন্তত ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত যখনই তাঁর পত্রিকার আড্ডায় বা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি। অবশ্য ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত খুব কমবারই গেছি; তখন আমি প্রায় সবসময়ে কলকাতার বাইরে থাকতুম। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মনে হতো সম্পাদক হিসাবে তিনি যেন বিশেষ চেষ্টা করতেন যাতে তাঁর পত্রিকায় শতেক ফুল ফুটে উঠুক, শতেক তর্ক জমে উঠুক। প্রতিদানে এইটুকু তিনি প্রত্যাশা করতেন, তর্কে কেউ রেগেমেগে ব্যক্তিগত গালাগাল বা অভদ্র ব্যবহারের পর্যায়ে না পড়ে। শাণিত কৌতুকভরা মজার আলাপ এবং ভাষায় কিছুটা সাহিত্যিক প্রসাদ তিনি আশা করতেন। এইটুকু ছাড়া সকল তর্ক সম্পূর্ণ লাগামহীন হোক, হাতের আস্তিন গুটিয়ে বিতর্ক হোক এই যেন ছিল ত্রিশ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে আলাপের মান। যে কেউ তাঁর পূর্বের মত বদলাতে পারেন, প্রয়োজনে অন্য দলে ভিড়তে পারেন। এ গুণ যে শুধু 'পরিচয়'-এর আড্ডাতেই ছিল তা নয়, বুদ্ধদেববাবুর আড্ডাতেও সমানভাবে ছিল। তাঁর বাড়ির আড্ডাতেও মতবাদ নির্বিশেষে সকলের, বিশেষ করে নতুন ব্যক্তির পদার্পণ ও লেখা সমানভাবে ও সমান আগ্রহে নিমন্ত্রিত হতো। তার উপরে বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতে ছিল তাঁর স্ত্রী প্রতিভাদেবীর অতি সুন্দর ব্যবহার ও আলাপ, যার জুড়ি তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের সুধীনবাবুর বাড়িতে ছিল না, যতদিন না তিনি রাসেল স্ট্রীটের বাড়িতে উঠে এলেন এবং রাজেশ্বরী দেবী গৃহকর্ত্রী হলেন। বুদ্ধদেববাবুর সম্বন্ধে আমি একটি কথা বললেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার হবে। সমর সেনের কবিতায় রাজনৈতিক মতামতের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর আত্মিক সহানুভূতি থাকা সম্ভব ছিল না। অথচ সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা'র যে সমালোচনা তিনি 'কবিতা' পত্রিকায় লেখেন তার মতো অকৃত্রিম ও মরমী প্রশংসা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন। এ ছাড়াও বুদ্ধদেববাবুর একটি

মহৎ গুণ ছিল যা সাহিত্যিক, লেখক বা মনীষীমহলে, এমন কি বাঙালীসমাজেই বিরল। কেউ যদি কারোর নামে নিন্দা বা ঠেস দিয়ে কথা বলতেন বুদ্ধদেববাবু অত্যন্ত কুণ্ঠিত হতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহও যেন সঙ্কোচে কুঁকড়িয়ে যেত; যার নামে নিন্দা হচ্ছে তিনি যদি বুদ্ধদেববাবুর নামে নিন্দা করে থাকেন, তা হলেও। সে-কথা বিষ্ণু দে বা তাঁর বাড়ির আড্ডা সম্বন্ধে ঠিক বলা যেত না। বিষ্ণু দের আড্ডায় বন্ধুদের প্রতি স্নেহ প্রকাশের সঙ্গে থাকত অম্লমধুর বিদ্রূপ, প্রতিপক্ষের প্রতি শ্লেষ; যার প্রভাবে কমবয়সী ধীমান যুবকদের মুখেচোখে খুব দ্রুত কথা ফুটত। ফলে বিষ্ণুবাবুর আড্ডায় মানুষ হলে একটু পাকামি এবং উপরচালাকি আসার সম্ভাবনা ছিল। যাদের এই ধরনের স্বভাব হতো, তারা আবার পরে বিষ্ণু দে-র কাছেই ধাক্কা খেয়ে অনেক সময়ে সময় থাকতে শুধরে যেতেন। বৃহত্তর বিশ্বে প্রবেশের সহায়ক হিসাবে, আমি এই তিনটি আড্ডা থেকে প্রভূত শিক্ষা ও মনের খোরাক পেয়েছি।

'পরিচয়'-এর আড্ডায় যাঁরা নিয়মিত আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক শাহেদ সুরাবর্দী, সুশোভনচন্দ্র সরকার, হিরণ কুমার সান্যাল, ভূতত্ত্ববিদ ও খনিজ পণ্ডিত শ্যামলকৃষ্ণ (স্যাণ্ডো) ঘোষ, অপূর্বকুমার চন্দ, হীরেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে, সুমন্ত্রচন্দ্র মহলানবিশ, বিষ্ণু দে এবং দুর্ধর্ষ দার্শনিক বসন্তকুমার মল্লিক (ইনি অক্সফোর্ডে পড়াতেন, ছুটি হলে কলকাতায় আসতেন)। অন্তত আমি, যে বেশ কিছুদিন অন্তর অন্তর যেতুম, এঁদেরই প্রায় দেখেছি। যে-কোন বিতর্ক নিষ্পত্তির জন্য আপীল হতো শাহেদ সুরাবর্দীর কাছে। তাঁর রায়ই হতো শেষ কথা। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে আমি ইংল্যাণ্ডে রওনা হবার আগে তিনি আমাকে সে-দেশ সম্বন্ধে কথা বলার সময়ে একটি গল্প বলেন, যা আমার এখনও মনে আছে। বললেন, অক্সফোর্ডে লোকের কাপড় জামা দেখে তার সামাজিক স্থান ঠিক কী, মনে মনে আন্দাজ করলে অনেক সময়ে ভুল হবে। আসলে, ইংল্যাণ্ডে জামাকাপড়ের থেকে লোকের কথার টান এবং বলার ভাষা ও ভঙ্গী থেকেই, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে অ্যাক্সেণ্ট বলে, তার সামাজিক অবস্থা বোঝা সহজ। বললেন, অক্সফোর্ডে ঢোকার পর যখন প্রথম গ্রীষ্মের ছুটি হবে তখন তিনি তাঁর প্রোফেসরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ভদ্রলোক সব সময়েই পুরনো, কিছুটা জীর্ণ, হ্যারিস টুইডের কোট আর পুরনো ঢোলা প্যাণ্ট পরে থাকতেন। ছুটির শেষে প্যারিস থেকে লণ্ডনে এসে শাহেদ কয়েকদিন থাকবেন শুনে প্রোফেসর তাঁর বাড়িতে একদিন দুপুরে খেতে বললেন। দিন তারিখ ঠিক করে শাহেদকে লণ্ডনের পার্ক লেনের একটি ঠিকানা দিলেন। শাহেদ বললেন নির্দিষ্ট দিনে তিনি হৃষ্টচিত্তে

প্রোফেসরের ঠিকানায় এসে দরজায় বোতাম টিপলেন : ধরেই নিয়েছেন যে বাড়িতে অন্যান্য ভাড়াটে থাকে, প্রোফেসরের ফ্ল্যাটের পরিচারিকা দরজা খুলে তাঁকে প্রোফেসরের ঘরে নিয়ে যাবে। আশ্চর্য হয়ে গেলেন যখন একজন রীতিমত উর্দিপরা, কনুই পর্যন্ত সাদা দস্তানা লাগানো, ফুটম্যান (আমাদের আগেকার কালের আবদার বলা যায়) দরজা খুলে কী নাম বলবে তাই জিগ্যেস করল। এ ধরনের ব্যবস্থা সত্যিকারের ধনী লোকের বাড়িতেই থাকত। শাহেদ থতমত খেয়ে নিজের নাম নিচু গলায় বললেন। ফুটম্যান ঝুঁকে 'বাউ' করে দরজা খুলে শাহেদকে ভিতরের ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করে চেঁচিয়ে বলল, 'মিস্টার সোডা-ওয়াটারী'! প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ফের আরেকটি দরজা খুলে গেল এবং শাহেদ ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন একই ধরনের পোশাকপরা ফুটম্যান আবার সেইরকম 'বাউ' করে চেঁচিয়ে উঠল, 'মিস্টার সোডাওয়াটারী', আবার দ্বিতীয় ঘরের ভিতরের আরেকটি দরজা খুলে গেল এবং তৃতীয় ফুটম্যান 'বাউ' করে তৃতীয় দরজা খুলে বলল, 'মিঃ সোডাওয়াটারী'! তৃতীয় ঘরে ঢুকে শাহেদ হঠাৎ বুঝতে পারলেন, তিনি আসল ঘরে এসেছেন। বিরাট বড় লম্বা ঘর, সুন্দর করে দু তিন ভাগে সাজানো। শেষ প্রান্তে তাঁর অধ্যাপক দু পাশে দুই মহিলার মধ্যে বসে কথা বলছেন আর তিনজনে মার্টিনি পান করছেন। অধ্যাপকের পরণে কালো সুট। শাহেদকে ঢুকতে দেখে, দাঁড়িয়ে উঠে, এক পা এগিয়ে, তাঁকে আসতে বললেন। শাহেদের হাত পা তখন ঠিক তাঁর বশে নেই। তিনি তাড়াতাড়ি হেঁটে যেই এগোবেন, আয়নার মতো পালিশ করা কাঠের পার্কেট মেঝেতে তাঁর পা পিছলে গেল এবং তিনি পপাত ধরণীতলে। সঙ্গে সঙ্গে, হবি ত হ, তাঁর প্যান্টের সমুখের একটি বোতাম ছিঁড়ে গিয়ে মেঝেতে ছিটকে পড়ল এবং সেটি মনের আনন্দে গড়াতে গড়াতে, যেদিকে অধ্যাপকরা বসেছিলেন, সেদিকে কয়েক ফুট গড়িয়ে শেষে থামল। শাহেদ তখন ভাবছেন, আহা, এরা যদি একটু হেসে ওঠে তাহলেও ব্যাপারটা একটু অন্তত হাল্কা হয়। কিন্তু তা কি হবার জো আছে! কেউ হাসল না, কেউ এসে টেনে তোলার চেষ্টা করল না। যেন কিছুই ঘটেনি, কেউ কিছু দেখেওনি, এইভাবে দুই মহিলা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে যেতে লাগলেন। প্রোফেসরও চুপ করে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা শুনতে লাগলেন, যতক্ষণ না শাহেদ দাঁড়িয়ে উঠে হেঁটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন।

ন্যাণ্ডো ঘোষ ভূতের গল্প খুব ভাল করে বলতে পারতেন। হিরণ সান্যাল মশাই গল্প বলে হাসিয়ে হাসিয়ে লোকের পেটে ব্যথা ধরিয়ে দিতেন। অপূর্ব চন্দ একটু আদিরসাত্মক গল্প করতে ভালবাসতেন। কবি উইস্ট্যান অডেনের ভাই সুপ্রসিদ্ধ

ভূতত্ত্ববিদ, জন অডেন তখন ভারতের ভূতত্ত্বসংস্থায় বড় কাজ করেন, তিনি সে-সময়ে শীলা বোনার্জির হৃদয় জয়ের আশায় ব্যস্ত। স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের লিওসে এমার্সন তখন মিনি বোনার্জির সঙ্গে প্রেম করছেন, একদিন 'পরিচয়' বৈঠকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দু' তিনটি যুবককে নিয়ে এলেন। বসন্ত মল্লিক সর্বদা দর্শনবিষয়ক তত্ত্বে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁর আলোচনা প্রায়ই আত্মোক্তির মতো শুনতে লাগত, কী বলছেন সবসময়ে ঠিক বোঝা যেত না। যেদিন কেম্ব্রিজের ছেলেগুলি এল বসন্তদা তাদের সঙ্গে সত্যের প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে বিতর্ক ফেঁদে বসলেন। ছেলে-গুলি তাঁর কথায় বিপদ গুণে সরে পড়ল। আলোচনার কিছুটা সুধীনবাবু শুনেছিলেন। পরের সপ্তাহের বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একটি গল্প বললেন। গল্পটি হচ্ছে, তাঁরা সকলে মিলে হাজারীবাগে একবার বেড়াতে গেছেন। একদিন বিকালে শাহেদ, বসন্তদা, হিরণ সান্যাল, সুধীনবাবু বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলে ঢুকে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা বাড়ি ফিরে দেখেন, সকলেই এসেছেন, তবে বসন্তদা ফেরেননি। সকলেই চিন্তিত। হাজারীবাগে বাঘের প্রকোপ বিখ্যাত। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেল, রাত্তিরে কেউ খেতে বসতে পারেন না, বসন্তদার তবু পাত্তা নেই। শেষকালে একজন স্থানীয় লোক যোগাড় করে তাদের হাতে মাদল, বর্শা, সড়কি, পেট্রোম্যাক্স দিয়ে বসন্তদার খোঁজে সকলে বেরোলেন। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বেশ কিছুটা যাবার পর হঠাৎ চেনা মানুষের গলা শোনা গেল। একটুখানি খোলামেলা জায়গায় দেখা গেল বসন্তদা কান্টের অষ্টম ক্যাটেগোরিকাল ইম্পারেটিভ সম্বন্ধে আপন মনে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সমুখে ঘাসের উপর একটি রয়াল বেঙ্গল টাইগার লম্বা হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। চারটি ঘণ্টার একটি যুগান্তকারী বক্তৃতা মাঠে মারা গেল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য সবটাই স্বপ্ন দেখেছিলেন, তবে বসন্তদার পক্ষে ব্যাপারটি অনায়াসে সত্য ঘটনা হতে পারত।

১৯৩৬ সালে সুধীন দত্তর বয়স পঁয়ত্রিশের কোঠায় হয়ত হবে। দীর্ঘ, ব্যায়ামপুষ্ট, অতি সুপুরুষ দেহ, কিছুটা অ্যাংলোস্যাক্‌সন্‌দের মতো, শরীরে মেদ নেই বললেই হয়। কথার উচ্চারণ সোমনাথ মৈত্রর মতো একেকটি মুক্তোর মতো না হলেও গোটাগোটা ও পরিষ্কার। তাঁর ইংরেজিও বাংলার মতোই ভাল ছিল। তবে বাংলা ও ইংরেজি বলার সময়ে দুটিতেই থাকত একটু হাতীবাগানী গমগমে আওয়াজ, গলা যেন একটু ইচ্ছে করে উঁচু করা, বনেদী ঘরের ইংরেজদের অনেক সময়ে যেমন হয়, শিশুবয়স থেকে বড় বড় ঘরওয়ালা বাড়িতে থাকার দরুন। দত্তবংশীয়রা ছিলেন কলকাতার আদি বাসিন্দা, ইংরেজরা যাঁদের এখনকার ফোর্ট উইলিয়াম এলাকা থেকে সরিয়ে চোরবাগানে ভদ্রাসন পত্তন দিয়েছিল। অবশ্য,

কলকাতার বসু, ঘোষ, দত্ত, মিত্র, দেব, সিংহ প্রভৃতি কায়স্থ পরিবাররা চিরকালই পৃথিবীকে করতলগত আমলকীর চোখে দেখে এসেছে। সুধীনবাবুর কাব্য বা গদ্য দুটির কোনটিতেই আমি কোনদিন যথেষ্ট সচ্ছন্দ বোধ করিনি। দুটিতেই মনে হয়েছে কোন পৃথু মহিলাকে আঁটসাঁট অন্তর্বাস ও কর্সেট জোর করে পরিয়ে একহারা করার চেষ্টা হয়েছে, যাতে বহির্বাসের ঐশ্বর্য পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। শব্দ, ধ্বনি, অন্বয় সবই যেন বড় বেশী নিজেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কাব্যের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এত পরিপাটি হবে যে প্রায় নগ্ন ও নিরাবরণ মনে হবে, কিন্তু সুধীনবাবুর কাব্য এত সযত্নে, পরিপাটি করে সজ্জিত যে কিছুটা কৃত্রিম ও বাহুল্য-পূর্ণ মনে হয়, অস্বস্তি হয়। চিত্রের থেকে ভাবই বেশী থাকত। ইংরেজিতে যাঁরা চসার থেকে শুরু করে ইয়েট্স্ বা অডেনের অ্যাংলোস্যাক্সন্ শব্দরূপে ধাতুরূপে অভ্যস্ত, অথবা বাংলাসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতা, কবিকঙ্কন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ভারতচন্দ্র রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথে অভ্যস্ত, তাঁরা যেমন মিল্টনের বিরাট চৈনিক প্রাচীরে অস্বস্তিবোধ করবেন, খানিকটা সেইরকম অস্বস্তি বোধ করবেন। তার থেকেও অস্বস্তি হবে তার কাব্যে সংস্কৃতাবলম্বী নতুন শব্দ ব্যবহারে। আধুনিক যুগের অন্বিষ্ট বোধ হয় খুব সহজ, আটপৌরে শব্দে ও ভাষায় গূঢ় তত্ত্ব ও ভাব প্রকাশ করা, গূঢ় ভাষা, জটিল অন্বয়ে সহজ উক্তি ব্যক্ত করা নয়। ইয়েটসের পৃষ্ঠপোষক বান্ধবী লেডী গ্রেগরী অ্যারিস্টটলের সূত্র উল্লেখ করে যেমন বলতেন, 'চিন্তা হবে মহাপণ্ডিতের মতো, ভাষা হবে সরল কৃষকের মতো'। যে-বিষয়ে আধুনিক যুগের প্রধান গুরু হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। সুধীন দত্তর সনেটের কথাই ধরা যাক। আমার মতে মাইকেল মধুসূদনের সনেটের সঙ্গে তাঁর সনেটের তুলনা চলে না, ঠিক যেমন চলে না শেক্‌সপীয়র বা ডানের সনেটের সঙ্গে ফিলিপ সিডনীর বা স্পেন্সারের, যদিও শেক্‌স্‌পীয়র ও ডান্ তাঁদের সনেটে 'কন্‌সীট' অলঙ্কার খুবই ব্যবহার করেছেন। সুধীনবাবুর গদ্যও আমার মতে যেন ইচ্ছাকৃতভাবে আর্ষপ্রযুক্ত, অলঙ্কারবহুল, অথচ ধ্রুপদী নয়। যেন পুরনো শৈলীতে করা আধুনিক ভাস্কর্যে বড় বেশী প্যাটিনা যোগ করা হয়েছে। সুধীনবাবু বোধ হয় এই হিসাবে হ্রস্বজীবী একটি যুগের হাওয়া সৃষ্টি করেন, যা দেখে বিষ্ণু দেও এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করা শুরু করলেন যা খটমট ও অপ্রচলিত, অথচ কাব্যের বক্তব্যের পক্ষে অনিবার্য নয়। বহু অলঙ্কারভূষিত অপরূপ শতদল ভাষা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করে গেছেন, একই সঙ্গে করেছেন নিরাভরণা, ছিপছিপে রজনীগন্ধা, যেমন চতুরঙ্গ, দুই বোন, তিনসঙ্গী। ভাল করে ভেবে দেখলে মানতেই হয় সত্যিকারের মহৎ কাব্য, সে আপাতদৃষ্টিতে যতই অলঙ্কারবহুল মনে হোক, যথা মেঘদূত বা

কাদম্বরী, বা রবীন্দ্রনাথের উর্বশী বা মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, তা আসলে নিতান্ত নগ্ন এবং নিরাভরণ, ঠিক যেমন সমুদ্রোত্থিত ভিনাস নগ্ন ও নিরাবরণ, যে নগ্নতা বা নিরাবরণ তপশ্চারীরূপী, মেদহীন গদ্যেরও অতীত। এই নিরাভরণতা ও নগ্নতা সুধীন্দ্রনাথের আয়ত্তাধীন ছিল না। তাঁর প্রবন্ধের বই, 'স্বগত', আমার মতে, তিনি যা দাবী করেন ট্যুটনী মনপ্রসূত, তা নয়। ট্যুটনী মনের লেখা হচ্ছে, দর্শনে কাণ্ট, হেগেল বা এঙ্গেল্স্, সাহিত্যালোচনায় গ্যেয়টে, ক্লাইস্ট বা মান। সুধীনবাবু এঁদের ঐতিহ্যে যাননি, গেছেন নব্যন্যায়ের ধারায়। এবং আমাদের নব্যন্যায়ের মতো জটিল অথচ আপাতসহজ দার্শনিক তত্ত্ব ও বিতর্ক খুব কমই আছে। কমল মজুমদারের গদ্যের সঙ্গে অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের গদ্য তুলনীয় নয়। কমল মজুমদার কোন সাহিত্যিক সন্তান রেখে যাননি। সুধীন দত্ত বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি স্বল্পজীবী জারজ শিশু করে যান, যারা তাঁর বংশরক্ষা করতে পারেনি।

আমার বিবেচনায় সমর সেন তাঁর কাব্যে বাংলা কবিতাকে স্বীয় ঐতিহ্যের পথে এক নতুন ধাপে এগিয়ে নতুন ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে গেছেন। ঠিক এই কথাটি আমি অত জোরে ত্রিশ দশকের অন্য কবি সম্বন্ধে বলতে রাজি নই। ১৯৮৫-৮৬ সালে 'টেলিগ্রাফ' কাগজে সমরের 'বাবু বৃত্তান্ত', আমার লেখা ইংরেজি অনুবাদে ছাপা হয়। সেই অনুবাদের মুখবন্ধে আমি কী কারণে তাঁকে এই গুরুত্ব দিই তা লিখেছি। 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সমরের কবিতা প্রকাশ হওয়া মাত্র রবীন্দ্রনাথ সমরকে অভিনন্দন জানিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে চিঠি লেখেন। বুদ্ধদেববাবুর রিভিউ সম্বন্ধে আমি আগে লিখেছি। সমরের অগ্রজ কবিরা সমরের কীর্তিতে স্তম্ভিত হয়ে যথোচিত সমাদর ও শ্রদ্ধা জানাতে ভুলে যান। এক-আধজন কবি সমরকে অতিক্রম করার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। যেমন বিষ্ণু দের অন্তত দুটি কবিতা সমরের দুটি কবিতার কথা স্পষ্ট মনে করিয়ে দেয়। অন্যদিকে, সমরের অনুজ সমসাময়িক সার্থক কবিদের মধ্যে আমার কারো নাম মনে আসছে না যিনি সমরের কাছে ঋণী নন। ঠিক যেমন আধুনিক বাঙালী ফিল্ম ডিরেক্টরদের মধ্যে সকলেই মূলত 'পথের পাঁচালী'র কাছে ঋণী। আমার শুধু আক্ষেপ হয় কাব্যধারণে তাঁর এত তাড়াতাড়ি রজঃসমাপ্তির কী প্রয়োজন ছিল! সমরের গদ্যও ছিল তাঁর কাব্যের মতো ঋজু, সরল, স্বল্পভাষী, দ্যোতনাপূর্ণ। বিষ্ণু দের কিছু কবিতা আছে যা অতুলনীয়, তবে আমার মনে হয় তিনি যা কিছু লিখেছেন আদ্যোপান্ত সব কিছু ছাপাবার ব্যবস্থা না করলে তাঁর কীর্তি আরো মহৎ ও উজ্জ্বল হয়ে থাকত। সব কিছু ছাপাবার লোভ সংবরণ করা অবশ্য শক্ত ; বিশেষত আমাদের দেশে যেখানে লেখকদের রচনা ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা আদৌ নেই। বিষ্ণু দের গদ্য

সব সময়ে আমার পছন্দ হয় না, অনেক সময়ে অনাবশ্যক প্রগল্‌ভ ও জটিল হতো। ঠিক কী বলতে চান সব সময়ে বোঝা যেত না। তাঁর একমাত্র লেখা যা আমার কাছে যথেষ্ট স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছিল সেটি হচ্ছে যামিনী রায়ের উপর 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধটি পড়ে তিনি যখন আমাকে তুড়ে গালাগাল দিয়ে একই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় একটি স্বতন্ত্র লেখা প্রকাশ করেন। প্রত্যুত্তরে তাঁর এই প্রবন্ধের স্বচ্ছতার প্রশংসা করে 'পরিচয়ে' আমি একটি চিঠি লিখি, তাতে বলি এই প্রথম বিষ্ণুবাবুর গদ্যরচনা পড়লুম যার সবটুকু বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। 'পরিচয়' পত্রিকায় সে-চিঠিও ছাপা হয়। মাঝে মাঝে বিষ্ণুবাবুর আরেকটি ইচ্ছা প্রকাশ পেত। একজন কবি যা লিখেছেন, অনুরূপ ও আরো ভাল কবিতা লিখবেন। সমরের কবিতার বিষয়ে লিখেছি। সুধীন দত্ত 'অর্কেস্ট্রা' লিখলেন, বিষ্ণু দেও অনুরূপ একটি কবিতা লিখলেন। দুঃখের বিষয়, না সুধীনবাবু না বিষ্ণুবাবু, দুটি কবিতাতেই ইওরোপীয় বা ভারতীয় সঙ্গীতের কাঠামো বা কারুকার্য ঠিকমত ফুটে উঠল না, দুটিই বলতে গেলে প্যারডি হয়ে গেল। কিছুটা আমাদের কবির লড়াইয়ের মতো। অন্যপক্ষে, প্রেমেন্দ্র মিত্রর কাব্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল, তিনিও যে কেন কবিতা লেখা ছাড়লেন বুঝলুম না। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর কবি মন ছিল আমি যাকে বলতুম ব্লটিং কাগজের মতো। যখন যা বিদেশী কাব্য পড়তেন, তার ভঙ্গী বা ভাব তাঁর বাংলা কবিতায় প্রতিফলিত হতো বলে মনে হতো, তবে সেই প্রতিফলন সব সময়ে তীক্ষ্ণ ও যথাযথ হতো না। ১৯৪০-এর পরে যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন তাঁর মন ও লেখনী সহসা পরিপক্বতা লাভ করল, যার ফলে তিনি ১৯৪৫ সালের পর অনেক কিছু লিখলেন যা দীর্ঘজীবী হয়ে থাকবে, তাঁর প্রথম বয়সের 'বন্দীর বন্দনা'র মতো। জীবনানন্দ দাশের অনেক কবিতা সমরের কবিতার মতোই এক দীর্ঘস্থায়ী নতুন ধারার প্রবর্তন করল, যদিও আবার তাঁর অনেক কবিতার ছন্দ ও শব্দের অনুপ্রাস চাতুর্য আমার কানে বাহুল্যময় ও ক্লেশকর বলে মনে হয়; যেন তিনি কাঠবেড়ালীর মতো যা কিছু ফল দেখছেন তা কুড়িয়ে রাখার লোভ সংবরণ করতে পারছেন না। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় বেশ কিছু কবিতা লিখলেন যা চিরস্থায়ী হবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এলেন তখনকার কালে ক্রম ঊর্ধ্বগামী উল্কা হিসাবে। উনি এখনও যা লিখছেন, তাতে মনে হয় তাঁর শক্তি নিঃশেষ হয় নি। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এক বিশেষ ধরনের মজার কৌতুকবোধ ও স্বপ্নমিশ্রিত কল্পনাশক্তি ছিল।

এই বইটি প্রথম যখন ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় তখন কলকাতার একটি

দৈনিক পত্রিকায় বইটির পরিচয় ছাপা হয়। পরিচয়টি পড়ে পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আধুনিক অনেক সমালোচকেরই ত্রিশ দশকের সাহিত্যিক আবহাওয়া সম্পর্কে ঠিক ধারণা নেই, এবং পঞ্চাশ বছর আগে কবি, লেখক ও প্রখ্যাত ব্যক্তিরা অল্পবয়স্ক লোকদের, বিশেষ করে যাঁরা বিদ্যার্জনে সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁদের কত সমাদর করতেন, বিনয় সহকারে মিশতেন। এখন যেমন যাঁরা লেখক হিসাবে নাম করেন তাঁরা তাঁদের রয়াল্টি, নানাবিধ পুরস্কার ও বৈঠকী সমাদরের জোরে, একটি বিশিষ্ট শ্রেণী হিসাবে নিজেদের পৃথক মনে করে গৌরববোধ করেন, পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের সাহিত্যিক জগতে সেরকমটি ঠিক ছিল না। পদমর্যাদা রক্ষার জন্যে তাঁরা ব্যস্ত থাকতেন না, বরং নিজেদের সহজলভ্য করে সকলের নিকটে আসার চেষ্টা করতেন।

সে যাই হোক, এতক্ষণ যা লিখলুম সবই মোটামুটি আমার বয়সী বা আমার থেকে বড় জোর পনেরো কুড়ি বছর বেশী বয়সের ব্যক্তিদের সম্বন্ধে। তাঁদের কাছে নিজের মনের মতো কিছু সৃষ্টি দাবী করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত হতো; তাঁরা যদি সে-দাবী না রাখতে পারতেন তাহলে নিরাশ হওয়া অনুচিত হতো না। বিশেষত, ত্রিশের দশকে আমাদের দেশে যখন অনেক কিছু ঘটেছে এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্য এমন এক সার্থকতা ও পরিপক্বতার পর্যায়ে পৌঁছেছে যার দরুণ ইওরোপীয় সাহিত্যের আঁচল ধরে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এই সন্ধিক্ষণে যে দুই দিক্‌পাল পূর্বের কয়েক দশকের নিরলস পরিশ্রমের ফলে সারা বঙ্গদেশের জীবন ও চিন্তাধারায় যে নতুন প্রাণ ও বিপ্লবের জোয়ার আনেন—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—তাঁদের কাছে নতুন কিছু আশা না করলেও অন্যায় হতো না। তখন তাঁরা জীবনের যাত্রা প্রায় শেষ করে এনেছেন, নবীন লেখকরা তাঁদের প্রয়াণকল্পে উৎসাহভরে মনে মনে তাঁদের উদ্দেশে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনা করছেন। আমার নিকটতম বন্ধুদের শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছুটা অন্য মত থাকলেও, আমি নির্দ্বিধায় বলব, ১৯৩৬ সালে শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' পড়ে আমি বিশেষভাবে অভিভূত হই। তার আগে জাতির জীবনে নারীর স্থান বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের নানা উক্তি ও মত আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। ভাগ্যক্রমে, ১৯৩৬ সালেই কবি কালিদাস রায়ের বাড়িতে শরৎবাবুকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়। বইয়ে পড়েছি, হেমিংওয়ে এমন ভাব দেখাতেন যেন সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, মুষ্টিযুদ্ধই বেশী পছন্দ। শরৎবাবুকেও দেখে মনে হতো তিনি লেখক বলে পরিচয় দিতে নারাজ, তিনি নিতান্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে গড়গড়া খাওয়া প্রৌঢ় লোক। তবে চোখের

দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, চোখে চোখ রাখলে মনে হতো এক ঝলকে মনের ভিতরে কী আছে সব কিছু টেনে বের করবেন। সেই সময়ে, বা তার কিছু পরে, তাঁর 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ পড়ি। পরে যখন ১৯৭৬ সালে প্রবন্ধটি পুনরায় পড়ে সেটি ইংরেজিতে অনুবাদের জন্যে সেণ্টার ফর উইমেনস্ ডেভেলাপমেণ্ট স্টাডিজের অধ্যক্ষ ডাঃ বীণা মজুমদারকে অনুরোধ জানাই তখন বুঝতে পারি বাঙালী সমাজ, ত্রিশ দশকে কেন, এখনও, বইটির সম্যক মূল্য দিতে কিসের জন্যে নারাজ। বইটিতে এমন সব মন্তব্য ও তথ্য আছে যা বাঙালীর পুরুষ-শাসিত সমাজের মোটেই ভাল লাগার কথা নয়।

অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের ধারণা যে শরৎচন্দ্র তেমন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না, তবে খুব ভাল করে গুছিয়ে গল্প বলতে পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই এতবেশী শিক্ষিত নন যাঁরা বুঝতে পারেন, যে-ব্যক্তি অত ভাল, স্বচ্ছ, অনবদ্য ধ্রুপদী গদ্য লিখতে পারেন, তিনি নিশ্চয় বাংলা সাহিত্য আদ্যোপান্ত, যাকে সাদা বাংলায় বলে, গুলে খেয়েছেন। কিন্তু 'নারীর মূল্য' আমি যতদিন না পড়েছি ততদিন ঠিক বুঝিনি যে তিনি নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন এবং সাহিত্য কত আঁতিপাঁতি করে পড়েছেন। 'পথের দাবী' পড়ে অবশ্য আমার কিছুটা ধারণা হয়েছিল তিনি ১৯১০ থেকে চীনের বিপ্লব এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিষয়ে কতখানি খবর রাখতেন। কিন্তু যে উপন্যাস তিনি অসমাপ্ত রেখে মারা গেলেন—যা পর্যায়ক্রমে তখন 'ভারতবর্ষে' মাসে মাসে ছাপা হচ্ছিল—অর্থাৎ 'শেষের পরিচয়'—তা পড়ে আমার মাথা ঘুরে গেছিল। দস্তয়েভস্কী পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুটি বা ততোধিক বিপরীত প্রকৃতি যে-ভাবে বিরাজমান, অভাবনীয় অবস্থা, ঘটনা ও কথোপকথনের অবতারণা করে, তার বিস্ময়কর পরিচয় ও বিশ্লেষণ, তাঁর মতো আর কেউ দিতে পারে না। শরৎচন্দ্র অবশ্য দস্তয়েভস্কীর মতো মানবাত্মার অত উঁচু স্বর্গে অথবা অত নিচু নরকে উঠতে বা নামতে পারেন নি, কিন্তু তিনি যে দস্তয়েভস্কীর জগতেরই মানুষ এবিষয়ে আমার সন্দেহ থাকেনি বা এখনও নেই।

ভারতীয় সাহিত্যে একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত আর কে আছেন যিনি বৃদ্ধ বয়সে যুগান্তকারী সুবৃহৎ সৃষ্টি রচনা করে গেছেন! কিন্তু যে-ভাবে ১৯৩৪ সালের পর রবীন্দ্রনাথ একের পর এক কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ লিখে ছোটবড় সকল বাঙালী লেখককে যাকে বলে একেবারে গো-হারান হারিয়ে দিলেন, তাকে সাহিত্যিক পুনর্জন্ম ছাড়া আর কী বলতে পারা যায়? তাঁর রচনার থেকেও আমি বেশী অভিভূত হই তাঁর ছবি দেখে। 'প্রবাসী' পত্রিকায় তখন তাঁর কিছু কিছু ছবি

ছাপা হয়েছে। সেই সময়ে 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর ও যামিনী রায়ের মধ্যে ছবি সম্বন্ধে যে পত্রালাপ ছাপা হয় তা পড়েও আমি চমৎকৃত হই। দুটি বিষয়ে তাঁর ছবির দাম অতুলনীয়। এত বিভিন্ন রূপের, চরিত্রের, অন্তরের ঐশ্বর্যপূর্ণ নারীর ছবি তাঁর মতো আর কেউ এঁকেছেন বলে আমার সহসা মনে পড়ে না। দুই, মনের গহনে যে সমস্ত অনুচ্চারিত রূপ, প্রকৃতি, জীবজন্তু, মানসিক আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক চিন্তা, ভাবনা ও আলাপ আনাগোনা করে, মাঝে মাঝে হঠাৎ অচেতন ও সচেতন মনে ভেসে উঠে ফের ডুব দেয়, তার রেখায়, বর্ণে পরিপূর্ণ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করার সাহস তিনিই প্রথম দেখালেন। আধুনিক বাঙালী চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ শিল্পীই এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে, তাঁদের কর্মপথে নিজেদের অজান্তে, অবচেতন মনে, সাহস না পেলে কিছু সৃষ্টি করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। আমার মনে বিশেষ করে আসে গণেশ পাইন, প্রকাশ কর্মকার, বিজন চৌধুরী, যোগেন চৌধুরী, ধর্মনারায়ণ, শুভাপ্রসন্ন প্রভৃতি স্বনামধন্য চিত্রশিল্পীর কথা।

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে একটি দৃশ্য যা আমার এখনও মনে আছে তার কথা বলি। আমি রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে। আশুতোষ হলে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' প্রবন্ধটি পড়েন। তাঁর পরণে তসরের আলখাল্লা। অধিবেশন শুরু হবার বেশ কিছু আগে এসে তিনি অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ করে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। অস্তগামী সূর্যের আলো তাঁর মাথার চুলে ও দাড়িতে পড়ে লাল্‌চে সোনালি রঙের ফুলকি ছড়াচ্ছে। ফোটোগ্রাফার কার্টিয়ের-ব্রেসঁ একটি কথা ব্যবহার করতেন—বিচারের মুহূর্ত। রবীন্দ্রনাথ বিচারের মুহূর্ত কাকে বলে তা জানতেন। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি বিদ্বৎসমাজের শিখরস্থ ব্যক্তি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ইতিহাসে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দেন। উৎসবটি হয় প্রেসিডেন্সী কলেজের খোলা-মাঠে শামিয়ানার তলায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন ভাইস্ চ্যান্সেলর এবং জন অ্যাণ্ডারসন চ্যান্সেলর। বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার সকল স্তরে মাতৃভাষায় সমস্ত শিক্ষা প্রচলন সমর্থনে আবেদন করেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে আমি যতবার দেখেছি, হয় নাট্যমঞ্চে না হয় প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিক্স থিয়েটারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এম-এ ক্লাসে যেতুম প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে। প্রচলিত প্রথানুসারে, যদি কেউ ইংরেজি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেত তাকেই সরাসরি প্রেসিডেন্সী কলেজ-পত্রিকার সম্পাদকপদ নিতে আহ্বান করা হতো। আমাকে বলা হল। অমরত্বলাভের এই লোভ সংবরণ করা কঠিন। দুর্গা পিতুরি লেনের

মডার্ন আর্ট প্রেসে পত্রিকা ছাপা হতো। প্রেসের মালিক আমাকে নানান ধরনের টাইপ, টাইপ সাজানো, চারপাশের জমি কতখানি ছাড়তে হয়, কত এম-এর টাইপ বাছলে, দুই লাইনের মধ্যে কত এম ফাঁক রাখলে ভাল হয়, ফর্মা ও কাগজ বাছা, বাঁধাই তদারকি, ব্লক তৈরি, লিথো ও হাফটোন ছবি, এসব বিষয়ে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে শেখান। এসব শিক্ষা সারাজীবন আমার খুব কাজে লাগে। বহু পরে, ১৯৬০ সালের পর, যতদিন বেঁচে ছিলেন, বিখ্যাত মুদ্রণশিল্পী দিলীপ চৌধুরী দিল্লীতে আমাকে এবিষয়ে আরো ভাল করে শেখান।

প্রোফেসর তারকনাথ সেন ছিলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত অভিভাবক। তিনি প্রস্তাব করলেন একবছরে তিনটি সংখ্যায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে অথবা পাঁচমিশেলি বিষয়ে সম্পাদকীয় না লিখে, আমি একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে যদি পরপর তিনটি সম্পাদকীয় লিখি। বিষয় হিসাবে প্রস্তাব করলেন 'পরীক্ষা'। এই তিনটি সম্পাদকীয় পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করলে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হতো। অপূর্বকুমার চন্দ ও সুশোভনচন্দ্র সরকার 'পরিচয়ে'র আড্ডায় প্রবন্ধ তিনটির উপর একটি আলোচনার আয়োজন করেন। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে ঐ তিনটি সম্পাদকীয়র উপর একটি বিতর্ক ছাপা হয়: লেখক ছিলেন ডব্লিউ-এ জেঙ্কিন্‌স্ (ডিরেক্টর অভ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন), প্রিন্সিপাল কে জাকারিয়া, অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার ও তারকনাথ সেন, কালিদাস লাহিড়ী (সিক্‌স্‌থ ইয়ার ইকনমিক্সের ছাত্র), এবং থার্ড ইয়ার ইতিহাসের ছাত্র প্রতাপচন্দ্র সেন। পত্রিকার জন্য ছাপাবার উপযুক্ত প্রবন্ধ বা লেখা পেতে কোন অসুবিধা হতো না। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় রাধাগোবিন্দ বসাকের প্রবন্ধ "জাতীয় মহাকাব্য দুটিতে অরাজকতার কুফল বর্ণন" এবং গৌরীনাথ শাস্ত্রীর "সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে গুণতত্ত্ব" ছাপা হয়। এঁরা ছিলেন অধ্যাপক; কিন্তু ফোর্থ ইয়ার পালির ছাত্র দেবপ্রসাদ গুহর "বৌদ্ধ সাহিত্যে বিবাহ" কোন মতেই কম উপাদেয় ছিল না। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় দুটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ছিল: একটি ফোর্থ ইয়ার ইকনমিক্সের ছাত্র বিমলচন্দ্র সিংহর "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ ইণ্ডিয়া", অন্যটি সদ্যপ্রকাশিত কবি ডব্ল্যু-বি ইয়েটসের ভূমিকা সম্বলিত "অক্সফোর্ড বুক অভ মডার্ন ভার্স"-এর অধ্যাপক হাম্‌ফ্রি হাউসের সমালোচনা।

সম্পাদকীয় কাজের উপসংহার হিসাবে একটি ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পত্রিকার সম্পাদনার জন্য আলাদা একটি ঘর বাঞ্ছনীয়। সোমনাথ মৈত্র সে বছর ছুটি নিয়ে ইউরোপ যান। বিরাট লাইব্রেরির একতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তাঁর কুঠুরিটি খালি পড়ে ছিল, সেটি আমি পেলুম। এরই গা দিয়ে একতলার

সমুখের চওড়া বারান্দা সারা বাড়ির সমুখ বরাবর গেছে। বারান্দা আর কুঠুরির মধ্যে দেয়াল হিসাবে ছিল সাত ফুট উঁচু ঘষা কাঁচের বন্ধ জানলা। তার উপরদিকে স্বচ্ছ কাঁচ। কুঠুরি থেকে বের হবার রাস্তা ছিল লাইব্রেরির ভিতর দিয়ে। মধ্যে বিরাট বিরাট তিনতলা করা থাকে থাকে শেল্‌ফ্‌, বইয়ে ঠাসা। প্রত্যেক তলায় সরু লোহার বারান্দা ও সিঁড়ি যাতে অনায়াসে চলে ফিরে বই রেখে আসা বা পেড়ে আনা যায়। আমাদের বছরের একটি মেয়ে (সে-যুগে আমরা 'মহিলা' বলতুম) ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজ থেকে ফলিত গণিতের ক্লাস করতে প্রেসিডেন্সীতে আসত। জিওডেসি বিষয়টি এম-এস-সিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের এক অধ্যাপক পড়াতেন। ছাত্রদের আনাগোনার সুবিধার জন্য একই দিনে আলাদা আলাদা সময়ে দুটি পিরিয়ড নিতেন। দুটি ক্লাসের মধ্যে যে দু এক ঘণ্টা ফাঁক থাকত, সেই সময়টা কাটাবার জন্য আমি মেয়েটিকে আমার কুঠুরিতে এসে বসতে বলতুম। আমার সহপাঠী প্রীতিতোষ রায় ১৯৩৩ সালে আমার সঙ্গে মেয়েটির (নাম আভা) আর তার মাসীমা রামানুজার আলাপ করিয়ে দেয়। তারপর থেকে মাঝে মধ্যে দেখা হতে হতে আলাপ জমে ওঠে। কুঠুরিতে আমি কাজ করতুম, আভা বসে থাকত। আভার ক্লাসের ছেলেরা বোধহয় ব্যাপারটিকে আমার পক্ষে তাদের অধিকারে ভাগ বসানো হচ্ছে মনে করে চটে গেল। কুঠুরির মধ্যে বসে আভা কী করে, লুকিয়ে দেখার জন্যে তারা নিজেদের একটি সহপাঠীকে উস্কানি দেয়। ছেলেটি বুদ্ধি খেলিয়ে স্থির করল বারান্দার কাঁচের দেয়ালের কাঠের বীটে পা রেখে উঠে ঘষা কাঁচের উপরের পরিষ্কার কাঁচের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঠাহর করে দেখবে। কিন্তু বীট ত বেজায় সরু, পা আটকাবে কেন ? দুটি বীট ওঠার পরই পা পিছলে আলুর দম। ভাগ্যে, কাঁচ ভাঙেনি! কথাটা হৈ হৈ করে সারা কলেজে ছড়িয়ে গেল। ফলে একজন অতি কৌতূহলী অধ্যাপক আরেকটু বুদ্ধি খাটিয়ে দোতলার সমান উঁচু বইয়ের লোহার থাকে উঠে বইয়ের ফাঁকে উঁকি মেরে কুঠুরিতে কী হচ্ছে দেখতে গেলেন। হঠাৎ সমুখের দোতলার সমান উঁচু বইয়ের থাকে খুট করে একটু শব্দ হওয়ায় মুখ তুলে যা দেখলুম তাতে ঠিক বুঝতে পারলুম না 'উঁকিমারা জগাই' আমাদের দুজনকে ঠিক কী অবস্থায় দেখেছে : 'রেম্‌ব্রন্টের জুইশ ব্রাইড' অবস্থায়, না দান্তের 'নরক' কাব্যের ষষ্ঠ স্তবকের পাওলো ও ফ্রাঙ্কেস্‌কার অবস্থায়, যেখানে পাওলো ফ্রাঙ্কেস্‌কাকে ল্যান্সেলটের গল্প পড়ে শোনাতে শোনাতে আকম্পিত দেহে তার মুখে চুমু খেলেন, তারপর সেদিন আর পড়া হল না। সে যাই হোক 'উঁকিমারা জগাই' ছিলেন মান্যগণ্য লোক, তাঁর মতের দাম ছিল। স্থির হল, যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। কুঠুরি থেকে

আমি নির্বাসিত হলুম, এই অজুহাতে যে ওটি আরেকজন অধ্যাপকের বিশেষ প্রয়োজন। এর পর আর কোথাও 'নিভৃতে' দেখা করার জায়গা রইল না। যা কিছু দেখা হতো তা মাঝে মাঝে পার্ক স্ট্রীট লোয়ার সার্কুলার রোড অঞ্চলের ফাঁকা পার্কের গাছের তলায়, অথবা কলেজ থেকে ফেরার সময়ে বাসে, কচিৎ কদাচিৎ সিনেমায়, যখন মাঝে মধ্যে টিকিট কেনার পয়সা জুটত।

আভা আমাদের সঙ্গে ১৯৩২ সালে বেলতলা গার্ল্‌স্‌ স্কুল থেকে স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে। তার আগে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে পড়ত। সুতরাং নিজেকে উঁচুস্তরের জীব, অথবা 'সমানের মধ্যে একটু বেশী সমান' মনে করার কোন কারণ আমার ছিল না, সে যদি আমি লাজুক বা মুখচোরা নাও হতুম। নিতান্ত সহজভাবে, কোন রকম আড়ষ্টভাব না দেখিয়ে একই ইয়ারের মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলার মতো আমার সাহস ছিল না। তার থেকে বরং বয়সে বড় রামানুজার (ডাক নাম ছবিদি) মাধ্যমে কথা বলা অনেক সহজ ছিল।

আভার মা বাবা বর্ধমানে থাকতেন, টাউন হল পাড়ায় তাঁদের নিজেদের বসতবাড়ি ছিল। আভার বাবা, শ্রীভোলানাথ রায় ছিলেন উকিল, স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র। আদি গ্রাম দামোদরের দক্ষিণতীরস্থ খণ্ডঘোষ থানার বোঙাই গ্রামে তাঁদের জাগ্রত প্রতিমা বোঙাইচণ্ডী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বোঙাইচণ্ডী পরিবার নামেই ছিল তাঁদের পরিচয়। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে মাঝে মাঝে আভার মাকে রাস্তায় দেখতুম, মেজবোন আর মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছেন। তাঁর চোখদুটি ছিল আভার চেয়েও বড়; মোটাসোটা, হাসিখুশি চেহারা। সকলের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। জন্ম থেকেই আভার দিদিমা তাকে মেয়ের কাছ থেকে নিয়ে নিজের কাছে মানুষ করেছেন। বাড়ি ছিল ভবানীপুরের হরিশ মুখুজ্যে রোডের পশ্চিমে, ভিতরে ৯।১ মদন পাল লেনে। দিদিমার সমুখে আমি কোনদিন যাইনি। দূর থেকে এক আধবার দেখেছি, ছবিদি আর নাতনির সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। নিজের বাড়িতে আর আভার বাড়ির কথা শুনে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে বাঙালী সংসারের যা কিছু নতুন পরিবর্তনের হাওয়া বা মতবাদ আসে, তার জন্যে বাড়ির কর্তাদের থেকে গৃহিণীরাই বেশী দায়ী, জীর্ণ পুরাতনের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্যে তাঁরাই বেশী ব্যস্ত হন। সেইজন্যই বাংলা-সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী এত নমস্য। ১৯৩৭ সালে, ছেচল্লিশ বছর বয়সে, অর্থাৎ আমারই মায়ের থেকে তখন তিনবছর বেশী বয়সে, আভার দিদিমা মারা যান। আভার দাদামশাইকে আমি আমার বিয়ের আগে কখনও দেখিনি। ভিন্ন জাতে বিয়ে করার অপরাধ মাপ করে তিনি যখন কৃষ্ণনগরে আমাদের বাড়িতে এসে

কয়েকদিন থেকে আমাদের আশীর্বাদ করলেন, তখন দেখলুম তিনি আমার বাবার বন্ধুদের মতো মোটেই নন। ভাল ভাল জিনিস খেতে খুব ভালবাসতেন। পরিপাটি করে শৌখিন পোশাক পরতেন। মাথায় সবমিলিয়ে পঞ্চাশ গাছা চুলও ছিল না, যখন তখন চিরুনী দিয়ে টাকমাথা আঁচড়াতেন। প্রত্যেকদিন নিজের জুতো আয়নার মতো পালিশ করতেন, হাতের কাছে অন্যের জুতো পেলেও করতেন। গলার স্বর ছিল উঁচু আর হাসিখুশি। আভার পরিবারের উভয় পক্ষে কেউ সরকারি চাকরি করেননি। আমি সে পরিবারে প্রথম সরকারি চাকুরে হয়ে ঢুকি। একসময়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের সঙ্গে আভার দাদামশাই কয়লাখনির মালিক ছিলেন, তাছাড়া ক্যানিং স্ট্রীটে অন্য ব্যবসাও ছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার ঘরে সম্ভবত আমার মূকভাব দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে একদিন আভা আমাকে চিঠি লিখতে বলল। ফলে, কলম দিয়ে মূক মুখের ভাষা মোটামুটি সহজে বেরিয়ে এল। যখন আভা মোটামুটি নিশ্চিন্ত হল যে আমি চাকরি জোটাবার চেষ্টা করব, তখন আমার সিদ্ধান্তে সে এতই নিশ্চিন্ত হল যে আমার চাকরির জন্যে পড়া ছাড়া অন্য উপায় রইল না। আরো মুস্কিল হল এই, পাছে আমার হৃদয়ের স্পন্দন অশান্তগতি হয় এবং আমার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে, সে বিষয়েও সে বদ্ধপরিকর হল। ফলে অবহেলিতবোধে মাঝে মাঝে মনে বেশ ক্ষোভ হতো না, তা নয়। অন্যদিকে তার দিদিমার অকস্মাৎ মৃত্যুতে তার দিকেও নানা রকম সমস্যা দেখা দিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের বি-এ ক্লাস থেকে আশুতোষ বিল্ডিং-এ এম-এ ক্লাসে গিয়ে দেখি সেখানে পড়াশোনার মান বেশ কিছুটা নিচু। লেকচার ঘরগুলি বিরাট গুহার মতো। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও অনেক, এম-এ ইংরেজিতেই প্রায় শ' দেড়েক। উপরন্তু বিভিন্ন কলেজে পড়ানোর মানে অনেক পার্থক্য থাকায়, সে সব কলেজ থেকে যেসব অধ্যাপকরা এসে পড়াতেন তাঁদের পড়ানোর মধ্যে মানের পার্থক্য যথেষ্ট থাকত। ফলে এম-এ ক্লাসের অধ্যাপনায় একটি সাধারণ সমতাও থাকত না। অধ্যাপক হরেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে, যিনি পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হন, তিনি ছিলেন স্নেহশীল দাদামশাই প্রকৃতির ব্যক্তি। তিনি কী পড়াতেন বিশেষ কিছু মনে নেই। তবে তাঁর ভ্রমণের গল্প বেশ মনে আছে। যেমন, বঙ্গদেশের নদীপথে ভ্রমণের কথা বলতে গিয়ে একবার বললেন 'দেন্ উই ওয়েন্ট ফ্রম পোড়াবাড়ি টু চারাবাড়ি ফেমাস ফর ইট্‌স্ চমচম'। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তুম বলে মাঝে মাঝে আমি সেন্টপল্‌স্ কলেজে গিয়ে হামফ্রি হাউসের সঙ্গে দেখা করতুম, তিনি তখন মিলফোর্ড সাহেবদের সঙ্গে থাকতেন। হাউস বলতেন, যেদিন

আশুতোষ বিল্ডিং-এ ক্লাস থাকত সেদিন সকালে উঠে অতবড় ক্লাস নেবার কথায় তিনি খুব ভড়কে যেতেন। একটি ছোট্ট শ্বেতপাথরের শিবলিঙ্গ কিনেছিলেন, যেদিন ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে যেতেন, সেদিন সকালে শিবলিঙ্গের গায়ে আঙুল বুলিয়ে দেহে ও মনে শক্তি প্রার্থনা করতেন। একদিন মুখ চুন করে আমাকে জিগ্যেস করলেন, "ছেলেরা বলে আমার অ্যাক্‌সেণ্ট বুঝতে পারে না, তাতে ওরা কী বলতে চায় বল ত! আমি অ্যাক্‌সেণ্ট ঘোচাবার জন্যে বাড়ির টাকা খরচ করে অত বছর অক্সফোর্ডে কাটালুম, তবুও কী আমার অ্যাকসেণ্ট যায়নি?" তিনি অবশ্য নির্ঘাত জানতেন ছেলেরা অ্যাক্‌সেণ্ট বলতে কী মনে করে। মজা করে বলা বা লেখার ব্যাপারে তিনি যে অত্যন্ত পটু ছিলেন তা বুঝতেই পারা গেল যখন আমাকে তিনি নিজের খরচে মুদ্রিত ছোট্ট একটি পকেট গীতা সাইজের বই উপহার দিলেন, তার নাম 'আই স্পাই উইথ মাই লিট্‌ল্ আই'। আই-সি-এস মাইকেল ক্যারিট, যিনি প্রায় ঐ সময়ে বিলেতের কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য হয়ে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন, তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন বলে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকেও কম্যুনিস্ট সন্দেহে লর্ড সিংহ রোডের আই-বির খোদ দপ্তরে ডেকে এনে দিনের পর দিন কিভাবে জেরা করে, বইটি তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ, মজার মজার চুটকি মন্তব্যে ভর্তি। ১৯৪০ সালের প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া যখন ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করে তখন হাউসের নিমন্ত্রণে আমি সাসেক্সে তাঁর বাড়িতে দুতিনদিনের জন্যে যাই। তখন আমি ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ সম্বন্ধে বিলেতের কম্যুনিস্ট পার্টির আসল মত কী সে সম্বন্ধে জিগ্যেস করাতে তিনি বললেন, 'জানো, অশোক, সত্যি কথা বলতে আমার রাজনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ নেই বললেই হয়। তবে কলকাতায় থাকতে থাকতে, পুলিশ আমার পিছনে লেগে, আমার আত্মসম্মানে নিতান্ত আঘাত করে বলেই আমি খেপে যাই'। ১৯৩৬ সালে যখন তিনি কলকাতায় যান তখন তাঁর মুখ্য খ্যাতি ছিল জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্‌সের সম্পাদনার জন্যে। সেই বছরেই তিনি টাইম্‌স্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে লেখেন, এডওয়ার্ড টমসনও লেখেন। ইউনিভার্সিটিতে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ক্লাস করে মনে হতো তাঁরা ইচ্ছে করে তাঁদের দুধে জল দিচ্ছেন, তার কারণ বোধ হয় তাঁদের বাড়িতে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে তার আগে আমি তাঁদের কাছে খাঁটি দুধের স্বাদ পেয়েছি।

১৯৩৬ সাল যখন শেষ হল বুঝলুম আমার দ্বারা অধ্যাপনা চলবে না। তাছাড়া ইংরেজি সাহিত্যে তখন আমার আসক্তি একটু কমে গেল, ক্লাসে যা পড়েছি তাতে পরে নিজেই নিজের মতো চালিয়ে নিতে পারব মনে হল। বাবা অক্সফোর্ডের কথা

তুললেন, বললেন তার উদ্দেশে আমার জন্যে তিনি দশ হাজার টাকা রেখেছেন। আমি দুটি কারণে অক্সফোর্ড যেতে রাজি হলুম না। অবশ্য কারণ দুটি বলিনি। প্রথমত, মায়ের স্বাস্থ্য তখন দ্রুত খারাপ হয়ে আসছে, এবং তাঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে চিন্তার অতীত। দ্বিতীয়ত, ততদিনে আমি ঠিক করেছি নিজের পছন্দমতো বিয়ে করব। আমি ধরেই নিয়েছিলুম সে-ব্যাপারে বাবামায়ের সম্মতি পাব না, সুতরাং তাঁদের টাকা নিয়ে বিলেত গিয়ে, পরে তাঁদেরই মতের বিরুদ্ধে কাজ করা, আমার পক্ষে নৈতিক বেইমানির সমান বলে মনে হতো। মানুষের টাকা নিশ্চয় প্রয়োজন, কিন্তু এটাও ঠিক যে অর্থের আতিশয্যের প্রয়োজন নেই। আই-সি-এস বা অন্যকোন চাকরি থেকে যা আসে মোটামুটি স্বাচ্ছল্যের পক্ষে তাই যথেষ্ট। বাবা আর তাঁর বন্ধুদের দেখেছি মাঝারি সরকারি চাকরি করে সময়ে সময়ে তাঁরা কতখানি গ্লানি বোধ করতেন। আই-সি-এস চাকরিতে ছোটোখাটো অপমানের গ্লানি আর হয়রানি থেকে বাঁচা যায়, ক্যারিটই সে যুগে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। সেই সঙ্গে নিজের মনের মতো করে নিজের জগতে খানিকটা থাকা যায়। যদি আই-সি-এসে ঢুকতে পারি তা হলে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে ত বটেই, উপরন্তু, কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, বিদ্বৎসমাজেও যথেষ্ট সমাদর মিলবে। তাছাড়া আমি নিজেকে কোনরকম রাজনীতির উপযুক্ত বলে মনে করিনি, আমার নিজের মধ্যে স্বদেশপ্রেমীর শৌর্যবীর্য ছিল বা আছে বলে কোনদিন মনে হয়নি। অপরপক্ষে, আই-সি-এসে ঢুকতে পারলে নিজের দেশ সমাজ ও দেশবাসীকে নিচের থেকে উপর পর্যন্ত জানার সুবিধা পাব বলে মনে হতো। এসব ভেবে চিন্তে ঠিক করলুম দিল্লীতে আই-সি-এস বা অন্য কিছু কেন্দ্রীয় চাকরির পরীক্ষাগুলি একবার কপাল ঠুকে দেব, দেখি কী হয়। তবে ইংরেজিতে ত বেশী মার্ক ওঠে না, ফিজিওলজি ইত্যাদি বিষয়ে ওঠে।

কলেজে কোনদিন ইতিহাস পড়িনি। কিন্তু 'পরিচয়ে'র আড্ডায় সুশোভন সরকার মশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। একদিন রবিবার সকালে সাহস করে একডালিয়া রোডে তাঁর দোতলার ফ্ল্যাটে গেলুম। তিনি শুনে বললেন পরের রবিবারে আবার যেতে, ইতিমধ্যে ভেবে দেখবেন। পরের রবিবার যখন গেলুম, তখন বললেন পরের মাসের পয়লা তারিখ থেকে আসতে। পরের মাসটি ১৯৩৬ ডিসেম্বর, কি ১৯৩৭-এর জানুয়ারি ছিল ভুলে গেছি।

একবার ভেবে দেখুন সুশোভনবাবু কোন অর্থের প্রত্যাশায় নয়, সুনামের প্রত্যাশায় ত নয়ই, শুধু একটি ছেলেকে, তাও নিজের ছাত্র নয়, সাহায্য করার জন্যে নিজের কত অর্থব্যয় এবং তার সঙ্গে পরিশ্রম করেছিলেন। আমি ইতিহাসের যে

পর্বগুলি আই-সি-এস-এ দেব ঠিক করেছিলুম, তার অধিকাংশই তিনি কলেজে পড়াতেন না। অতএব নিজের খরচে তখন তিনি ১৪৮৫ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত এই কয় শতাব্দীর পুরো অক্সফোর্ড হিস্টরি অভ ইংল্যাণ্ড খণ্ডগুলি কিনলেন। উপরন্তু কিনলেন র‍্যামজে মিউর, গ্রীন এবং ট্রেভেলিয়ান। সেই সঙ্গে ইওরোপীয় ইতিহাস ১৭১৪-১৯১৯ যুগ পড়াবার জন্যে কিনলেন, সেই বিষয়ে নতুন কেম্ব্রিজ ইতিহাস। ভারতের ইতিহাসের জন্যে মধ্য ও আধুনিক যুগের ভারতের ইতিহাস। সপ্তাহে তিনদিন তিনি সকালে পুরো একঘণ্টার জন্যে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে আস্তে আস্তে বলে যেতেন। আমি তাঁর কথাগুলি আগাগোড়া টুকে যেতুম। এইভাবে বৃটিশ, ইওরোপীয়, ভারতীয় ইতিহাসের ছ'টি বড় বড় যুগ পড়াতে তিনি নিলেন পুরো ন'মাস। আরো ছ'মাস লাগল আমার সেগুলিকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দুবার করে নকল করতে। এ না হয় হল। সুশোভনবাবুর লেকচার এইভাবে টুকে ও নকল করতে করতে আমার ইংরেজি ভাষায় লেখা সম্বন্ধে যে জ্ঞান হল তা আমার ইংরেজির অধ্যাপকদের কল্যাণেও সম্ভব হয়নি, বিশেষত কত অল্প কথায় কত বেশী বলা যায় এই শিক্ষায়। যতদূর মনে আছে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় আমি ইতিহাসের ছয়টি পেপারে মোট ৬০০ মার্কের মধ্যে ৪৩০ মার্ক পেয়েছিলাম এবং ছয়টি পরীক্ষার কোনটিতেই আমি তিনঘণ্টায় পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরে আঁটসাঁট হস্তাক্ষরে সাড়ে সাত আট পৃষ্ঠার বেশী লিখিনি। ফিজিওলজি ছেড়ে শেষে আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষা দিই, তাতে ২০০র মধ্যে ১৯২ মার্ক ওঠে।

জীবিকার সন্ধানে পড়াশোনা

এত খুঁটিনাটি উল্লেখের উদ্দেশ্য, যদিও আমি এম-এ ক্লাসে যেতুম, তবুও যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমার সহপাঠীরা এম-এ পড়ছিল, সে-উদ্দেশ্য আমার ছিল না। ফলে, আপাতদৃষ্টিতে আমি সাধারণ স্রোতে থেকেও তার বাইরে ছিলুম। থেকে থেকেই আমার বেশ নিঃসঙ্গ লাগত, উদ্বেগ হতো। উদ্বেগ হতো দুই কারণে। প্রথমত মা'র অসুখ দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছিল; দ্বিতীয়ত, আই-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কাজ পাওয়া শুধু যে অত্যন্ত দুরূহ ছিল তা নয়, অনেকখানি কপালেরও ব্যাপার ছিল, বিশেষত দিল্লীর পরীক্ষায় কলকাতার বাঙালী

কোন ছেলে ১৯২৯ সালের পর কোন বছরের পরীক্ষাতে সফল হন নি। ভাল করে এম-এ পাশ করলেও আমাদের যুগে ভাল চাকরির সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। সমর সেনের কথা বললেই বোঝা যাবে। সমর বি-এ এবং এম-এ দুটিতেই ফার্স্ট ক্লাসে প্রথম হয়েও তার প্রথম চাকরি হল কাঁথি কলেজে মাসে মাত্র পঁচাত্তর টাকা মাইনের, তার থেকেও আবার মাসে মাসে পাঁচ টাকা কলেজ কেটে নিত কলেজ ফাণ্ডের জন্যে। এর পরেও সমরের যেসব চাকরি হয়, তার কোনটিতেই আর্থিক স্বাচ্ছল্য কোনদিন আসেনি। সে যাই হোক, যা বলতে চাইছিলুম সেটি হচ্ছে— এম-এর পালে পুরোপুরি থাকলে নিঃসঙ্গতার হাত থেকে হয়ত রক্ষা পেতুম, কিন্তু সে-পথ আমি নিজের হাতে বন্ধ করি।

এই নিঃসঙ্গতাই এক হিসাবে শাপে বর হল, যা পুরোদমে এম-এ পড়লে হয়ত কপালে জুটত না। নিজের সময় ও সুবিধামত অনেক কিছু করতুম, কেবল ঘড়ি ধরে মায়ের সামান্য একটু তদারক করা ছাড়া, যা নিয়মিত ক্লাস করলে সম্ভব হতো না। বেহালার সাগর মান্না রোডে সমর সেনের বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে শনি বা রবিবার যাওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। সমরের বন্ধুত্ব আমার যতখানি প্রয়োজন ছিল, সমরের পক্ষে আমার বন্ধুত্ব হয়ত ততখানি ছিল না। সমরের কবিতার বই মোজাফর আহমেদকে উৎসর্গ করা, তাতেই আরো বিশেষ করে সে মার্কামারা কম্যুনিস্ট কবি হিসাবে পরিচিত হল। অন্যদিকে আমি সাম্রাজ্যবাদের পায়ে দাসখৎ লেখার জন্যে তৈরি হচ্ছি। সমরের সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ় করার ইচ্ছা ত বটেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বাড়ির আর সকলের সঙ্গেই খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ জমে গেল। তার বাবা, ভাইবোন ত বটেই, উপরন্তু বাড়িতে অনাত্মীয় কয়েকজন থাকতেন তাঁদের আকর্ষণও আমার কাছে খুব কাম্য হল। সমরের বাবা অরুণচন্দ্র সেনকে দেখে আমার খুব বিস্ময় লাগত। আমার বাবার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, স্বভাবে অগোছালো, উপরন্তু সময়ের ঠিক নেই, যা আমার বাবার অসহ্য ছিল। লোকে বলত মাথাপাগল, কিন্তু আমার মতে একান্ত সহিষ্ণু, মিশুক ও যাকে বলে মায়াদয়ার শরীর। কেউ তাঁর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত পোষণ করলেও তিনি তার প্রতি কোনরকম অসহিষ্ণুতা বা রুক্ষতা প্রকাশ করতেন না। আশ্চর্যরকমের ভদ্র ও সভ্য ছিলেন, যা বাঙালীদের মধ্যে কমই দেখা যায়। যার সঙ্গে মতানৈক্য হবে তার সঙ্গে সমর সেবিষয়ে কথা বলত না, কিন্তু ওর বাবা রাজনীতি নিয়ে সর্বদা প্রচণ্ড তর্ক করতে প্রস্তুত, অথচ যার সঙ্গে একেবারেই মতে মিলছে না তাকে সবসময়েই সাহায্য করতে, বাড়িতে রেখে আপ্যায়ন করতে প্রস্তুত। ঘোর শত্রু হওয়া তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। এরপর বলি সমরের বড়দা অমলদার এবং মেজদা গাবুদার কথা।

ছোটদির এক বন্ধুর বাড়িতে অমলদা আত্মীয়ের মতো থাকতেন, সেই সূত্রে অমলদাকে আগে থেকেই জানতুম। সব দিক দিয়ে মনে হতো সাধারণ, ভাল সংসারী মানুষ; আসলে তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও খুব ওয়াকিবহাল লোক ছিলেন। অতগুলি ভাইকে মানিয়ে বাধ্য করে রাখা এবং তাসত্ত্বেও তাদের সঙ্গে সমান ভাব রাখা যেমন তেমন কথা নয়। গাবুদার ভাল নাম ছিল জ্যোতি, তবে খুব কমলোকই তাঁকে সে নামে জানত। যাকে বলে ভাঁড়ামি বা বোকা সেজে থাকা তা খুব করতে পারতেন। এমনি দেখে মনে হতো গাবুদা বিশেষ কিছু জানেন না, অথচ হেন বস্তু বা মানুষ নেই যার সম্পর্কে তিনি জানতেন না বা খবর রাখতেন না। সমরের বোন দেখতে ও কথাবার্তায় একেবারে সমরের মতো ছিল, যদিও বয়সে অনেক ছোট। বিয়ে হয় বড়ুয়া বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, তিনিও আমাদের দলে ভিড়ে গেলেন। সমর সেজ ভাই। ন' ভাই কালু সমরের ছোট, বড় হয়ে ধাতু ঢালাই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ-খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। একটু বড় হলে তাকে আমাদের আড্ডায় ভর্তি করি। সব থেকে ছোট ভাই লালু, কিন্তু সেও পরে বেশ মিশে গেল। এক হিসাবে বলতে গেলে সমরের সূত্রে আমি শুধু সমর নয়, একটি গোটা পরিবারের মধ্যে এমন একটি স্থান পেলুম যা নিজের বাড়িতে কখনও পাইনি। সে সৌভাগ্য যতদিন সমর জীবিত ছিল, অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত, ততদিন আমার অব্যাহত ছিল, এবং এখনও আছে।

বেহালার বাড়িতে এঁরা ছিলেন কেন্দ্রবিন্দুস্থল। এ ছাড়াও দুজন অনাত্মীয় ভদ্রলোক ছিলেন যাঁদের প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল এবং যাঁরা আমার জীবনে বিশেষ স্থান অধিকার করেন। একজন ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টি অভ ইণ্ডিয়ার নেতা বঙ্কিমচন্দ্র মুখুজ্যে, তিনি কৃষক ও শ্রমিক দুই বিভাগেরই নেতা ছিলেন। লম্বা, দোহারা, পুষ্ট চেহারা, মাথায় কোঁকড়া বাবরি চুল, মোটা পায়ের গোছ, শান্ত, বড় বড় টানা টানা চোখ। দেখে মনে হয় আঠারো শতকে ফ্রান্সে জন্মালে জমকালো চেহারার জোরেই রাজদূত হয়ে যেতে পারতেন। সর্বদাই মুখভর্তি পান, গলায় গমগমে আওয়াজ, চলনে বলনে ধীর, বড় মানুষি আলস্য ও জীবনভোর আরামে অভ্যস্ত ভাব। তখনকার দিনে পপুলার ফ্রন্টনীতির তত্ত্বকথা ব্যাখ্যার বিষয়ে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত। এ ছাড়া উৎসাহ ছিল চীনের লং মার্চ ও ইয়েনান-পর্ব সম্পর্কে। 'কমরেড গোলাঞ্জে'র ছাপা এডগার স্নো প্রণীত 'রেড স্টার ওভার চায়না' বইটি তিনিই প্রথম আমাকে পড়তে দেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন রাধারমণ মিত্র। ১৯২৮ সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হ'ন, পরে বিচারে খালাস পান। বাঙালীদের মধ্যে অত ভাল ও অনর্গল উর্দু বলতে আমি আর কারোকে শুনিনি।

শরীরের গড়নে, এক দৈর্ঘ্য ছাড়া, অন্য সব বিষয়ে ছিলেন বঙ্কিম মুখুজ্যের বিপরীত। রাধারমণবাবু তখনও ছিলেন যেমন রোগা, তেমনি ক্ষিপ্রস্বভাব। নাক-মুখ-চোখ দেখে মনে হতো মিশুকে বাজপাখি বিশেষ, স্বভাব ছিল ক্ষিপ্রগতি শিকারী শ্বাপদের। কথাবার্তায় যেমন তীক্ষ্ণ, তেমন তর্কে পটু, বাজে কথা সহ্য করতে মোটেই রাজি নন। দুজনেরই বাংলা উচ্চারণ ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি মিষ্টি ছিল তাঁর দানাদার গলা; বৃদ্ধ বয়সে এখন গলা একটু সরু হয়েছে এই যা তফাৎ। রাধারমণবাবুর আলোচনার বিষয় ছিল মার্ক্সীয় তত্ত্ব, বঙ্কিমবাবুর ছিল মার্ক্সীয় আন্দোলন। রাধারমণবাবু মার্ক্সীয় দর্শন সম্বন্ধে আমাকে একটি পুরো পাঠ্যতালিকা করে দেন। লেফ্‌ট্ বুক ক্লাব থেকে পরে যখন এমিল বার্ন্‌সের হ্যাণ্ডবুক অভ মার্ক্সিজ্‌ম্ বের হয়, তার সঙ্গে তাঁর তালিকার অনেক মিল ছিল। এখনও পর্যন্ত আমার প্রতি তাঁর ব্যবহার যত না শিক্ষকের তা থেকে অনেক বেশী বন্ধুর মতো। আমি যে আই-সি-এস পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি সে বিষয়ে বঙ্কিমবাবু বা রাধারমণবাবু কোনদিন কটাক্ষ করেন নি।

আগেই বলেছি বিষ্ণুবাবু তাঁর অনুচরদের খুব তদারক করতেন। আমার সাহিত্যশিক্ষার দায়িত্ব অন্যান্য গুরুরা সযত্নে পালন করেন, যেমন, ইংরেজিতে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। আই-সি-এস পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্য ও ভাষা দেব ঠিক করেছিলুম বলে সেবিষয়েও আমার গুরুর অভাব হয় নি। বিষ্ণু দে আমাদের ইওরোপীয় সঙ্গীতের রসাস্বাদে দীক্ষিত করেন, এবং সেই সঙ্গে চিত্রশাস্ত্রেও। ১৯৩৬ সালের শরৎকালে তিনি আনন্দ চাটুজ্যে লেনে যামিনী রায়ের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যান। আমি সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জগতের সঙ্গে পরিচিত হলুম, যার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। যামিনী রায় খুব সামান্যই ইংরেজি বলতে পারতেন, বুঝতে পারতেন অনেক বেশী। সাধারণত, যিনি পরিচয় করতে এসেছেন তিনি যদি বিশেষ সজাগ না থাকতেন তাহলে প্রথম আলাপে তাঁর ধারণা হওয়া বিচিত্র হতো না যদি তিনি ভাবতেন যামিনীবাবু অর্ধশিক্ষিত লোকশিল্পী, নিজের অনুশীলনের জোরে বড় হয়েছেন। অনভ্যস্ত চোখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতো ছবিগুলি অতিসরলীকৃতভাবে নির্মিত। কিন্তু 'বেঙ্গল স্কুলে'র ছবিতে মানবদেহের যে কিছুটা অস্থি-পেশীবিহীন, নেতিয়ে পড়া ভাব ও ভঙ্গী দেখা যায় তা তাঁর ছবিতে নেই, উল্টে সব মানবদেহই বেশ বলিষ্ঠ ও ঋজু। এই অনুভূতি আসে চোখে-পড়ার মতো স্পষ্ট, দ্বিধাহীন কড়া রঙে মোটা পটির ব্যবহারে, যার গণ্ডীর মধ্যে থাকে গাঢ় রঙের জমি, এবং প্রতিটি জমির রঙ আলাদা। অধিকাংশ ছবিই মেঝের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়ালে ঠেস দেয়া থাকত।

ছবির থেকে চোখ তুলে আগন্তুক যদি শিল্পীর দিকে তাকাতেন, তারপর পুনরায় ছবিতে চোখ ফিরিয়ে নিতেন, তাহলে তাঁর হঠাৎ মনে হতো চিত্র ও চিত্রকরের মধ্যে আছে একটি অদ্ভুত অখণ্ডতা ও ঐক্য : ভদ্রলোকের সিংহের মতো ঘাড় আর মাথা, শরীর স্থূল কিন্তু হাড়ালো, ঊর্ধ্বাংশ শালপ্রাংশু, মহাভুজ। চলাফেরার ধরন কিছুটা কুমোরদের মতো, যেন পা ফাঁক করে ফেলে ফেলে, মাটির উপর গড়া হাঁড়িকুঁড়ি সাবধানে বাঁচিয়ে, চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন। সমস্ত শরীর যেন বেলে পাথরে কোঁদা। তাঁর শব্দব্যবহারে আর প্রায়ই অর্ধসমাপ্ত বাক্য রচনায় অভ্যস্ত হতে আমার কয়েকদিন লেগেছিল। সাধারণ জীবনের উপমায় কথা বলতেন, শব্দ ব্যবহারে যেন গ্রামের গাছপালা ঘরবাড়ির সোঁদা গন্ধ। কিন্তু দু তিন দিন দেখা হবার পরেই মনে সন্দেহ থাকত না তিনি এমন একজন, যিনি চিন্তায় মহাজ্ঞানী অথচ কথোপকথনে যেন সাধারণ কৃষক। তিনি যখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে ভাস্কর ক্ষিতীশ রায়ের স্টুডিওতে নিজের প্রদর্শনী করলেন তখন আমার চোখে তাঁর সৃষ্টির পূর্ণ মহিমা যেন প্রতিভাত হল। এই প্রদর্শনীতেই তাঁর একটি ছবি আমি কিনি, রাজকীয় পঁচাত্তর টাকা মূল্যে। ছবিটি তখন আমাকে অত্যন্ত অভিভূত করে, এখনও করে, আমার শোবার ঘরে পায়ের দিকে টাঙানো থাকে, ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাই। ছবিটি মা আর ছেলের, রঙের ব্যবহারে মনে হয় যশোদা ও কৃষ্ণ, মায়ের মুখের ও গলার রং ফর্সা, দোলাই বাঁধা শিশুর মুখটি সবুজ। ছবিটিতে মা ও ছেলের আকৃতি এত সরল যে ইচ্ছা করলেই ছবিটিকে বহুগুণ বড় করলেও ছবিটির কোন বিকৃতি হবে না—যাকে ইংরেজিতে বলে মনুমেণ্টালিটি গুণভূষিত। ইতিমধ্যে বিষ্ণুবাবু আমাকে রজার ফ্রাই আর হার্বার্ট রীড পড়তে দেন। আজকালকার যুগ হলে পড়তুম হাউজার, কেনেথ ক্লার্ক, জন বার্জার, আণ্টাল। আমি নিজে পড়ি বুর্কহার্ট আর বেরেনসন। যামিনী রায়ের প্রতি আনুগত্য, সেই সঙ্গে 'কবিতা'য় প্রকাশিত যামিনী রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি আমার এক হিসাবে ক্ষতি করেছিল। বেঙ্গল স্কুল সম্বন্ধে আমার একটি বিরূপতা আসে, যদিও আমি এই স্কুলের মূল ছবি তখন খুব কমই দেখেছি। অর্থাৎ আমার মনের জানলা আমি ইচ্ছা করে বন্ধ করি। পরে পঞ্চাশের দশকে আমার এই বিরূপতা কিছুটা সংশোধন করেন পৃথীশ নিয়োগী। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই বিষ্ণুবাবু যামিনী রায়ের অনেকগুলি ছবি কেনেন। দেখাদেখি চঞ্চল, সমর আর আমিও দুই একটি করে কিনি। বিষ্ণুবাবুর স্ত্রী প্রণতিদি যামিনীবাবুর কাছে ছবি আঁকা শিখতে চাইলেন। যামিনীবাবু গ্রীষ্মের ছুটিতে এক রবিবার সকালে এসে চারটি বিভিন্ন শৈলীতে চারটি ছবি আঁকলেন। আমরা, অর্থাৎ বিষ্ণুবাবু, চঞ্চল, সমর আর আমি, চটপট

একটি করে চেয়ে নিলুম। প্রণতিদি, চঞ্চল আর সমরের ছবি এখনও তাদের বাড়িতে সযত্নে শোভা পাচ্ছে। আমারটি আমি আরেকজনকে উপহার দিয়েছি।

কোনদিন রাজনৈতিক আন্দোলনে রাস্তায় নামিনি। সেই হিসাবে আমি অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী মগজজীবীর মতো ১৯৩৫ সাল থেকেই ঘরে বসে রাজনীতিতে পণ্ডিত। গত পঁচিশ বছরে অনেক পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের জিগ্যেস করেছি ১৯৩৫ সালের সংবিধানের ফলে যখন ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন এল তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের এখনও কতটুকু মনে আছে। তাঁদের অনেকেরই পৃথিবীর অন্যত্র সেসময়ে কী ঘটছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট মনে আছে, কিন্তু খুব কম লোকেই বঙ্গদেশের প্রথম মন্ত্রীসভায় কে কে মন্ত্রী ছিলেন তাঁদের নাম বলতে পারেন না, এমন কি, কখন কী আন্দোলন হয়েছিল তাও নয়। বিশেষত, কিসের পর কী ঘটেছিল তার আনুপূর্বিক স্মৃতি ত নয়ই। সবচেয়ে কম মনে আছে প্রথম নির্বাচনে বিভিন্ন দলের জয়পরাজয়ের চিত্র কী রকম ছিল। নিজের কথাই বলি। আমার খুঁটিনাটি কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে দল হিসাবে কংগ্রেস পার্টি অ্যাসেম্বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও, মন্ত্রীত্ব গঠনের মতো গরিষ্ঠতা তার ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় হুকুমত অনুসারে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে অস্বীকার করে। একক পার্টি হিসাবে অন্য সকল দলের মিলিত সংখ্যার উপরে গরিষ্ঠতা না পেলে কংগ্রেস মন্ত্রীত্বে যোগ দেবে না এই ছিল নির্দেশ। এর ফলে ফজলুল হক শেষপর্যন্ত মুসলীম লীগের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হন। ১৯৩৭-৩৮ সালে গান্ধীজী দু বার কলকাতায় আসেন। প্রথমবার আসেন বঙ্গ কংগ্রেসের দলাদলি নিরসন করে সকলকে এক করতে। দ্বিতীয়বার এসে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন যাতে কংগ্রেস আর ফজলুল হকের পার্টি পরস্পর হাত মিলিয়ে সংযুক্ত সরকার গঠন করে। ইতিমধ্যে বঙ্গ কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে ফজলুল হকের বিলক্ষণ আক্কেল হয়ে গেছে, আর সেই অনুপাতে মুসলিম লীগ কত ঐক্যবদ্ধ, এবং তার সঙ্গে হাত মেলালে কী সুবিধা হবে, সে সম্বন্ধেও ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। ফলে গান্ধীজী দ্বিতীয়বারের মতো হার মানলেন। গত ষাট বছরে বাংলা কংগ্রেসের আসল চরিত্র বিশেষ কিছু যে বদলায়নি বেশ বোঝা যায়। এই সঙ্গে এটাও অকাট্য সত্য যে প্রতি নির্বাচনেই কংগ্রেসে মোট ভোট যত পড়েছে তার ত্রিশ শতাংশ ভোটের কম কোন নির্বাচনেই পায়নি।

নিজের ঘরের রাজনীতি বিষয়ে এই ধরনের ঔদাসীন্যের সঙ্গে বাঙালীর ক্রমে ক্রমে এল শিল্প, কর্মনিষ্ঠা ও উপার্জনক্ষেত্রে অনীহা। এই সময়ে বাঙালীর আরো

দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলল। একটি হচ্ছে বাঙালীর রক্তে বিনাশ্রমে অনর্জিত ধনের প্রতি ব্যাপক লিপ্সা। এটি অবশ্য জমিদারী প্রথারই দান। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলুম শিল্প ও বাণিজ্যে কায়িক বা মানসিক নিষ্ঠা ও শ্রম ঢেলে কষ্টার্জিত অর্থের প্রতি ততোধিক অনাসক্তি ও উপেক্ষা। ইতিমধ্যে বিষ্ণু ঘোষের আখড়ায় শরীর সারিয়ে, তার উপরে নাগপুরে ঘুরে এসে আমার মনে বিশ্বাস হল যে বাঙালী মধ্যবিত্ত কায়িক পরিশ্রমে সত্যিই পরাঙ্মুখ। ১৯৩৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকায় 'শেষের কবিতা'র উপরে আলোচনাটি যে এই ধরনের জ্ঞানোদয়ের ফল সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

১৯৩৬ সালের নভেম্বরে জার্মানি ও ইটালি স্পেনের ফ্রাঙ্কো শাসনকে স্বীকার করে। ফলে, স্পেনের গৃহযুদ্ধ কী নীতির লড়াই হিসাবে শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু, একই সময়ে কিরভের হত্যা ও জিনোভিয়েভের মৃত্যুদণ্ড পালনের পর কার্ল রাডেক ও অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে ১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে মস্কোয় যে বিচার শুরু হল সে-বিষয়ে কম্যুনিস্ট মহলে কোন সন্দেহের ছায়া পড়েনি। প্রথমত ১৯৩৫ সালের অগাস্ট মাসে তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল প্রস্তাবে ফ্যাশিস্ট শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সমাজবাদী পিতৃভূমি রক্ষার্থে সর্বদেশের জনগণের শক্তি ও ঐক্যের প্রতি আবেদন করে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দ্বিতীয়ত যে তড়িৎগতিতে ফ্যাশিস্ট ও নাৎসিরা একের পর একটি ইওরোপীয় দেশ দখল করতে শুরু করল, এবং ব্যাঙের ছাতার মতো যে ভাবে দেশে দেশে পঞ্চমবাহিনী মাথা তুলতে লাগল, তাতে মস্কো যে-সকল বিধান নিয়েছে সেগুলি যে সমুচিত ও অনিবার্য সে বিষয়ে অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস হল। অনেকেই আশ্বস্ত হলেন এবং মস্কোর কার্যকলাপ বৈধ বলে মেনে নিলেন। অন্যপক্ষে জার্মানরাও তাদের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করাই তাদের নিয়তি এ বিষয়ে দৃঢ়-সংকল্প হল। ১৯৩৫-৩৬ সালের বহু বছর আগে টমাস ম্যান তাঁর ম্যাজিক মাউণ্টেন উপন্যাস লেখেন। সেই উপন্যাসে হান্স্ ক্যাস্ট্রপ ও হের সেটেম্ব্রিনির কথোপকথন আমার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। এখনও অনেকের মতো আমারও একেক সময়ে মনে হয় স্টালিন যদি সে সময়ে রাশিয়াকে এক অখণ্ডসূত্রে এবং তাঁর সহকর্মীদের একমন-একপ্রাণ করে না বাঁধতেন, তাহলে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হয়ত পৃথিবীতে আরো ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনত।

১৯৩৮ সালের অক্টোবরে সুডেটেনল্যাণ্ডের পতন হয়। তার অল্প পরেই চেকোস্লোভাকিয়ার বেনেশ পদত্যাগ করেন। এর অল্প পরেই ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্ট পড়ে যায়। সময় পাবার জন্যে রাশিয়া ব্যস্ত হয়ে এমন সব চুক্তিতে বার বার

কোনটার উপরেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করা যাবে না এ কথা হয়ত সে নিজেই জানত। বৃটেন ও ফ্রান্স ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে স্পেনে ফ্রাঙ্কোর শাসন স্বীকার করে। এর পর আমেরিকাও স্পেনকে স্বীকার করে। আমি সে সময়ে আই-সি-এসের মৌখিক পরীক্ষার জন্যে দিল্লী যাব বলে তৈরি হচ্ছি। 'পরিচয়ে'র আড্ডায় ১৯৩৮ সালের শেষে মুল্‌করাজ আনন্দ যখন লণ্ডন থেকে এসে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড কী করে তৈরি এবং পাঠানো হয়েছিল তার বিবরণ দেন তখন আমাদের কী উত্তেজনা হয়েছিল তার কথা মনে আছে। মুল্‌ক্ এসেছিলেন ১৯৩৮ সালের ২৪-২৫ ডিসেম্বরে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে অল ইণ্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স কনফারেন্সে বক্তৃতা দিতে। সেই কনফারেন্স উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ফ্যাসিজ্‌মের বিরুদ্ধে একটি ওজস্বিনী বাণী পাঠান। মুল্‌ক্‌ও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগময় বক্তৃতা করেন। মায়ের অসুখের তখন বাড়াবাড়ি চলছে, ফলে আমি যেতে পারিনি। আবার সেই সময়ে দিল্লীতে লিখিত পরীক্ষায় যাবার জন্যেও তৈরি হচ্ছি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর হীরেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে দুজনে মিলে এই কন্‌ফারেন্সের সংগঠন কাজে বিশেষভাবে অগ্রণী হন।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই মায়ের অসুখের বাড়াবাড়ি হতে শুরু করে। আমি সে সময়ে মায়ের পাশে এক বিছানায় শুতুম। একদিন রাত্তিরে মায়ের গলায় ও কণ্ঠায় হাত দিয়ে দেখি গা বেশ গরম। পাছে ধরা পড়েন বোধ হয় সেই ভয়ে মা আমাকে গায়ে হাত দিতে দিতেন না। কপালে বা মুখে হাত দিলে সবসময়ে বোঝা যায় না জ্বর আছে কিনা। বাবা দুজন বড় ডাক্তার নিয়ে এলেন। দুজনেই বল্লেন এখনকার অন্ধ্রপ্রদেশের মদনাপল্লী না হয় মধ্যপ্রদেশের পেন্ড্রারোডের স্যানাটোরিয়ামে পাঠাতে। উত্তরপ্রদেশের ভাওয়ালিতে শরৎকাল থেকেই উৎকট ঠাণ্ডা পড়ে, সেখানে না পাঠানোই ভাল। তাঁর চাকরি জীবনে তখন বাবা এমন এক সংকটে ছিলেন যে ছুটি নিলে তাঁর আসন্ন উন্নতির সম্ভাবনায় ব্যাঘাত পড়ত। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আমি সুশোভনবাবুর সব লেকচার শেষ করেছি। এমন কী নতুন করে এক প্রস্থ নকল করাও শেষ করে এনেছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও অনেকখানি পড়া হয়ে গেছে। পরীক্ষার জন্যে জন্যে প্রস্তুতি কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে এসেছে বলে মনে হল। আমি বললুম মায়ের সঙ্গে মদনাপল্লী বা পেন্ড্রারোডে আমি যাব।

আমার প্রতি আভার মনোভাব অটুট ছিল, তবু তার দিদিমার মৃত্যুর পর তার পক্ষেও তার সংসারে নতুন মানসিক আশ্রয়ের প্রয়োজন হল। উপরন্তু আমার নিজের ভবিষ্যৎ যখন অত অনিশ্চিত তখন তার উপর জোর করে দাবী করা আমার

সাজে না। তার দিক থেকেও সরাসরি আমাকে মনে জোর দেয়া বা পাশে দাঁড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না। অন্য দিকে স্যানাটোরিয়ামে আমার যাবার প্রস্তাব শুনে মা তক্ষণাৎ সেটি নাকচ করে দিলেন, বললেন বাড়ি ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। তিনি যে আমার কোন বিপদ সম্ভাবনা বরদাস্ত করবেন না, মায়ের মনের এই আসল কারণটি বুঝতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। সুতরাং আমার দ্বারা ছোটখাটো শুশ্রূষা বা পরিচর্যা করা ছাড়া আর কিছু সম্ভব হল না। তাঁকে ঘড়ি ধরে সময়মত ওষুধপত্র আর পথ্য দেয়া, তাঁর ঘরে বসে নিজের পড়া করা, মাঝে মাঝে গল্প করা বা বই পড়ে শোনানো, এর বেশী আমার কিছু করার ছিল না। যেটুকু কাজ আমি সব সময়ে নিজে করতুম, সেটা হচ্ছে তাঁর স্নানের পর নিজের হাতে মোসাম্বি বা কমলালেবুর রস করে তাঁর মুখে তুলে ধরতুম। ১৯৩৮ সালের ইস্টারের ছুটিতে সমর তার বন্ধু রাম সিংহের কাছে বেড়াতে গেল। গিরিডির আগের স্টেশন মহেশমুণ্ডায় রাম সিংহের একটি ছোটখাটো জমিদারী ছিল। ফিরে এসে সমর আমাকে মহেশমুণ্ডা আর রাম সিংহের গল্প করল। জুন মাসের শেষে মা আমাকে মহেশমুণ্ডায় কয়েকদিনের জন্যে ঘুরে আসতে বললেন। আমার যে মনে মনে বিশেষ আপত্তি ছিল তা নয়। চোখের সমুখে দেখছি মা আস্তে আস্তে কিরকম শুকিয়ে যাচ্ছেন, সে অবস্থায় মার কাছে সারাক্ষণ থাকা একেক সময়ে খুব শ্বাসরোধকর মনে হতো।

জুন মাসের শেষে মহেশমুণ্ডায় গেলুম। রাম সিংহের বাড়িটিতে এককালে ওয়ারেন হেস্টিংস্ অথবা জন শোর ছিলেন বলে প্রবাদ আছে। তখনকারকালে সব সরকারি বাড়ি একই ধাঁচে তৈরি হতো। মধ্যে একটি চওড়া বড় হল ঘর, তার দুপাশে দুটি শোবার ঘর, তাদের সংলগ্ন ছোট কাপড় পরার ঘর, স্নানের ঘর। একদিকে বাড়ির চওড়া দিক—বরাবর ঢাকা বারান্দা, তার একদিক দিয়ে ছাতঢাকা গলি দিয়ে রান্না-বাড়ি যেতে হয়। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত শুনে বলেন, বাড়িটি নিশ্চয় ওয়ারেন হেস্টিংসের যুগের পরে পুনর্নির্মিত হয়, কেননা তাঁর সময়ে ঢাকা বারান্দা হতো না। রাম সিংহ ছিল আদর্শ সঙ্গী ও বোঝদার। পড়াশোনার সময়ে কখনও আমার ঘরে আসত না, পাছে আমার পড়ার ক্ষতি হয়। যখন বুঝত আমার একটু বিরতির প্রয়োজন তখনই কেবল আসত। এরই মধ্যে আমাকে নিয়ে গিরিডি আর অন্য দুয়েকটি জায়গাতেও ঘুরিয়ে এনেছিল। মা আমাকে নিশ্চিন্ত রাখার জন্যে নিয়মিত চিঠি লিখতেন, আমিও লিখতুম। কিন্তু তিন সপ্তাহ যেতে না যেতেই বাড়ির জন্যে বড় মন কেমন করতে লাগল। বাড়ি ফিরে দেখলুম মা আরো রোগা হয়ে গেছেন। আমাকে দেখে মা একেবারে ছোট শিশুর মতো খুশি। যখনই তার ঐ মুখ মনে পড়ে তখনই

মনে হয়, কী ভাগ্য, আমি এর পর ঐ বছর ডিসেম্বরের শেষে যতদিন না দিল্লী যাই ততদিন পর্যন্ত মাকে ছেড়ে একদিনও অন্য কোথাও থাকিনি।

১৯৩৮ এর সেপ্টেম্বরের শেষে মনে হল মার একটু বায়ু পরিবর্তন না হলে আর চলছে না। রোগশয্যায় শুয়ে সারা সংসার তদারক করা কম ধকল নয়। অনেক বলে কয়ে শেষ পর্যন্ত একটু হাওয়া বদলের জন্যে তাঁকে রাজি করালুম। কিন্তু মুখে রাজি হওয়া এক, আর সত্যি যাওয়া আরেক কথা। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ যাওয়া ঠিক হল, অতুলপ্রসাদ সেন রোডে একটি বাড়িও ভাড়া করা হল। বাবা মাকে আর আমাকে লক্ষ্ণৌ রেখে এলেন। কলকাতা থেকে একটি লোক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, লক্ষ্ণৌতে মায়ের জন্যে একজন আয়া রাখা হল। এখন মনে হলে গা কেঁপে ওঠে, ঐ বিদেশে অচেনা পরিবেশে মাকে নিয়ে একা থাকার মতো নির্বুদ্ধিতা আর কিছু হতে পারত না। না ছিল চেনাশোনা ডাক্তার, না ছিল লোকবল বা আত্মীয়-স্বজন। ভাগ্যক্রমে যে কদিন ছিলেন, লক্ষ্ণৌতে জলহাওয়ার গুণে মা ভাল থাকলেন।

তবে ঐ ছয় সপ্তাহের স্মৃতি এখনও আমার মনে তৃপ্তি দেয়। প্রথমত আমি মাকে নিয়ে একা থাকতে পেয়েছিলুম। তিনি আমাকে বলিয়ে নিয়েছিলেন যে আমি প্রতিদিন বিকেলে অন্তত দু ঘণ্টা বাড়ির বাইরে ঘুরে আসব। লক্ষ্ণৌতে প্রতিদিন আমি এই সময়টুকুর পুরো সদ্ব্যবহার করেছি। কলকাতায় সুশোভনবাবুর বাড়িতে শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তা ছাড়া 'পরিচয়ে'র আড্ডায়। তাঁর ঠিকানা খুঁজে বের করলুম। তখন তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস সরকারের প্রধান তথ্য ও সংযোগের সচিবের কাজ করছিলেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতায় তাঁর নিজের বাড়িতে থাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয় পল্লীটি ছিল গোমতী নদীর উত্তর পাড়ে। সমস্ত এলাকাটি ছিল স্তব্ধ ও শান্তিপূর্ণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার কথা ভেবে আমার মাঝে মাঝে ঈর্ষা হতো, যেমন হট্টগোল, তেমনি শহরের ভীড়। ধূর্জটিবাবু মনে হল মাস্টার হয়েই জন্মেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছায়াদি ছেলে কুমারকে নিয়ে তখন কলকাতায় ছিলেন। সারা বাড়িটি ছিল তাঁর ছাত্রদের আড্ডাখানা। আমার উপর আদেশ হল প্রতিদিন বিকেলে ওঁর বাড়ি যেতে। ধূর্জটিবাবু অফিস থেকে ফেরার পথে আমাকে ওঁর গাড়িতে তুলে নিতেন। এই সময়ে তাঁর বাড়িতে যাঁরা ঘনঘন আসতেন তাঁদের চারজনকে পরে আবার পেয়েছি, একজন ঘমণ্ডীলাল (পরে বন্‌সাল পদবী নেন), ছবি আঁকতেন, ১৯৪২ সালে অগাস্ট আন্দোলনে জড়িত হন। বড় হয়ে ১৯৫২ সালে এম-পি হন এবং ১৯৫৮ সালে ফেডারেশন অভ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির

সেক্রেটারি-জেনরল হন। দ্বিতীয়, অমিতাভ সেন, ডাকনাম খুচু, পরে সমরের বন্ধু হন, তারও পরে খড়গ্‌ভাসলায় পড়াতেন। তৃতীয় ও চতুর্থ, দুই ভাই শফি ও কে-এ নাকৃভি। শফিকে আমি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী হিসাবে পাই। কে-এ দিল্লী স্কুল অভ ইকনমিক্সে পড়াতেন। পরে গল্প শুনি একজন নাকৃভিকে ধূর্জটিবাবু একবার তাঁর বাড়ির একটি ঘরে বাইরে থেকে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে দুদিন রেখে দিয়েছিলেন, যতক্ষণ না সে এঙ্গেলসের 'অরিজিন অভ দি ফ্যামিলি' বইটি পড়ে শেষ করে। প্রায় প্রতিদিনই ধূর্জটিবাবুর বাড়িতে মেইন, মর্গ্যান ও এঙ্গেল্‌স নিয়ে আমাদের তর্ক শুরু হতো, তর্কের শেষ হতো যখন রুমালি রুটি আর কাবাব আসত। রুমালি রুটির ময়দা দুধ দিয়ে মাখা হতো। কাবাবের মাংস সকাল থেকে টক সর ও ঘন দুধ দিয়ে মাখিয়ে রাখা হতো, খাবার সময়ে সেঁকা সেঁকা ভেজে দিত।

ধূর্জটিবাবু লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে সঙ্গীত কলেজের একজন প্রায় আদি সভ্য ছিলেন। দেখতে ছিলেন সুপুরুষ, নাক চোখ মুখ অতি তীক্ষ্ণ, খুব উঁচু কপাল। রোগা বলে আরো তীক্ষ্ণ মনে হতো, প্রায় ভল্‌টেয়ারের মতো। চেহারা আরো চোখে পড়ার মতো হতো যখন তিনি লক্ষ্ণৌ চিকণের সাদা ধবধবে ইউ-পি কুর্তাপাঞ্জাবি পরতেন এবং মস্ত টাক মাথায় একই লক্ষ্ণৌ চিকণের কাজ করা লক্ষ্ণৌ-টুপি পরতেন। তখন একেবারে বনেদী খানদানি, মুসলমান বংশের মনে হতো। উর্দু বলতে ভালবাসতেন, কতদূর চোস্ত হতো তা জানি না। আমার চেনাশোনার মধ্যে রাধারমণ মিত্রই একমাত্র অত্যন্ত ভাল উর্দু বলতে পারতেন। আমাকে আমিনাবাগে, হজরৎগঞ্জে এবং অন্যান্য পাড়ায় এমন সব স্থানে নিয়ে যেতেন যার খবর শুধু লক্ষ্ণৌরাই রাখত। স্থূল আহারের থেকে উনি কথার উপরেই প্রাণধারণ করতেন মনে হয়।

নভেম্বরের মাঝামাঝি বাবা লক্ষ্ণৌ এসে আমাদের কলকাতায় নিয়ে গেলেন। ফেরার পর মার শরীর আরো দ্রুতগতিতে খারাপের দিকে গেল। এইসব এবং আরো অন্যান্য কারণে সামনের জানুয়ারি মাসে আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার সংকল্প খুব ক্ষীণ হয়ে গেল। যে-সব বিবরণ এতক্ষণ ধরে দিলুম তাতে পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার পরীক্ষার প্রস্তুতি কী পর্যায়ে চলছিল; এই প্রস্তুতি নিয়ে অন্তত আই-সি-এস পরীক্ষায় বসা যায় না। আমার এখনও বিশ্বাস আমার মা আমার পাশের জন্তে দায়ী। আমার চোখের সামনে দেখলুম মার কী রকম তাড়াতাড়ি ছোট্ট খুকির আকার হয়ে গেল, হাত পা গুলি সরু পাটকাঠির মতো হল। যে-মায়ের গায়ে কোন দিন রোম দেখিনি, সেখানে, বিশেষত পায়ের হাড়ের কাছে

শক্ত কালো রোম দেখা দিল। আমার খুবই মন খারাপ হয়ে গেল। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি একদিন মাকে বললুম আমি সমুখের জানুয়ারিতে পরীক্ষা দেব না ভাবছি। মা তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, না, জানুয়ারি মাসে দিতেই হবে, পরীক্ষা সব খুব ভালভাবে হবে, উনি তখন খুব ভাল থাকবেন। দিল্লী যাবার আগের দিন অর্থাৎ ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রে শোবার আগে মাকে দুধ দিতে গেছি, মা বালিশ থেকে মাথা তুলে আমাকে জড়িয়ে ধরে গলগল করে বিব্রত স্বরে অনেক ভাল কথা বলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল, ভয় হল ফিরে এসে হয়ত দেখতে পাব না।

তখনকার কালে জানুয়ারি মাসে দিল্লীতে ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ত। পরীক্ষার দিনগুলিতে ভোরে বাতাসের তাপ শূন্যের নিচে চলে যেত, ঘাসের উপর পুরু শিশির জমে বরফ হয়ে থাকত। কলকাতায় তখন সচরাচর প্যাণ্ট পরার চলন ছিল না, প্রায় অধিকাংশ ছাত্রেরই কাপড়-জামা বলতে থাকত তিন প্রস্থ ধুতি আর পাঞ্জাবি। তাছাড়া শীতকালের জন্যে একটি ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি বা দুপাশে দুই পকেটওলা শার্ট এবং কলেবোনা পশমের একটি গরম শাল, যাকে বলত র‍্যাপার। আমি নিজের পাঞ্জাবি আর ধুতি রোজ ধুয়ে, ঝেড়ে, টেনে, জলের কুঁচি ছাড়িয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দিতুম, শুকিয়ে গেলে, বিকালে এসে পাট করে রেখে পরের দিন পরতুম। ফলে সাধারণ ইস্ত্রির প্রয়োজন হতো না, আর হাওয়ায় ত এখনকার মতো তেলকালি থাকত না যে তাড়াতাড়ি ময়লা হবে। এই সংকটের সময়ে দিল্লীর জন্যে আমার নতুন করে জামা-কাপড় করাতে ভাল লাগল না। আমি বাবার খুব পুরু বিলেতি ডোনেগল টুইডের প্যাণ্ট, ঐ কাপড়ের ভারি ওভারকোট আর গলায় জড়াবার মোটা পশমের স্কার্ফ নিলুম। বাবার কোমরের মাপ ছিল ৪৪ ইঞ্চি, আর আমার ২৮ ইঞ্চি। প্যাণ্ট পরার জন্যে আমাকে তিনি তাঁর সাসপেণ্ডারটি দিলেন। আমি সেটি লাগিয়ে বাবার প্যাণ্ট টেনে প্রায় বগল পর্যন্ত তুললুম, ডোঙ্গেরির মতো, তার মধ্যে পুরে দিলুম আমার গরম মোটা পাঞ্জাবি। তা সত্ত্বেও প্যাণ্টের পিছনটি আমার পাছার থেকে পুরো ছয় ইঞ্চি ঝুলে রইল। তবে এটা ঠিক যে এই পোশাকের উপর মায়ের বোনা পুলোভারটি পরে তার উপর বাবার ওভার কোট চড়ালে শীত তাড়িয়ে শরীর গরম রাখার কোন সমস্যা থাকল না। দেখতে হয়ত একটু কিম্ভূতকিমাকার মনে হতো। কিন্তু লেখার পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে জন্তু দেখাচ্ছে কি কন্দর্প দেখাচ্ছে কী আসে যায়! দিল্লীর শীত তাড়ানো নিয়ে কথা।

দিল্লীতে গিয়ে মামাবাবুর বন্ধু শ্রীঅমূল্যধন দত্তর কাছে ২৭নং আরউইন রোডে গিয়ে উঠলুম। আমাকে উনি অত শীতের রাতে নিজে স্টেশনে এসে নামিয়ে বাড়িতে

নিয়ে গেলেন। ৩১শে ডিসেম্বর দুপুরে আমি নতুন দিল্লী থেকে টীমারপুরের বাসে করে পুরনো দিল্লীস্থিত মেটকাফ হাউসে গেলুম, আমার সীট কোন ঘরে পড়েছে দেখতে। সেইটেই ছিল আমাদের পরীক্ষাকেন্দ্র। ঘরটি দেখে আমি ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজের ফুটপাথে এসে ফিরতি বাসের জন্যে অপেক্ষা করছি, দেখি সাহেবীঘরের তৈরি দামী দামী স্যুট পরে অতি সুদর্শন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোকরা আমার মতো বাসের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি ভাবলুম নিশ্চয় বড় সরকারি চাকুরে। ও হরি, ২রা জানুয়ারি সকালে মেটকাফ হাউসে গিয়ে দেখি সেই ভদ্রলোকরাই পরীক্ষা দিতে হাজির। পোশাক দেখে দমে গিয়ে আত্মবিশ্বাস চলে যায় আর কি! বেশ খানিকক্ষণ লাগল নিজেকে ধমকিয়ে সাহস ফিরিয়ে আনতে।

যতদিন পরীক্ষার জন্যে ছিলুম, অমূল্যমামা আর মামীমা আমাকে যেন তুলোর বাক্সয় শিশুকে যেমন রাখে তেমনি সযত্নে রেখেছিলেন। প্রতিদিন ভোর চারটের সময়ে উঠে আমার বিছানার সমুখে একটি ইলেক্‌ট্রিক হীটার জ্বালিয়ে আমাকে তুলে দিতেন, যাতে আমি উঠে শেষবারের মতো বইপত্র বিছানায় বসেই দেখে নিতে পারি। দুপুরবেলা কী খাব সে-সব মামীমা অতি যত্নে প্যাক করে দিতেন। কলকাতা থেকে একদিন অন্তর বাবার চিঠি আসত মায়ের খবর দিয়ে, যাতে আমার মন শান্ত থাকে। ১৫ই জানুয়ারি আমার পরীক্ষা শেষ হয়। ১৩ই ভোরবেলা হঠাৎ রাত তিনটের সময়ে এক স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল, স্বপ্নের মাথামুণ্ডু নেই অথচ অস্বস্তিকর। সতেরো তারিখে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল তখন দেখি মামাবাবু আর বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। মামাবাবুকে দেখে বুঝলুম, মা আর নেই। উনি ১৩ তারিখে ভোরবেলা মারা যান।

এতদিন গুলুর আমি কোন যত্ন নিইনি খেয়াল হওয়ায় আমার খারাপ লাগল। তার প্রতি এতদিন শুধু দাদাগিরি ফলিয়েছি, আমার কোন কর্তব্য করিনি। এখন তাকে কাছে টেনে নিলুম। মায়ের শেষকৃত্য সুষ্ঠুভাবে হল।

মায়ের মৃত্যুতে আমি যেন হঠাৎ নোঙরছেঁড়া হয়ে গেলুম। সারাদিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভাগ করা কর্তব্য বলে কিছু নেই, বিশেষত গুলু যতক্ষণ স্কুলে থাকত। বই খাতা পত্তর তাক থেকে পেড়ে, ধুলো ঝেড়ে আবার পড়া শুরু করতে বেশ কয়েকদিন লাগল, কারণ যে পরীক্ষা দিয়েছি তার উপর ত ভরসা করা যায় না, কিছুই হবে না জানতুম। মার্চ মাসে হঠাৎ একটি সীলমোহর করা চিঠি এল, দিল্লীতে আমাকে মৌখিক পরীক্ষায় তলব করে। মনে একটু সাহস এল, যাক তাহলে একেবারে খারাপ হয়নি। চৌরঙ্গী টেলার্স বলে একটি দোকান ছিল, তার দর্জি ছিলেন বিরাট পাহাড়ের মতো চেহারার ম্যাকডাফ বলে এক ভদ্রলোক।

তিনি আমাকে একটি পাম বীচের স্যুট করে দিলেন। সেই স্যুট নিয়ে বাবার সঙ্গে দিল্লী গেলুম। মৌখিক পরীক্ষা খুব ভাল হল বলে মনে হল না। আসছে বছর আবার পরীক্ষা দিতে হবে এই চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে আছি, এমন সময়ে মে মাসে আরেকটি রেজেস্ট্রি চিঠি এল, তাতে লেখা আছে আমি আই-সি-এস-এ নির্বাচিত হয়েছি, সেপ্টেম্বরে শিক্ষানবিশীর জন্যে ইংল্যাণ্ডে যেতে হবে। পরের দিন সকালে খবরের কাগজে আমার নাম বের হল, আমি আই-সি-এস পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছি। যখন সব পরীক্ষার্থীর মার্কশীট বই এল, দেখি প্রথম যে হয়েছে তার থেকে আমি সবকটি লিখিত পরীক্ষা মিলিয়ে ১৩০ মার্ক বেশী পেয়েছি, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় ফেল হতে হতে বেঁচে গিয়েছি, মাত্র ১২০ মার্ক পেয়েছি আর যে সব মিলিয়ে প্রথম হয়েছে সে পেয়েছে ২৬০ মার্ক। মৌখিক পরীক্ষায় ১০০র কম মার্ক পেলে আর পাশ করা হতো না। মায়ের কথা খুব মনে হল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল তিনিই আমাকে পাশ করিয়ে দিয়েছেন, বেঁচে থাকলে মনে কত আনন্দ হতো, অথচ মুখে কোন আতিশয্য প্রকাশ হতো না। শুধু ঠোঁটে সামান্য হাসির আভাস ফুটে উঠত, বলতেন, প্রথম হলে ভাল হতো, মহারানী গার্লস্ স্কুলের ননীবালা আগেই খোকার আখের নষ্ট করে দিয়েছে।

আভার দিদিমা ১৯৩৭ সালে মারা যাবার পর দাদামশাইয়ের সংসারের ভার আভার উপরেই পড়ে। ফলে তার স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করে। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে এম-এস-সি কোর্স শেষ করল বটে, কিন্তু পরীক্ষা দেয়া হল না। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে আভা বর্ধমানে বাপের বাড়ি চলে গেল। ঠিক এই সময়ে হল আমার মায়ের অসুখের বাড়াবাড়ি, অতএব মনে সাহস আনার জন্যে তাকে আমার সবথেকে বেশী প্রয়োজন। কিন্তু উপায় ছিল না। ১৯৩৯ সালের মে মাসে যখন আই-সি-এস পরীক্ষায় খবর এল তখন তাকে লিখলুম। ইতিমধ্যে সরকারের শিক্ষা বিভাগে চাকরির জন্য দরখাস্তের ফলে তার কাছে মৌখিক পরীক্ষার চিঠি এসেছে। সেই পরীক্ষার উপলক্ষ্য করে কয়েকদিনের মধ্যে আভা কলকাতায় এল। পরের তিন চার সপ্তাহে, অর্থাৎ তার বর্ধমানে ফিরে যাবার আগে পর্যন্ত তার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হল। মৌখিক পরীক্ষার নির্বাচকরা তাকে বি-টি (এখনকার বি-এড) পড়তে বললেন, তাহলে চাকরিতে তার উন্নতি হবে, এবং অ্যাসিসট্যাণ্ট ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস অভ স্কুলস্ হতে পারবে। আমি ইংল্যাণ্ড রওনা হবার আগে আভা বি-টি পড়ার জন্যে আবার কলকাতায় ফিরে এল, তখন আরো কয়েকবার দেখা হল।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিষ্ণুবাবু সুধীন্দ্রনাথ দত্তর অনূদিত ইয়েট্‌সের

রেসারেকশন নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তাব করলেন। আমাদের দিন তখন বেশ বড় হয়েছে, মহড়া শুরু হল। সকলেরই নিজের নিজের ক্ষেত্রে তখন বেশ নাম হয়েছে, তবে কারোরই থিয়েটারের অভিজ্ঞতা ছিল না। যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম প্রণতিদি আমাকে পরে দেন : বিষ্ণু দে, প্রণতি দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রথীন মৈত্র, বেবী গুপ্ত, চঞ্চল, সমর, কামাক্ষীপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব মিত্র, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল। আরো কয়েকজন ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র সব গানে সুর দেন, রথীন আর প্রাণকৃষ্ণ মঞ্চের সেটগুলি তৈরি করেন। আমরা রোজ ৫নং এস-আর-দাশ রোডে জ্যোতিরিন্দ্রের বাড়িতে জমায়েত হতুম। একদিন বেশ শীত পড়েছে। বিষ্ণুবাবু আর বটুকদা ছোট ছোট ওষুধ খাবার পাত্রে গাঢ় কমলালেবুর রস খেতে দিলেন। বললেন গলা ভাল হবে। কোন কিছু সন্দেহ না করে কমলালেবুর রস সকলে এক চুমুকে শেষ ; গলায় আর বুকে যেন আগুন নেমে গেল। রসটি ছিল কড়া কুরাসাও মদ, খাঁটি ব্র্যাণ্ডির চেয়েও কড়া। এই থেকে শুরু হল পরের কিছু কিছু মহড়ায় এই ধরনের জলচিকিৎসা। জলচিকিৎসার দিন এলে সকলেরই রিহার্সালে উৎসাহ হতো। প্রণতিদির 'মাতলামি'তে আপত্তি ছিল, কিন্তু সে অবস্থায় পৌঁছবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, প্রত্যেকে পেতুম বড়জোর ছোট চামচের দুই কি তিন চামচ। তাতেই আমরা কেউ কেউ হেলে হেলে দেখতুম মাতাল হয়েছি কি না। যে কোন কাজের উদ্দেশ্যে সময় মতো জলচিকিৎসার আয়োজন লোকজনকে একত্র আনতে যে কী কাজে দেয় তা তখন থেকেই আমার জানা হয়েছে, কাজের ফলাফল যাই হোক না কেন। নাটক মঞ্চস্থ করার গর্ভবাস হয়েছিল হাতিদের মতো আঠারো মাস। মঞ্চস্থ হয় ১৯৪০ সালে, তখন আমি ইংল্যাণ্ডে। সব কাগজেই খুব প্রশংসা হয়েছিল।

১৯৩৯ সালে জুন-জুলাই সকলেই বেশ গা ঢেলে কাটাচ্ছি। সমর তখনও কাঁথিতে চাকরি নেয়নি, পি-এইচ-ডির নাম করে মোটা স্কলারশিপ নিয়ে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে। শেয়ারবাজারে চঞ্চলের ভালই রোজগার হচ্ছে। আমি আই-সি-এস-এ নির্বাচিত হয়েছি, কিন্তু একপয়সাও রোজগার নেই। বিষ্ণুবাবু আর প্রণতিদি চিরাচরিত তুষ্ণীভাবধারণ করে বিরাজমান। এই অবস্থায় চঞ্চল, সমর আর আমি প্রতিদিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঠিক দুটোর সময়ে বিষ্ণুবাবুর ১৯নং গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তুম। তখন থেকে সারা দুপুর, যতক্ষণ না বেলা গড়িয়ে যায়, চলত হ্যাণ্ডেল, বাখ, হাইডেন এবং বেঠোফেনের বাজনা। প্রথম প্রথম বেশ কয়েক রকম খাবার সাজিয়ে প্রণতিদির চা-পর্ব হতো। রেকাবি ভর্তি খাবার, ফুরোলে খাবার আসত। 'প্লেয়ার্স নং ৩' মার্কা পঞ্চাশটি বিলেতী

সিগারেটের সীলকরা টিন তখন এগারো আনায় পাওয়া যেত। দিনে এক টিন শেষ করে তবে যে যার বাড়ি ফিরতুম। যখন আড্ডা শেষ হতো তখন খাবারের গন্ধে আর সিগারেটের ধোঁয়ায় বিষ্ণুবাবুর বসার ঘর হতো ভরপুর। প্রথমে বন্ধ হল খাবার। তার কিছুদিন পরে বন্ধ হল সিগারেট। চঞ্চল, সমর আর আমার মেজাজ ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। সামান্য কারণে তর্ক শেষ হতো বাগবিতণ্ডা আর ঝগড়ায়। অবশেষে সকলে হার মেনে ক্ষান্ত হলুম। বিষ্ণুবাবু আর প্রণতিদি কিন্তু নির্বিকার, মুখে স্নিগ্ধ, অমল প্রশান্তি। ওঁর বাড়ির পাট উঠিয়ে আমরা কয়েকদিন বুদ্ধদেববাবুর বাড়ির গেলুম। সেখানে আলোচনা মাঝে মাঝে একটু গুরু গম্ভীর হতো তাই ঠিক জমল না, কারণ পরনিন্দা চলত না। বিষ্ণুবাবু, সমর, সুভাষ আর চঞ্চলের কবিতার পক্ষে ১৯৩৯ সাল ছিল যাকে বলা যায় স্বর্ণযুগ, হিন্দীতে গোলাবী মৌসুম। সে-বছরে এঁরা অনেক কবিতা লেখেন যার আয়ু এ শতাব্দী পেরিয়ে যাবে।

আই-সি-এস পাশ করার জন্যে বন্ধুদের একটি খাওয়া পাওনা হল। সে-সময়ে আমারই কেবল রোজগার ছিল না। বাবা আমার স্কলারশিপের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতেন, তার বদলে বুক কোম্পানী থেকে যথেচ্ছ বই কিনতে পারতুম বলে আমার কিছু বলার ছিল না। নিরুপায় হয়ে বাবার আলমারির দেরাজ থেকে আমি মাঝে মাঝে তাঁকে আগে থেকে না বলে অল্প কিছু টাকা নিতুম। ভেবে-ছিলুম, বাবা ত বুঝতেই পারবেন, দু-পাঁচ টাকার জন্যে মুখ ফুটে বলতেও বাধত। কিন্তু খাওয়াতে গেলে একটু বেশী টাকা দরকার, তা ছাড়া আভা কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে একটু খরচও হত। অগত্যা আমার ইতিহাসের নোটগুলি আরেকটি ছেলেকে ধার দিলুম, একশ টাকা নিয়ে, যা নাকি সুশোভনবাবু বিনা পয়সায় বহুদিন পরিশ্রম করে আমাকে স্নেহের দান হিসাবে দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে পাঁচ কোর্সের বিরাট লাঞ্চ মাত্র দেড় টাকায়। পেলিটি বা ফারপোতে তিন কোর্সের লাঞ্চ দিত এক টাকা চার আনায়। সুভাষ কলকাতায় ছিল না। বিষ্ণুবাবু আসতে রাজি হলেন না; আমার সন্দেহ হয়েছিল তিনি কাঁটা চামচে ধরে খাওয়ার থিয়োরিতে যত পোক্ত ছিলেন, প্র্যাকটিসে তত ছিলেন না, যথার্থ ভারতীয় সাম্যবাদীর মতো। চঞ্চল, সমর, কামাক্ষী, দেবী আর আমি, শেষ পর্যন্ত এই পাঁচ জন, জুলাই মাসে একদিন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে একটি গোল টেবিল ঘিরে বসলুম। মৌলানার মত লম্বা দাড়িসহ বিরাটদেহ একজন বাটলার সঙ্গে উর্দিপরা উড়িয়া বেয়ারাদের নিয়ে আমাদের খিদমত করতে এল। প্রত্যেকের পরণে ধবধবে সাদা উর্দি, কনুই পর্যন্ত সাদা লম্বা দস্তানা, বুকে ঝকমকে

পালিশকরা পিতলের হোটেলের মনোগ্রাম করা ব্যাজ, গম্ভীর নির্বিকার মুখ, ক্ষিপ্র চলনবলন। সমস্ত কিছুতেই আমরা অনভ্যস্ত। বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। সুরুয়া কোর্সটি নিয়ে বিশেষ সমস্যা হলনা, সপসপ শব্দ না করে চামচ দিয়ে কোনরকমে শেষ হল। তারপর এল স্মোক্‌ট্‌ হিল্‌সা—বা মুড়ির ধোঁয়াগন্ধ-করা সেকা ইলিশ—তার সঙ্গে চোখ জুড়নো সবুজ মটরশুঁটি সেদ্ধ আর সরু সরু ফোলা আলু ভাজা। সঙ্গে টার্টার সস। চঞ্চল সব্জি নিলনা, বলল সব্জি খায়না, অথচ তাকে আমি তার নিজের বাড়িতে এত এত সব্জি খেতে স্বচক্ষে দেখেছি। যাই হোক চঞ্চল দুগ্রাসেই দুটুকরো বড় মাছ শেষ করল। আমরা বাকি চারজন কাঁটা দিয়ে কসরৎ করতে করতে সব্জি খাবার চেষ্টা করতে গিয়ে অনেকক্ষণ কাটালুম। কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে মটরশুটির দানা মুখে তুলতে গিয়ে বেশ কিছু দানা বন্দুকের ছর্‌রার মতো এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল। যেন দেখতে পায়নি এমন ভাব নিয়ে বেয়ারাগুলি অন্যদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যখন প্রধান পদটি অর্থাৎ মাংস এল তখন আমাদের খাবার ইচ্ছে প্রায় উবে গেছে, পাছে মাংসের সঙ্গে আবার সব্জি নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে হয়। সে-পর্ব কোনরকমে শেষ করে আমরা বেশ স্বস্তিভরে চামচ দিয়ে আইসক্রীম সেবন করলুম। তার পর কফি পান। কী করে সভ্য-ভাবে গা ঢেলে কফি খেতে হয় তার বিবরণ ত হেনরি জেম্‌সের নভেলে পড়েইছি। তখন রেওয়াজ ছিল পাঁচজনের লাঞ্চের জন্যে পাঁচ দেড়ে সাড়ে সাতটাকার বিল হলে, বিলের প্লেটের উপর একটি দশ টাকার নোট রাখা। তারপর বাটলার বিল শোধ করে, ভাঙানি নিয়ে এলে, বিলের তলায় দেড়টাকা বকশিস গুঁজে রেখে, বাকি একটি টাকা হাতে নিয়ে ওঠা। বেয়ারাদের তার বেশী হারে বকশিস দিলে বনেদিয়ানার অভাব প্রকাশ পায়, হঠাৎ-নবাবির মতো দেখায়। আমি ত দশ টাকার নোটটি ঠিকই দিলুম, কিন্তু যেভাবে সবাই খেলুম, তার পরে, পাছে বাটলারের চোখের সঙ্গে চোখ মেলাতে হয় এই ভয়ে সে ফিরে আসার আগে আমরা অন্তর্ধান করলুম। ফিরে এসে আমাদের না দেখে বাটলার নিশ্চয় আমাদের বাঙ্গাল ভেবে একচোট হেসেছিল।

কোন কিছু পদ পেলে সঙ্গে সঙ্গে অভব্যতা আর ঔদ্ধত্য আসে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ; অনেক সময়ে পদ পাবার নামেই আসে। একদিন সন্ধ্যাবেলা চঞ্চল, সমর আর আমি চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে কার্জন পার্কে সিগারেট খেতে গেলুম। কাছেই একটা ঝোপ দেখে, তার আড়ালে কর্তব্য করতে গেছি, মোটেই বুঝতে পারিনি একজন সেয়ানা পুলিশ ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে, জানে কোন না কোন সময়ে সেখানে শিকার আসবেই। কাজ শুরু করতে যাচ্ছি এমন সময়ে

পুলিশ হাঁক দিয়ে পাঁচ আইনের হুমকি দিতে দিতে এগিয়ে এল। দশ বছর পরে একমাত্র পাশকরা আই-সি-এস শিক্ষানবীশ সামান্য প্রাকৃতিক কাজে বাধা পেয়ে পুলিশকে সমঝিয়ে দেবার জন্যে আত্মপরিচয় দেয় আর কি, কিন্তু তখনই জ্ঞানোদয় হওয়ায় নিরস্ত হল। পরের দিন খবরের কাগজে কথাটি যদি প্রকাশ হয়। পুলিশকে মিষ্টি কথা বলে নিরস্ত করে ফিরে গিয়ে দেখি সমর আর চঞ্চল, হাঁকডাক শুনে, ইতিমধ্যে আবার চৌরঙ্গীর উল্টো ফুটপাথে পালিয়ে গিয়ে তত্ত্বালোচনার ভান করছে।

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসের পরে অনেক কিছু দ্রুত ঘটতে শুরু করল। উইন্স্টন চার্চিল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক চুক্তির জন্যে আগ্রহ দেখালেন। অগাস্টের প্রথমেই একটি বৃটিশ মিলিটারি মিশন মস্কোতে গেল। কিন্তু তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন জার্মান-সোভিয়েট বাণিজ্য চুক্তি সই হল, আর তার পাঁচদিন পরেই এল জার্মান-সোভিয়েট পরস্পর আক্রমণ-বিরোধী চুক্তি। ৩১শে অগাস্ট বৃটেনে সাধারণ আদেশ জারি হল, লণ্ডন থেকে ছোট ছেলেমেয়ে ও মহিলাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ২রা সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডে আদেশ জারি হল ১৯ থেকে ৪১ বছর বয়স্ক সুস্থদেহ পুরুষকে পল্টনে যোগ দেবার জন্যে সই করতে হবে। ১৯৩৯-এর ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

প্রথম কয়েকদিন অনিশ্চিত অবস্থা গেল, বিলেত যাওয়া হবে কি না। শেষে ১০ই সেপ্টেম্বর চিঠি এল আমাকে বম্বে যেতে হবে, সেখানে পি এণ্ড ও জাহাজ স্ট্রাথনেভারে উঠতে হবে। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল কলকাতা থেকে তখনকার দিনের ব্লু-মেলে চড়ে বম্বে যাব। যুদ্ধের আগে প্রতি বৃহস্পতিবার ইংলণ্ডযাত্রীরা, যারা ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনত, তারা ব্লু-মেলে চড়ে শনিবার বম্বে পৌঁছে, রবিবার জাহাজে চড়ত। যুদ্ধঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়সঙ্কোচের দোহাই দিয়ে ব্লু-মেল চলাচল বন্ধ করে দেয়া হল। বাবা, রাঙ্গামামা, মামাবাবু, গুলু আর আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে হাওড়ায় উঠিয়ে দিলেন।

বম্বেতে আগে থেকে কোথাও থাকার ঠিক করিনি। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে একটি হোটেলের লোক আমাকে ফ্লোরা ফাউণ্টেনের উপর একটা ছোট গোয়ানিজ হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলল। তার আগে কোন দিন হোটেলে থাকিনি, বইতে শুধু বড় বড় হোটেলের কথা পড়েছি। ধারণা ছিল, স্নান করলেই তোয়ালে বদলে দেবে, তাছাড়া, দুদিন ট্রেনে আসার ফলে মাথা আর গায়ে কয়লার ধোঁয়া আর কালিও লেগেছিল বিস্তর। ম্যানেজার আমার আবদার শুনে তখনই ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে, উপরন্তু আমাকে ভড়কে দেবার জন্যে বলল, 'জানো, তোমাকে

আমি কাল রাতে গরুর মাংস খাইয়েছি!' আমি বললুম, 'তাতে কি হয়েছে, মাংসটা তত ভাল সেদ্ধ হয়নি, এই ত! কিন্তু তার সঙ্গে নতুন তোয়ালের সম্পর্কটা কি?' আই-সি-এস-এ মৌখিক পরীক্ষার দুর্গতির পর মাত্র কয়েকমাসে চটপট মুখে ইংরেজি ফুটছে দেখে বুকে বেশ ভরসা এল। হোটেলে দিনে কত খরচ পড়বে জিগ্যেস করার আগেই—বলা বাহুল্য আমার হাতে যথেচ্ছ খরচ করার টাকা ছিল না—ম্যানেজার বলল আমার মত বড়লোককে তার মতো গরীব হোটেলে রাখতে সে অক্ষম! আমি যখন বললুম আমি বম্বের হালচাল কিছু জানি না, তখনকার মতো একটি জায়গা বাতলে দিতে, তখন সে আমাকে পাশেই বড় ওয়াই-এম-সি-এর কথা বলল, এবং সেখানে যাবার জন্যে একটি গাড়ি ডেকে দিল। ফ্লোরা ফাউন্টেনের উপর ওয়াই-এম-সি-এ বাড়িটি ছিল বেশ বড়, দেখে ভাল লাগে, ভিতরেও অনেক থাকবার ঘর, লোকজনের ব্যবহারও ভদ্র। থাকা খাওয়া নিয়ে খরচও যৎসামান্য। সব থেকে লাভ হল, খাবার ঘরে মিস্টার ডা'ভিলা বলে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। চাকরি শেষ করে, অবসর নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন। তিনি খুব যত্ন করে গল্পচ্ছলে আস্তে আস্তে আমাকে অনেক কিছু শেখালেন! কোন্ ধরনের খাবার কেমন করে খেতে হয়, কাঁটা, ছুরি, চামচ, কেমনভাবে কী করে ধরতে হয়, মুখে পুরতে হয়, নামাতে হয়, কী করে চিবোতে হয়, খাওয়া শেষ হলে কাঁটা ছুরি চামচ কী করে একত্র করে প্লেটে রাখতে হয়, যাতে বেয়ারা বোঝে খাওয়া শেষ হয়েছে বা হয়নি; কী করে প্লেটটি টেবিলে বুকের কাছে টেনে নিয়ে খেতে হয়, যাতে প্লেটের ঠিক উপরে মুখটি থাকে, অসাবধানে মুখ থেকে যদি খাবার পড়ে যায়, তাহলে যেন প্লেটের উপর পড়ে। কী করে টেবিলে সোজা হয়ে বসতে হয়, টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিতে নেই, কনুই দুটি সবসময়ে যতখানি সম্ভব বুকের দুপাশে লাগিয়ে রাখতে হয়, ইত্যাদি। আমার শেখার ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল, বোধ হয় চটপট শিখলুমও ভাল। সেই সঙ্গে ডা'ভিলা শেখালেন, অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কিভাবে শুরু করলে ভাল হয় এবং চালিয়ে যাওয়া যায়, যাতে কোন আড়ষ্টভাব না আসে। তাঁকে দেখে এবং জেনে মনে হল তিনি চসারের পারফেক্ট জেন্ট্‌ল্ নাইট আর ক্লার্ক অভ অক্সেনফোর্ডের অতি সুন্দর সমন্বয়।

আমাদের সময়ে দিল্লীর পরীক্ষায় মাত্র পাঁচজনকে আই-সি-এস পরীক্ষায় পাশ করানো হয়। প্রথম যে হয় তার নাম স্বরূপ কৃষেণ, তার পর আমি, তার পর গোবিন্দনারায়ণ, তার পর রণজিৎ রায় বাহেল। মুসলমান হিসাবে নেয়া হয় এম-এ মামুদকে। স্বরূপ ইতিমধ্যে দিল্লীতে জানুয়ারি মাসে আর লণ্ডনে জুলাই মাসে

ঘুরে ফিরে বারকয়েক পরীক্ষা দিয়েছে, ফলে অফিসারী কায়দা-কানুন শিখে গেছে। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের চীফ সেক্রেটারি পান্নালাল গোবিন্দ-নারায়ণকে ধরে জামাই করে নেন। গোবিন্দ ছিল এলাহাবাদের ছাত্র আর পান্নালাল ছিলেন এককালে সেখানকার প্রসিদ্ধ ছাত্র। শ্বশুরশাশুড়ীর কাছে নতুন বৌকে ছেড়ে এসে গোবিন্দ বেচারী ম্রিয়মাণ হয়ে থাকত। রণজিৎ খুব মিশুকে ছিল। তবে মাসুদের সঙ্গেই আমার সবথেকে বেশী হৃদ্যতা হল। মাসুদ ছিল পাঠান, মুষ্টিযুদ্ধে ভাল, অক্সফোর্ডে পরের বছর বক্সিংএ হাফ-ব্লু হয়। ছিল গোঁড়া মুসলমান, শুয়োরের মাংসে ছিল মারাত্মক ভয়। মিঃ ডা'ভিলা, মাসুদ আর আমি জাহাজে এক টেবিলে বসে খেতুম। যে-কোন খাবার বেয়ারা আনত, মাসুদ তৎক্ষণাৎ জিগ্যেস করত, তাতে হ্যাম আছে কিনা। বেয়ারাও চট করে ব্যাপারটা বুঝে গেল। প্রতিদিন সকালে বড় গ্লাসের দু'গ্লাস দুধ আর কয়েক রকম ফলে ভর্তি একটি বড় প্লেট মাসুদের সামনে ঠক করে শব্দ করে ধরে দিয়ে, সন্দেহভঞ্জনের সুরে মজা করে বলত : এর কোনটিতে হ্যাম নেই। অক্সফোর্ডে গিয়ে কলেজে না থেকে মাসুদ শহরে একটি ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ঘর নিল। প্রথম কয়েকদিন কাটার পর, বয়স্থা, ভালমানুষ, ল্যাণ্ডলেডি মহিলা একটু উদ্বিগ্নমুখে মাসুদকে জিগ্যেস করলেন, রোজ এত করে পরিষ্কার করা সত্বেও প্রতিদিন কমোডের উপর বসার কাঠে কেন যে টাটকা আঁচড়ের দাগ পড়ে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। মাসুদ সবটি শুনে তাকে আশ্বস্ত করে কিছু বলল। ভদ্রমহিলা তা সত্বেও বুঝতে না পারাতে মাসুদ বোঝাতে গিয়ে জুতোশুদ্ধ পায়ে কমোডের উপর বসার কাঠের উপরে উঠে উবু হয়ে বসতে যাবে, এমন সময়ে ভদ্রমহিলা ভড়কে গিয়ে ঘর থেকে ছুটে পালাতে পালাতে চেঁচিয়ে বললেন, না, না, হতেই পারে না, কি অসম্ভব ব্যাপার, অসম্ভব। পরের দিন সকালে অবশ্য তিনি কাঠের ওপর মাপসই একটি তুলোপোরা কাপড়ের গদি লাগিয়ে দিলেন।

মাসুদের কাছে এ কথা শুনে আমার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত'র কাছে শোনা বিখ্যাত কুস্তিগীর গোবর গুহ মশাইয়ের একটি গল্প মনে পড়ে গেল। সুধীনবাবু এককালে তাঁর আখড়ায় কুস্তি শিখতেন। পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে গোবরবাবুকে যত্ন করে সরকারি খরচে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়, ভারতীয় কুস্তি দেখাবার জন্যে। একজন বিখ্যাত ধনী ভদ্রমহিলা তাঁকে লণ্ডনের ইটন প্লেসে নিজের বাড়িতে রাখেন। পাঠক হয়ত জানেন গোবরবাবু নিজেও বিশিষ্ট পরিবারের লোক ছিলেন। তা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলার সাজানো বাড়ি, আসবাবপত্র, চালচলন, খাওয়া পরার ঠাট দেখে গোবরবাবু খুব চমৎকৃত হন। দু একদিন থাকার পর গোবরবাবুর মনে হল

প্রতিদিনই তাঁর স্নানের ঘরের আর সমুখের সরু হলের কার্পেটগুলি বদলে নতুন কার্পেট পাতা হয়েছে। গৃহস্বামিনী অবশ্য কিছু বলেন না। একদিন বিমূঢ় হয়ে গোবরবাবু এক বন্ধুর কাছে ব্যাপারটির উল্লেখ করলেন। বন্ধু জিগ্যেস করলেন. উনি কী ভাবে স্নান করেন। 'কেন বাড়িতে যেমন করে করি তেমন করে। স্নানের সময়ে প্রতিদিন সকালে দেখি বাথটব ভর্তি সুন্দর গরম জল, আমি মুখ ধোবার জগে করে গায়ে জল ঢেলে আরামে স্নান করি!' 'কেন, বাথটবে ঢোকো না?' 'মাগো, বাথটবে ঢুকে নিজেরই নোংরা জলে স্নান করব? কি যে বল!' বন্ধুটি তখন বুঝিয়ে বললেন, গোবরবাবু না বুঝে কিভাবে তাঁর গৃহস্বামিনীকে অসুবিধা এবং অযথা অর্থব্যয়ে ফেলেছেন। পরের দিন গৃহস্বামিনী অবাক: সবকিছু বেশ শুকনো খটখটে, কার্পেট মোটেও ভেজেনি। স্নানের টব থেকে জল বের হচ্ছে সন্দেহ করে উনি মিস্ত্রি ডেকে রোজ সব কিছু দেখাচ্ছেন, কোন দোষই বেরোয়নি, আর আজ আপনা আপনি জল পড়া বন্ধ হল কি করে?

যাবার সময়ে সমুদ্রের দোলায় গা-বমি অসুখ আমার একেবারে করেনি। বম্বে থেকে জাহাজ ছাড়ার পর দিন তিনেক সবাই বিছানায় কাত। তার পরে সকলেই গুটিগুটি বেরিয়ে জোর ডেক কয়েটস্ খেলতে লেগে গেল। আমরা সুয়েজের মধ্যে দিয়ে গেলুম। পোর্ট সেড থেকে আলেকজাণ্ড্রিয়ায় ট্রেনে করে যাওয়া হল না, তার কারণ আলেকজাণ্ড্রিয়ায় জাহাজ থামবে না বলল। জাহাজ সুয়েজ পেরিয়ে যখন ভূমধ্যসাগরের মুখে এল, তার এক ঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়া যেন আমূল বদলে গেল। এক ঝলকে এল খুব ঠাণ্ডা হাওয়া আর গাঢ়-নীল সমুদ্র। অথচ তার কয়েক মুহূর্ত আগেও হাওয়ায় ছিল ভ্যাপসা, গুমোট, আর জল ছিল ঘোলা হলুদবর্ণ।

যুদ্ধ না বাধলে জীবনে হয়ত জিব্রালটার দেখা হতো না। জিব্রালটার হল আমার ইউরোপের প্রথম মাটি। পাহাড়ের উপর ছোট্ট জিব্রালটার শহরে ওঠার রাস্তা খুব চড়া। শহরটিতে ঢোকার আগেই বোঝা যায় সাম্রাজ্যের সীমান্তের এই চৌকিটি পাহারার ভারে কী রকম আড়ষ্ট। একদিকে বৃটিশ টমি, অন্যদিকে অমোঘ নিয়তির মতো গুর্খা সৈন্য। ট্যুরিস্ট দোকানে অথবা রেস্তোরাঁয়, যেখানেই যাই দেখি যুবতী স্প্যানিশ সুন্দরীরা। তাদের দেখে রক্ত গরম হবারই কথা। ইংরেজ লেখকরা স্প্যানিশ যুবতীদের সঙ্গে কেন অগ্নিশিখার তুলনা করেছেন, বুঝতে পারলুম। তার তুলনায় ইংল্যাণ্ডে যখন গেলুম, তখন আমাদের বয়সী ইংরেজ মেয়েদের দেখে মন হল, যেন দেয়ালের তাকে রাখা স্নিগ্ধ, শীতল চীনেমাটির পুতুল।

বিস্কে উপসাগরে বেশ ঝড়-ঝঞ্ঝা পেলুম। চ্যানেল বেয়ে টিলবারি ডকে জাহাজ ভিড়বে এই আশায় মনে মনে তৈরি হচ্ছি, এমন সময়ে শুনলুম জাহাজ লিভারপুল বন্দরে যাচ্ছে। যেদিন বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে সেদিনই জার্মানরা 'এথেনিয়া' জাহাজ ডোবায়। তার কয়েকদিন পরেই সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বিরাট নৌ-জাহাজ এইচ-এম-এস 'কারেজিয়াস' ডোবায়। ফলে সমুদ্রে খুব সন্ত্রাসের সঞ্চার হয়। আমরা লিভারপুলে নামার এক সপ্তাহের মধ্যে এইচ-এম-এস 'রয়াল ওক' ডোবে।

লিভারপুলে জাহাজ ঘাটে লাগল। বৃটেনে এসে দেখি সকাল দশটার সময়ে এত ঘন, নোংরা কুয়াশা যে জাহাজ যে-ঘাটে লেগে আছে, সে-ঘাটটুকু শুদ্ধ স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। এই আমার প্রথম ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা। মিঃ ডা'ভিলা লিভারপুলে থেকে গেলেন। নেমে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, সেই ট্রেন চড়ে বেলা পাঁচটায় লণ্ডনে পৌঁছলুম। বর্ধমান টাউন স্কুলের পুরনো বন্ধু অজয় বসু আর তার ভাই সঞ্জয় আমাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে গোল্ডার্স গ্রীনে তাদের ১৩নং এলিথ গার্ড্‌ন্‌সের বাড়িতে নিয়ে ওঠালো।

নতুন জীবন শুরু হল।

ইংল্যাণ্ডে শিক্ষানবিশী

মিস্টার ও মিসেস পিকার্ড গোল্ডার্স গ্রীনের ১৩নং এলিথ গার্ডন্‌সে ভারতীয় ছাত্রদের রাখার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। সাহায্য করত দুটি অল্পবয়স্ক কন্যা: অ্যান আর জোন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যখন বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন তাদের সকলের দেশ ছেড়ে ক্যানাডা যাবার কথা হয়। ১৯৪০ সালে লণ্ডনের উপর জার্মান ব্লিৎজ হবার পর তাঁরা মেয়েদের ক্যানাডা পাঠিয়ে দেন। তখন আমি লণ্ডন থেকে চলে এসেছি। ১৯৪৫ সালের পর আমি তাঁদের খোঁজখবর নেবার যথেষ্ট চেষ্টা করিনি, যেটুকু করেছিলুম সফল হইনি। মিঃ ও মিসেস পিকার্ড উভয়ে অত্যন্ত সাদাসিধে, সরল, স্বচ্ছমনের ছিলেন: যেমন ভদ্র ছিলেন তেমনি ছিলেন সব কাজে আগুয়ান; ভদ্রমহিলা ছিলেন স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা। যাদের রাখতেন তাদের যতখানি যত্ন করার কথা তার চেয়ে বেশী করতেন, কম নয়। অজয় তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমার জন্যে দোতলায় হ্যাম্পস্টেড হীথের খোলা দিকে রোদ হাওয়াওলা

একটি ঘর ঠিক করে রেখেছিল। বাড়িতেই তিনবেলা আহার। সকালবেলা ব্রেকফাস্টে দুটি ডিম আর জ্যাম ত বটেই, দুপুরে ও রাত্রের খাওয়াতে থাকত হয় রোস্ট, উপযুক্ত সস, জেলি বা ইয়র্কশিয়ার পুডিং এবং তার পরে পুডিং। ল্যাঙ্কাশিয়ার হটপট বা আইরিশ স্টু জাতীয় আজে বাজে পদ নয়। থাকা খাওয়া সব মিলিয়ে সাতদিনের দক্ষিণা দিতে হতো দুই গিনি, অর্থাৎ আমাদের তখনকার টাকায় আটাশ টাকা। বারোমাস থাকার ছাত্র ছিল তিনজন: অজয়, সঞ্জয় আর একটি ডাক্তারি-পড়া ছাত্র ওয়াগ্রে। আমি যাবার অল্প পরেই আরেকজন এল, নাম শান্তি গুজার। শান্তি অজয়ের সঙ্গে ব্যারিস্টারি পড়ত, সঙ্গীতরসিক ও রুদ্রবীণা বাজিয়ে হিসাবে প্রসিদ্ধি ছিল। পরে বহু বছর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কেন্দ্রীয় অডিশন বোর্ডের সভ্য ছিল, ঠাকুর জয়দেব সিংহের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। সৌভাগ্যক্রমে যতদিন বেঁচেছিল ততদিন তার আর তার মেয়েদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। আমাদের মেয়ে জয়তীর বিবাহে ১৯৭৬ সালে শান্তির বড় মেয়ে রূপা নিজের আঁকা একটি ছবি উপহার দেয়, সেটি আমাদের বাড়িতে দেয়াল আলো করে আছে। পাঁচজনে মিলে বেশ মজা হতো। সে-সময়ে লায়ন্স কর্নার হাউস বলে একটি রেস্তরাঁ কোম্পানি খোদ লণ্ডন শহরের কয়েকটি বড় বড় রাস্তার মোড়ে শাখা খুলেছিল। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের মতো তাদের লাঞ্চের খ্যাতি ছিল। আড়াই শিলিং, অর্থাৎ আমাদের এক টাকা বারো আনায় চার পদ লাঞ্চ দিত। অবশ্য গ্রেট ইস্টার্নের রান্নার স্বাদ বা পরিমাণের সঙ্গে তুলনা চলত না। আমাদের সহপাঠী, সনৎ, যে আমাকে রাগাবার জন্য আমাকে দালাই লামা বলত, সে তখন লণ্ডনে, অজয়ের সঙ্গে আগেই এসেছিল, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পড়ত এবং অজয়ের সঙ্গে ব্যারিস্টারি পড়ত। লায়ন্সে লাঞ্চের সঙ্গে যত ইচ্ছা পাঁউরুটি আর মাখন পাওয়া যেত। সনৎ এখনও গল্প করে এবং অজয় অস্বীকার করে, অজয়ের নাকি সবসময়ে খিদে পেত। লাঞ্চে সাধারণত যা রুটি আর মাখন দিত অজয় নাকি রোজই তার চেয়ে কয়েক টুকরো বেশী রুটি আর মাখন চেয়ে খেত। যাই হোক যা লাঞ্চ দিত, মোটামুটি ভালই হতো। আমার এক বিষয়ে এখনও আক্ষেপ থেকে গেছে: আমার স্বভাব বরাবরই একটু কৃপণ, তা ছাড়া কাকে কী ধরনের কত দামের উপহার দিতে হয় তখনও শিখিনি। মিঃ ও মিসেস পিকার্ডকে আমি বড়দিনের উপলক্ষে যা উপহার দিয়েছিলুম তা এতই অকিঞ্চিৎ যে ভাবলে এখনও লজ্জা করে। তবে ১৯৪০-এর ইস্টারে আমি নিজেকে কিছুটা শুধরিয়ে, পিকার্ডদের, মা বাবা ও মেয়েদের, তার সঙ্গে অজয়, সঞ্জয় আর শান্তিকে নিয়ে সোহো-পল্লীতে 'স্মিট' রেস্তরাঁতে গিয়ে রাত্রে একদিন নেমন্তন্ন খাইয়েছিলুম।

যেদিন পৌঁছলুম তার পরের দিন সকালে অজয় আমাকে কাপড়জামা কিনতে নিয়ে যাবার সময়ে কিছুতেই আমাকে কলকাতার জামাকাপড়ে যেতে দিল না। অগত্যা সঞ্জয়ের কাপড় জামা পরে পিকাডিলির সিম্পসনের দোকানে দুজনে গেলুম। ত্রিশ শিলিং দরে তিনটি ড্যাক্সের প্যাণ্ট কিনলুম, আর কিনলুম চার গিনি দিয়ে হ্যারিস টুইডের একটি অতি সুন্দর জ্যাকেট, এবং সাড়ে আট শিলিং দামের তিনটি অতি সুন্দর ডোরাকাটা শার্ট, প্রত্যেকটির দুটি করে আলাদা কলার। সব জামাকাপড়ই ১৯৬৫ সাল অবধি অক্ষত অবস্থায় প্রায় নতুনের মতো ছিল; যদিও সেগুলি যাকে বলে থেসে মেড়ে পরেছি, তবুও কিছু টসকায়নি। ছেঁড়া ত দূরের কথা, বোতাম-সুদ্ধ ছেঁড়েনি। এসব ছাড়া, ডান্ কোম্পানির একটি শাখা দোকান থেকে দ্বিতীয় একটি আটপৌরে হ্যারিস টুইড কোট কিনি দু গিনি দামে, তার সঙ্গে এক গিনি দিয়ে একটি হমবুর্গ টুপি। দুজোড়া জুতো কিনি, একজোড়া ব্রাউন ডলসিস পঁচিশ শিলিং দিয়ে, আরেক জোড়া কালো ম্যানফিলড অক্সফোর্ড জুতো; এত টাকা খরচ করে জামা-কাপড় কেনা জীবনে এই প্রথম। সিম্পসন খুব তৎপরতার সঙ্গে প্রতিটি জামাকাপড় আমার মাপে কেটে আবার তৈরি করে দিল। মাত্র দুদিন লাগল, তার জন্যে আলাদা পয়সা নিল না। তৃতীয় দিন নতুন জামা কাপড় পরে দোকান থেকে বেরোলুম। চতুর্থ দিনে প্যাডিংটন স্টেশনে নিয়ে গিয়ে অজয় আমাকে অক্সফোর্ডের ট্রেনে তুলে দিল। ১১ই অক্টোবর বিকেল চারটের সময়ে আমি অক্সফোর্ডের মার্টন্ কলেজের দেউড়িতে দারোয়ানের ঘরে হাজির হলুম। ৯ তারিখে মিকেলমাস টার্ম শুরু হয়ে গেছে।

অক্টোবর মাসেই চারটে বাজতে না বাজতে অন্ধকার নামতে শুরু করত; দেউড়ির দারোয়ান জেঙ্কিন্স্ আমার ক্যাবিন ট্রাঙ্কটি আমার সঙ্গে ধরে আমার ঘরে পৌঁছে দিল। গেট দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে গ্রেট কোয়াড্রাঙ্গলের দ্বিতীয় সিঁড়ির একতলার ডান দিকের ঘরটি হল আমার। এটি হল অক্সফোর্ডের সবচেয়ে পুরনো কলেজের দ্বিতীয় প্রাচীন কোয়াড্রাঙ্গল্। সবথেকে পুরনো কোয়াড্রাঙ্গলটিকে বলত ওল্ড্ কোয়াড বা পুরনো কোয়াড, সেটি উত্তর-পূর্ব দিকে, প্রকাণ্ড খাবার ঘর বা হল আর মার্টন কলেজের চ্যাপেলের মাঝখানে। আমার দিকের অংশটি ছিল তিনতলা। একতলায় একেকটি ঘরের পর উপরে ওঠার সিঁড়ি।

আমার ঘরটি ছিল চৌকো, বেশ বড়ই বলা যায়, একেকটি দিক প্রায় কুড়ি ফুট। কোয়াডের দিকে ছিল একটি বিরাট উঁচু আর চওড়া জানলা, ধনুকের আকারে বাইরের দিকে একটু বাঁকানো। জানলার চৌকাঠের নিচে ছিল চওড়া বসার বেঞ্চি। জানলা দিয়ে দেখা যায় গ্রেট কোয়াড। শোবার ঘরটি ছিল একটি

অন্ধকার কুঠুরি, প্রায় নালন্দার মঠের ভিক্ষুদের কুঠুরির মতো। লম্বায় আট নয় ফুট, চওড়ায় ছয় ফুট। পায়ের দিকে, যেদিকে বাইরে মার্টন্ লেন, সেদিকে উঁচু মোটা পাথরের দেয়ালে একটি ছোট জানলা ফোটানো। জানলার নিচে একটি তাক। উত্তরের দেয়ালে অতি সরু একটি আলমারি। ঘরের মধ্যে লম্বালম্বি পাতা একটি সরু লোহার খাট, একটি আলনা, একটি তোয়ালের আলনা, একটি ছোট হাত ধোবার টেবিল, তার উপরে একটি চিনেমাটির গামলা, একটি জগ, তার সঙ্গে একটি তামার ঢাকনাওলা গরম জলের কেটলির মতো পাত্র, কতকটা গাছে জল দেবার ঝারির মতো। তেত্রিশ বছর পরে সেই রকম এক রাশ কেটলি আমি রাষ্ট্রপতি ভবনের তোষাখানায় দেখি, এবং কলকাতার রাজভবনেও। স্পষ্টই বুঝলুম ভাইসরয় এবং গভর্নরদের সচিবরা কলেজের স্মৃতি বুকে করে বেড়াতে ভালবাসতেন। আমাদের একতলার 'বেয়ারা' ছিল হিগিন্স্, ডাক নাম হিগ্স্। বেয়ারাকে বলত স্কাউট। তার কাজ ছিল ঘরটি প্রত্যেকদিন ঝেড়ে, বিছানা করে, মুখ ধোবার গামলা ইত্যাদি পরিষ্কার করে দেয়া। হিগ্স্ এসে আমাকে খাবার দালানটি দেখিয়ে দিল। ডাইনিং হলের বিরাট বিরাট প্রাচীন জানলাগুলি কালো পর্দা দিয়ে অন্ধকার করা। তাদের বহুমূল্য এবং প্রাচীন সেট্ন্ড্ গ্লাসের ছবিগুলি খুলে নিয়ে তাদের স্থানে কাঠের তক্তা মেরে দেয়া হয়েছে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, সন্ধ্যার পর বাইরে কোনরকম আলো দেখতে পাওয়া নিষিদ্ধ।

ডাইনিং হলকে বলত কলেজ হল। সেটি ছিল আমাদের ঘরের উল্টোদিকে গ্রেট কোয়াডের খোলা প্রাঙ্গণের ওপাশে। বিরাট হল, পুব-পশ্চিম বরাবর লম্বা, উত্তর-পশ্চিম বরাবর চওড়া। হলের মাঝবরাবর সারা দৈর্ঘ্য বেয়ে ওক কাঠের খাবার টেবিল, প্রায় ষাট ফুট বা তার বেশী লম্বা, এবং প্রায় ছয় ফুটের উপর চওড়া। তার দুধার ধরে ছাত্রদের বসে খাবার বেঞ্চি। ঘরের পশ্চিম দিকে সারা প্রস্থ জুড়ে চওড়া উঁচু বেদী। তার উপরে ছিল বেদীর দৈর্ঘ্য বরাবর একটি বড় চওড়া সুন্দর টেবিল। তাকে বলত হাই টেবিল। এর চারধারে অধ্যাপকরা চেয়ারে বসে আহার করতেন। বেদীর পিছনে পশ্চিমের দেয়ালে ছিল দরজা, সেই দরজা দিয়ে অধ্যাপকরা তাঁদের সিনিয়র কমন রুম থেকে আনাগোনা করতেন। অত্যন্ত প্রাচীন ও মূল্যবান রূপোর বাসনপত্র, বাতিদান, কাঁটা চামচ আর নানা রকম পাত্রের জন্য কলেজের প্রসিদ্ধি ছিল। তা ছাড়া ছিল অতি জমকালো, ভারিভারি অতি সুন্দর কাজ করা বড় বড় থালা, ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদি।

সারা মিকেলমাস টার্ম ধরে, অর্থাৎ বড়দিনের ছুটি পর্যন্ত, আমরা ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রাতের খাবার খেতুম। ঠাণ্ডা কাঁচা শাকসব্জি বা স্যালাড, অতি

পাতলা পাতলা টুকরো বা স্লাইস্‌ড্‌ হ্যাম, বীফ, ষাঁড়ের জিভ, ভেড়ার মাংস অথবা মুরগী, চীজ, মাখন আর রুটি। মিষ্টি হিসাবে সাগু অথবা শেমির পুডিং। রাত্তিরে এই আহার এবং ঐ ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে কুঠুরিতে শুয়ে ১১ই অক্টোবর থেকে ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে আমার বারো পাউণ্ড ওজন কমে গেল। রাত্তিরে শোবার আগে নিজের পয়সায় নিজের ঘরে যে আরেকবার খাওয়া উচিত, সে বুদ্ধি আমার পরে এল, তাও প্যাট্রিক পরামর্শ দিল বলে। প্যাট্রিকের কথায় পরে আসছি। প্যাট্রিকেরই পরামর্শ মতো, বড়দিনের ছুটিতে যাবার আগে, আমি শোবার খাটটি চোরকুঠুরি থেকে বের করে বড় ঘরে পাতিয়ে নিলুম।

গ্রেট কোয়াডের পশ্চিমধারে ছিল দোতলায় অধ্যাপকদের সিনিয়র কমন রুম আর এক তলায় ছাত্রদের জুনিয়র কমন রুম। তাছাড়া ছিল অল্পবয়সী অবিবাহিত অধ্যাপকদের থাকার জন্যে কিছু ঘর। এরও পশ্চিমে, গ্রেট কোয়াড ছাড়িয়ে, ছিল নতুন দুটি কোয়াড্রাঙ্গ্‌ল্‌, কট্‌সওল্ড পাথরে তৈরি। সে কোয়াডগুলি আধুনিক কায়দায় তৈরি, তাতে ছিল আধুনিক কায়দায় স্নানের ঘর, স্যানিটারি পায়খানা, শাওয়ার ইত্যাদি। কিন্তু আমি পৌঁছবার আগেই সেগুলি সমর বিভাগ দখল করে তালা চাবি দিয়ে রেখেছিল। আমাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। সারা কলেজের উত্তরদিক বরাবর ছিল কলেজের নিজস্ব বড় বড় গাছের অপূর্ব কানন আর মাঠ, তার পরে ছিল আইসিস নদী।

যুদ্ধ ঘোষণা হওয়ায়, উপরন্তু মিকেলমাস টার্মে ঠাণ্ডা আহারের ব্যবস্থার দরুণ রাত্তিরে কলেজে খাওয়া অবশ্যকর্তব্য ছিল না। প্রথম সন্ধ্যায় স্বভাবতই কারোর সঙ্গে আলাপ হলনা। ছাত্ররা সকলেই আগন্তুক, আমরা যে যার এদিক ওদিক মাথা নেড়ে পরস্পরকে নমস্কার করলুম, আলগোছে গুড ইভনিং করলুম এই পর্যন্ত। স্কাউটরা পরিবেশন করল। পরের দিন প্রাতরাশে সকলেই এল। আমার পাশে যে ছেলেটি বসল, সে নিজের নাম বলল টমাস জাইল্‌স্‌। গ্রীক, ল্যাটিন পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়ে এসেছে। বাড়ি হচ্ছে গার্ন্‌সি, চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে। জার্সি দ্বীপের পরেই আকারে দ্বিতীয় স্থান। খাবার পর জাইল্‌স আমাকে পুরনো কোয়াডে তার ঘরে নিয়ে গেল, তার বইটই, দেশে তার বাবা মা, ভাই বোনের ফোটো দেখাল। যারা কলেজে থাকতে এসেছে তাদের অধিকাংশই ছিল ফার্স্ট-ইয়ারের ছেলে। অধিকাংশের বয়স গড়ে উনিশ বছর। আমিই দেখলুম বয়সে সব থেকে বড়, এবং আমি অক্সফোর্ডের ছাত্র হয়ে ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকিনি। তখন আমার বাইশ পূর্ণ হয়ে তেইশের দিকে যাচ্ছে। সকলকেই বেশ আত্মনির্ভর ও সাব্যস্ত, নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারে, মনে হল। হস্টেলে কোন দিন মা

থেকে ঘরের আদুরে ছেলে হয়ে বসেছিলুম ভেবে লজ্জা হল। অন্যদিকে তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হল তাদের তুলনায় আমার মন অনেক সাবধানী এবং জটিল, আমার কথাবার্তা, তাদের মতো খোলামেলা, সরল নয়। আমার মনে হল পনেরো বছর বয়সে আমার মন ও কথাবার্তা যতটা সরল ছিল, ওদের উনিশ বছর বয়সে প্রায় ততখানি সরল ও খোলামেলা মন। অন্যদিকে তারা ঐ বয়সেই বেশ স্বাধীনতাপ্রিয়, অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে বা সমস্যায় তারা ঔৎসুক্য বা হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না।

প্রথম দিনে আমি ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট আর ব্ল্যাকওয়েলের বইয়ের দোকান থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকছি এমন সময়ে মনে হল বেশ ফুর্তিবাজ একটি ছেলে শিস দিতে দিতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে, আমার ঘরের সামনে এসে নিজের থেকে 'হেলো' বলল। আমিও 'হেলো' বললুম। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা শক্ত ছেলে, গায়ে জোর আছে, গলার স্বর মোটা, মুখখানা কেনেডিদের মতো গোল আর হাসিখুশি, চওড়া কপালের উপর একরাশ ঘন চুল। নিজের নাম বলল প্যাট্রিক ও'ব্রিগান, ডাক নাম প্যাডি। আমার থেকে বেঁটে দেখে আশ্বস্ত হলুম। আমার নাম বললুম। একটু বিব্রত স্বরে বলল, পরে কথা হবে, না হলে রাগার খেলতে যেতে দেরি হয়ে যাবে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা খাবার টেবিলে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ হল। নাম বলল ডেভিড মরিসন। চেহারা যেন আদর্শ মাপজোপ করা নর্ডিক সুপুরুষ, প্রায় ছয় ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা, হাত পা শরীরের সব কিছুর মাপ খুব ভাল, পরিষ্কার টলটলে নীল চোখ, উন্নত কপাল, সোনালি চুল। পায়ের জুতোজোড়া প্রকাণ্ড লম্বা, মুখে তামাকের পাইপ। খাবারের পর আমাকে শহর দেখাতে নিয়ে গেল। হাই স্ট্রীট থেকে গেলুম কারফ্যাক্স, সেখান থেকে কর্ন মার্কেটে, তার পর সেণ্ট মাইকেল্‌স্ চার্চ, জর্জ স্ট্রীট, ব্রড্ স্ট্রীট, হলওয়েল স্ট্রীট, লংওয়াল ঘুরে শেষে মডলেন স্ট্রীটে পড়ে, সেখান থেকে হাই স্ট্রীটে উঠে মার্টন্ লেন দিয়ে ফিরলুম।

পরের কয়েক সপ্তাহ, যখনই সময় পেতুম পথে পথে ঘুরে অক্সফোর্ড চিনলুম। অক্সফোর্ড সম্বন্ধে নানা গল্পের ভাণ্ডারী ছিলেন ডাঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন অধ্যাপক, কনগ্রীভের উপর ছিল থিসিস আর লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের একটি অনুপম ইতিহাস, ইংরেজি ভাষায়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে ছাপা। তাঁরই কৃপায় নতুন ও ভাল করে আলাপ হল আখতারুজ্জ জামানের সঙ্গে। প্রেসিডেন্সীতে আমরা একই সঙ্গে বি-এ পাশ করি। বি-এ পাশ করেই জামান অক্সফোর্ডে এসে এক্সিটার কলেজ থেকে আবার বি-এ পাশ করে, এবং বিলেতের

পরীক্ষায় আই-সি-এসে ঢোকে, আমার সঙ্গে একসঙ্গে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটে শিক্ষানবিশী করত। আর আলাপ হল শিশিরকুমার মুখুজ্যের সঙ্গে, তিনিও এককালে প্রেসিডেন্সীর ছাত্র, তখন ওরিয়েল কলেজে ইংরেজি সাহিত্য আর আইন পড়ছিলেন। জামান আমাকে অক্সফোর্ড সোসাইটিতে প্রবেশের প্রস্তাব করে, এবং জ্যোতিষবাবু করেন ভারতীয় মজলিসে। শিশির মুখুজ্যে পরে কলকাতা হাইকোর্টের জজ হন, খুবই সুনাম হয়। থাকতেন অক্সফোর্ড শহরের ঈষৎ বাইরে, হেডিংটনের রাস্তায়। তাঁকে আমরা সকলে মহারাজ বলে ডাকতুম। মাঝে মধ্যে তাঁর বাড়িতে যেতুম। ইংরেজি সাহিত্যের বহু বই ছিল, সেগুলি অ্যালসেশিয়ানের মতো আগলিয়ে রাখতেন। শেল্‌ফ্‌ থেকে কোন বই বের করে হাতে নিলেই হল, তখনই বলতেন, 'বইটি ভাল লাগে? আসুন, আসুন, এই সোফায় বসে দুজনে পড়ি।' বলে বইটি হাতে নিয়ে সোফায় বসে, আপনাকে পাশে বসার জন্যে ডাকতেন। ফলে তখনই বই পড়ার ইচ্ছে উবে যেত। জামান ছিল আচারে ব্যবহারে ইংরেজ, জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে তার খুব বনত। জ্যোতিষবাবু খুব রহস্য আর মজা করে কথা বলতে পারতেন, উনি মুখ খোলার উপক্রম করলেই জামান 'সোডার মতো ভসভসিয়ে' সারা শরীর থাকে থাকে কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ত। সুভাষ বসু মজলিসে এসে বক্তৃতা দেন, জ্যোতিষবাবু তাঁকে খুব ভাল নকল করতে পারতেন। অমিয় চক্রবর্তী মশাইয়ের গল্প একদিন করলেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ একদিন মজলিসে বক্তৃতা করছেন। হঠাৎ জ্যোতিষবাবু পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেন, রোগা, মাঝারি লম্বা, লাজুক প্রকৃতির এক ভদ্রলোক দূরে ঢোকবার দরজার পাশে 'নিজের গোঁফের আড়ালে' দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোতিষবাবু এগিয়ে গিয়ে আলাপ করায় ভদ্রলোক নিজের নাম বললেন অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। সদ্য অক্সফোর্ডে এসেছেন ডি. লিট করার আশায়। মন-কেমন-করা সুরে আস্তে আস্তে বললেন, 'দেশে স্ত্রী এবং শিশুকন্যাকে' রেখে এসেছেন।

জ্যোতিষ ঘোষ আমাকে হয় ঈস্টারের ছুটিতে না হয় গ্রীষ্মের ছুটিতে লণ্ডনে ডাঃ শশধর সিংহের দোকানে নিয়ে গেছলেন। লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামের কাছে, ঐ নামের রাস্তায় তাঁর বইয়ের দোকান ছিল; নাম বিব্‌লিওফিল। দোকানটি ভারতীয় মগজজীবীদের আড্ডার জায়গা ছিল, বিশেষত বামপন্থীদের। সেখানেই আমি প্রথম রজনী পাল্‌মে দত্ত এবং কৃষ্ণ মেননকে দেখি এবং আলাপ হয়। পাল্‌মে দত্ত আমার সঙ্গে আলাপ হতেই দুটি কথা বললেন, আমার চিরকাল মনে থাকবে। প্রথম, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকেরা একক গোষ্ঠী হিসাবে সবদিক দিয়ে ভারতকে জানার জন্যে সবথেকে বেশী সংখ্যক বই লিখেছেন, এনৃথ্রপলজি থেকে

শুরু করে জুওলজি পর্যন্ত (ইংরেজিতে 'এ টু জেড') ; দ্বিতীয়, ইণ্ডিয়া টু-ডে বলে বইটি লিখতে গিয়ে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন যে আই-সি-এসরাই নথিপত্রে ভারতে বৃটিশ নীতি ও শাসনের কুফলের সব থেকে বেশী নির্মম সমালোচনা করেছে। আমি একটু অবাক হয়েছিলুম ; আশঙ্কা করেছিলুম, আই-সি-এস শুনেই তিনি হয়ত নাক সেঁটকাবেন। অল্পবয়স্ক কম্যুনিস্টদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে লণ্ডনে আলাপ হয়, তাঁদের মধ্যে আমার ভূপেশ গুপ্তকে সবচেয়ে ভাল লাগে, যতদিন বেঁচে ছিলেন। কিছুটা ভূপেশ গুপ্তর মতো প্রকৃতি, অবাঙালীদের মধ্যে আমি দেখেছি পার্বতী কুমার-মঙ্গলমের (পরে কৃষ্ণন হন) এবং আরো দু-একজনকে। বামপন্থীদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী ছিলেন ; তাঁরা সকলেই হয় বড়লোক না হয় পয়সাওলা পরিবারের ছেলে, কিন্তু নিজেদের শ্রেণীচ্যুত প্রমাণ করার জন্যে এত ব্যস্ত যে উলওয়ার্থের দোকান থেকে ছ'পেনি দামের একটি বেল্ট কেনার পয়সা নেই দেখাবার জন্যে তার বদলে সাড়ে সাত শিলিং দামের ফরাসী রেশমের স্থুলকা টাই প্যাণ্টে বেল্টের বদলে বাঁধতেন। সময়মত তাঁরা শ্রেণীচ্যুতি ও বংশগৌরব, দুই দিকই বেশ বিবেচনা করে সমানভাবে কাজে লাগাতেন, যখন যেটি সুবিধা। আরেক ধরনের বামপন্থী ছিলেন যাঁরা ইংলণ্ডে এসেছিলেন আই-সি-এস হবার জন্যে, কিন্তু ফেল করে বা অন্য কারণে, শেষে ব্যারিস্টারি পড়তে গেলেন, পরে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে পদমর্যাদার জোরে একাধারে উদ্ধত, অজ্ঞ ও ধূর্ত হয়ে উঠলেন। এঁদের মধ্যে কিছু কিছুকে আমি ভারতের নানা জায়গায় মন্ত্রী হিসাবে দেখেছি ; স্বভাবতই তাঁরা আই-সি-এস শ্রেণীর প্রতি শ্লেষাত্মক কথা দিয়ে শুরু করেন। শশধরবাবু নিজে প্রোফেসর হলে ভাল হতো। ১৯৫০ এর দশকে তিনি দোকান উঠিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে কিছুদিন থাকলেন, মন বসল না। পণ্ডিত নেহরু তাঁকে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের ডিরেক্টর করে দিলেন, তাতে সরকারি দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যে পড়ে তাঁর মন আরো ভেঙে গেল। ফিরে গিয়ে কিছুদিন পরে কষ্ট পেয়ে মারা গেলেন। তাঁর মতন বিদগ্ধ সভ্য মন আমি খুব কম দেখেছি।

ডেভিড মরিসন ছিল পাদ্রী বংশের ছেলে। বাবা বা মারা গেছলেন, অবিবাহিতা পিসী তাঁকে মানুষ করেন। ডেম মরিসন নিশ্চয় ছেলেবেলায় ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, চলনে বলনে কথায় ছিল আভিজাত্য। রুচিও ছিল মার্জিত। স্পষ্ট বোঝা যেত উনি উইলিয়াম মরিসের ঐতিহ্যে মানুষ হয়েছেন। পৃথিবীর বহু জায়গায় ঘুরে ভাল ভাল জিনিস সংগ্রহ করেন। চেল্সীতে তাঁর বাড়িতে সেই সব জিনিস আর লাইব্রেরির মধ্যে তাঁকে ভাল মানাতো। তাঁর কাছেই আমার ইওরোপীয় ও বিলেতী পোর্সিলেন এবং কাঁচের সম্বন্ধে হাতেখড়ি হয়। নিজের

সংগ্রহ যে খুব বড় ছিল তা নয়, তবে স্পোড, রয়াল ডাউল্টন, মিন্টন ইত্যাদি এবং কিছু মাইসেন ও লিমোজের দেরা জিনিস ছিল। তাঁর বাড়িতেই বার্নার্ড লীচের কথা প্রথম শুনি, এবং তাঁর তৈরি একটি বড় বোয়েমের মতো পাত্র (ভাজ) প্রথম দেখি। ভদ্রমহিলা আমাকে ক্রস্টাল কাঁচ সম্বন্ধেও কিছু কিছু প্রাথমিক জ্ঞান দেন ; যেমন স্টুয়ার্ট, ওয়াটারফোর্ড, ইটালিয়ান সাল্‌ভিয়াটি ও বোহেমিয়ান রঙীন ক্রস্টাল।

প্যাট্রিকের মাকে আমি কখনই তাঁর এ্যালিস নাম ধয়ে ডাকিনি, আজকাল যে-কোন বয়সের আমেরিকান মহিলাকে যা আমি বিনা দ্বিধায় ডাকি। তখনকার কালে প্রথম নাম ধরে ডাকা অভব্যতা ছিল। যেমন, প্রথম তিনচার মাসের আলাপে প্যাট্রিক সর্বদাই ছিল ও'রিগান, ডেভিড ছিল মরিসন। প্রায় অর্ধেক বছর পার হয় এমন সময়ে পরস্পরের প্রথম নাম ধরে ডাকা শুরু করলুম। এখনও বিলেতে প্রথম আলাপেই প্রথম নাম ধরে খুব কম লোকেই ডাকে, যেটা আমেরিকায় করে। অ্যালিস ও'রিগান আমাকে আইরিশ লিনেন এবং ময়গাশেল সম্বন্ধে শেখান, আইরিশ ডোনেগাল এবং স্কচ টুইডের বুননের তফাৎ সম্বন্ধে বলেন, আসল বিলেতী ব্রডক্লথ চিনিয়ে দেন। তাঁর কাছ থেকে নানা ধরনের লেস বুনুনির কথাও শুনেছি। প্যাডি নিজে আমাকে অনেক ধরনের বিলেতী পনিরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, তার সঙ্গে কিছু ইওরোপীয় নীল ও নরম পনিরের। ডেভিড আমাকে পাইপ খেতে শেখায় এবং নানাবিধ তামাক চিনিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে তার ছিল বিচিত্র পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান।

এ্যালিস ও'রিগান ও ডেম মরিসনকে দেখে বুঝলুম ইংল্যাণ্ডে মায়েরা এবং অবিবাহিতা মাসী পিসীরা ছেলেমেয়েদের কত বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং তাদের রুচি তৈরি করে দিতেন। নানাবিধ সাহিত্য ও কলা সম্বন্ধেও উৎসাহ দিতেন। এ বিষয়ে 'হাওয়ার্ড্‌স্ এন্ড' বইতে ই-এম ফর্স্টারের বর্ণনা খুবই যথার্থ বলে মনে হয়। এঁরা ছেলেবেলা থেকেই শিশুদের মনে প্রাচীন ঐতিহ্য ও নিত্য ব্যবহারের পুরনো জিনিস সম্বন্ধে জাগিয়ে দিতেন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর আগ্রহ, কী করে তাদের সংগ্রহ ও রক্ষা করা যায় তার সম্বন্ধে চেষ্টা, সে যত সাধারণ, বা ভাঙাচোরা, অসম্পূর্ণই হোক ; যথা, ভালভাল মাটির বা পোর্সেলিনের টুকরো, পুরনো ব্রোকেডের টুকরো, কাঁচ, ট্যাপেস্ট্রি, রেশম, কার্পেটের টুকরো, ছোটখাটো শখের জিনিস, পুতুল, পুরনো হস্তলিপি, এচিং, ভাঙা আসবাব, প্রথম সংস্করণের বই, আরো অন্যান্য জিনিস। এই সূত্র ধরে তাঁরা শেখাতেন প্রাচীনের প্রতি মমতা, ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা। ছেলেমেয়েদের [illegible] কাজে উৎসাহিত করতেন।

যেমন, প্যাট্রিক ছোট টেবিলে বসানো তাঁতে ছোট ছোট কার্পেট বুনত, ডেভিড জানত কী করে ফুলের বীজ বা বাল্‌ব্‌ বুনতে হয়, পালতে হয়। টম জানত কাঠের কাজ।

আমার ভাগ্য ভাল যে আমি আমার বন্ধুদের মা পিসীদের কাছে বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেছলুম। সেটিই হয়েছে আমার কাছে এক বছর অক্সফোর্ডে থাকার মস্ত ফল, যা আমার মূল্যমানে অক্সফোর্ডে বি-এ পাশ করার মতই সমান দামী মনে করেছি, সারাজীবন ধরে। তাঁদের যত্নেই আমি ইংরেজ জাতির চরিত্রের কিছু কিছু হদিস পাই, যার কল্যাণে ভারতে যে সব ইংরেজদের দেখেছি তাদের অনেক কিছু বেয়াদপি ও অশিক্ষিতভাব আমি ক্ষমা করতে রাজি হই। অন্তত একটি পরিবারের সঙ্গে আমার এবং আমার পরিবারের সকলের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের দুঃখ ও আনন্দের অংশীদার হয়েছি। অক্সফোর্ডে না থেকে ঐ একবছর বা তারও বেশী আমি যদি লণ্ডনে থাকতুম তাহলে এই লাভ আমার হতো না। যেমন বিশ শতকের শুরু থেকে বহু ভারতীয় যাঁরা লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের হয়নি, বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যাঁরা অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদেরও সকলের পক্ষে হয়নি; বৃটিশ সমাজের এই স্তরের বিষয়ে কিছুই জানতে পারতুম না। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের আত্মজীবনী ধরনের বই বা ই-এম ফর্স্টার আমার কাছে চিরকাল অপরিচিত জগৎ হয়ে থাকত। শুধু ল্যাণ্ডলেডি আর মেডদেরই জানতুম। ল্যাণ্ডলেডি বা মেডদের সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র নাক উঁচু ভাব নেই; আমি যতটুকু দেখেছি বা জানি তাতে অনেকেই মানুষ হিসাবে সাচ্চা আর দৃঢ়চরিত্র। কিন্তু একমাত্র তারা আমাকে ইতিহাস শিক্ষায় ও ইংল্যাণ্ডকে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট হতো না, যদিও গত যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদান ছিল খুবই বড়। যে-বিষয়টি টি-এস এলিয়ট ১৯৪২ সালে লেখা তাঁর 'লিট্‌ল্‌ গিডিং' কবিতায় উল্লেখ করেছেন.

যেখানে শেষ, সেখানেই আমার শুরু
ইতিহাসহীন কোন জাতি
সময়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না; কারণ ইতিহাসই হচ্ছে
নিঃসীম মুহূর্ত সমষ্টির ছন্দোময় ছক···
ইতিহাস হচ্ছে এই মুহূর্ত এবং ইংল্যাণ্ড।

মেড আর ল্যাণ্ডলেডিরা আমাকে ইতিহাসের নিঃসীম মুহূর্তগুলির বাণী শিখিয়েছেন, আর মায়েরা এবং পিসীরা শিখিয়েছেন সেই ইতিহাসে ইংল্যাণ্ডের কী স্থান তাই।

আমার অল্পবয়সী কলেজের বন্ধুদের সম্বন্ধে একটা গল্প বলি। তাহলে বুঝতে পারবেন তারা আমাকে কিভাবে শিখিয়েছে। পৌঁছবার কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কয়েকজন ছেলে আমাকে তাদের ঘরে ডেকে চা খাওয়ায়, অন্য ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। সপ্তাহ তিনেক পরে আমার মনে হলো আমারও উচিত যারা আমাকে চা খাইয়েছে তাদের চায়ে ডাকা। উলওয়ার্থ থেকে তখন সব থেকে সস্তা দামের কাপ প্লেট, কাঁটা, চামচ কিনেছি। প্যাডি আমাকে আর্ল গ্রে মার্কা ভাল চা কিনতে শিখিয়েছে, সুতরাং চা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলুম। মনের আনন্দে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই চায়ে নিমন্ত্রণ করছি, এমন কি আমার ডায়ারিতে ভাল করে তাদের নামের তালিকাও করিনি। চায়ের জন্যে সবচেয়ে ভাল খাদ্য আমার মতে তখন সুইস রোল, যা পরে বুঝলুম দেবার মতো খাদ্য কিছু নয়। আমার স্কাউট হিগ্‌স্ চায়ের জিনিসপত্র বড় টেবিলে সাজিয়ে দিল। আমার খেয়ালই ছিল না আমি চোদ্দ জন ছেলেকে নিমন্ত্রণ করেছি। ঘরে ঢুকে ব্যাপারটা নিমেষে বুঝে নিয়ে প্যাডি, ডেভিড আর টম কেবল নিজেদের ঘরে যায় আর নীরবে তাদেব ঘর থেকে আস্তে আস্তে কিছু কিছু কাঁটা চামচ, চায়ের কাপ, প্লেট, ছোট কেক, বিস্কুট নিয়ে আসে, যেন আমারই জিনিস তাদের ঘরে ছিল। অতিথিদের মধ্যে কারোরই বয়স কুড়ির বেশী ছিল না। কিন্তু সকলেই এমন সভ্য এবং এমন গল্পগুজবে মত্ত থাকার ভান করলে যেন কিছুই দেখেনি কী হচ্ছে, কথা বলতেই ব্যস্ত, চায়ের জন্যে তাড়া নেই। অথচ এটি জানা কথা যে ইংল্যাণ্ডে চা-পর্ব হচ্ছে প্রধান, চায়ের সময়ে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। অবশেষে চায়ের সব সরঞ্জাম তৈরি হ'ল। ভেবে দেখুন এই রকম ঘটনা হিন্দু হস্টেলে হলে কি হতো! প্রথমত কেউ কিভাবে ঐ অবস্থায় সাহায্য করতে হয় তা বাড়ি থেকে শিখে আসে না, কিভাবে চা আর খাবার পরিবেশন করতে হয় তাও ভালভাবে জানে না। দ্বিতীয়ত, আমরা অনেকেই গৃহকর্তা বা কর্ত্রীকে সাহায্য করার পরিবর্তে হাত গুটিয়ে মজা দেখতে ও টীকাটিপ্পনী কাটতে মশগুল থাকতুম।

ডিসেম্বরের শেষে আস্তে আস্তে অনেক কিছু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলুম। কথা বলার ধরন ও টান টোনও বোধ হয় বদলে গেল। মেলামেশার মধ্যে স্বভাবগত আড়ষ্টতা অনেক কমে গেল, কথার অ্যাক্‌সেণ্টও বদলে গেল। খুকি আর জামাই-বাবু তখন এডিনবরায় ছিলেন। তাঁদের প্রথম সন্তান গৌরী তার আগে কার্ডিফ শহরে জন্মায়। বড়দিনের কয়েকদিন এলিথ গার্ড্‌নে্‌সে কাটিয়ে আমি তখনকার দিনে বিখ্যাত ফ্লাইং স্কট্‌স্‌ম্যান ট্রেনে এডিনবরা গেলুম। ১৯৩৬ সালে খুকির সঙ্গে বিয়ে হওয়া থেকে আমি জামাইবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করে এসেছি। কলকাতায়

থাকতে চিত্তরঞ্জন এভেনিউএর উপর ভারত ভবনের সাততলায় ওঁর একটি ফ্ল্যাট ছিল। আদি বাড়ি ছিল ২০নং ডাফ স্ট্রীটে। প্রতি শনিবার বেলা সাড়ে বারোটায় বাড়ি ফিরে উনি ছোটদিকে নিয়ে হয় ফারপো, না হয় পেলিটি, না হয় গ্রেট ইস্টার্নে লাঞ্চ খেতে যেতেন। লাঞ্চের পর দুজনে মিলে একটি ফিল্ম দেখতে যেতেন। বেশ শৌখিন লোক ছিলেন। ট্রপিক্যাল রোগের অতি প্রসিদ্ধ গবেষক নেপিয়ার এবং চোপড়ার উনি প্রিয় শিষ্য ছিলেন, এবং নিজেকে চিকিৎসার থেকে গবেষণাতেই সারাজীবন নিয়োগ করেন, যদিও চিকিৎসক হিসাবে তিনি অত্যন্ত ভাল ছিলেন, এবং আমার বিচারে ছিলেন ধন্বন্তরী। জামাইবাবু তখন এডিনবরায় এম-আর-সি-পি ডিগ্রির জন্তে পড়ছেন। ওঁদের কাছে থেকে ঘুরে ঘুরে এডিনবরা দেখলুম। বিখ্যাত প্রিন্সেস স্ট্রীট, কতকটা চৌরঙ্গীর মতো: রাস্তার একদিকে শুধু বড় বড় বাড়ি, অন্য দিকটায় ছিল কাস্‌ল্‌ আর খালি মাঠ, বাগান ইত্যাদি। জামাইবাবু আমাকে একদিন বিশ্ববিখ্যাত ডোনাল্ডসন্ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। বেশ অন্ধকার ওয়ার্ড, উঁচু-উঁচু ছাত। তখন এডিনবরা, গ্লাসগো প্রভৃতি শহরে হাওয়ায় এত ধোঁয়া কালি থাকত বলার নয়, এখনকার কলকাতা কোথায় লাগে, তবে ডিজেলের ধোঁয়া ছিল না, অধিকাংশই কয়লার। আমার দুটি সহপাঠী তাদের বাড়িতে আমাকে নেমন্তন্ন করে। একজন গ্লাসগোর ছাত্র, অন্যজন পীব্‌ল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের। গ্লাসগোর ধোঁয়া কালি এডিনবরার দু তিন গুণ বেশী ছিল। সেখানে আমার সহশিক্ষানবিশ ম্যাকনিকলের বাড়িতে স্কটিশ 'হাই টি' কাকে বলে তার নমুনা পেলুম। প্যাডির মা কেক ইত্যাদি ভালই করতে পারতেন, কিন্তু ম্যাকনিকলের বাড়ির 'স্কোন' আর 'ক্রাম্পেটে'র দেখলুম তুলনা হয় না। জ্যাম আর মার্মালেডের ত কথাই নেই। ম্যাকনিকলের মা আমাকে তাঁর রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালেন 'ক্রাম্পেট'গুলি কিরকম তাওয়া বা চাটুর মতো চ্যাপটা লোহার পাতে তৈরি হয় আর 'স্কোন'গুলি ইড্‌লির মতো ছাঁচে।

কলকাতায় মানুষ হয়ে, আসল শীতকাল বলতে বুঝতুম ডিসেম্বরের শেষ দুই আর জানুয়ারির প্রথম দুই দিন। জানুয়ারি মাসে অক্সফোর্ডে যখন হিলারি টার্ম শুরু হল তখন আমার আশা হল হয়ত শীতঋতু শেষ হতে চলেছে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডেই আমি প্রথম বুঝলুম টমাস মান তাঁর 'ম্যাজিক মাউণ্টেন' বইতে কেন লিখেছেন আসল শীত ঋতু শুরু হয় জানুয়ারিতে আর চলে মার্চ গড়িয়ে এপ্রিল পর্যন্ত। ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে থার্মোমিটার শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইটে দিনের পর দিন স্থির হয়ে রইল। দিনের পর দিন চলল বরফ আর তুষারের ঝড়। জলের কল সব জমে গেল। স্নান করার কোন প্রশ্নই রইল না। দুপুরে তিনটের সময়ে ঘন

অন্ধকার নেমে আসত। দেশের জন্যে এত মন কেমন করত, আর সারা শরীর মন অকারণ বিষাদে ভরে যেত, বলার নয়। আমার খুব বড় চোঙাওলা ই-এম-জি গ্রামোফোনে টেলেমানের অত্যন্ত আনন্দের কন্‌চের্টো শুনেও মন হাল্‌কা হতো না।

বরফে পা পিছলে হাত পা ভাঙার ভয় হতো। আড়াই শিলিং দিয়ে লোহার খুরো লাগানো একটি ছোট কাঠের লাঠি কিনলুম। বরফ তবু সয়, কিন্তু বরফ গলে যখন বরফের কাদা হয়ে গেল তখন আরো বীভৎস ব্যাপার, নাকালের চূড়ান্ত। মোটা ডল্‌সিস জুতোজোড়ায় খুব কাজ হল। ম্যাসফিল্ড জুতো সুদ্ধ পা ঢোকানোর জন্যে আমি আরেক জোড়া বড় বুট কিনলুম। তবে শীতে আমার শরীর খুব ভাল থাকত, স্বাস্থ্যও ফিরে গেল। জানুয়ারি মাসে মাখন, বেকন, এবং চিনি রেশন হল। আশ্চর্য, এই রেশনপ্রথা প্রচলনের ফলে ইংল্যাণ্ডের দরিদ্রতম পরিবারও জীবনে প্রথম শরীরের প্রয়োজনমত মাখন, বেকন, চিনি এবং পরে ডিম খেতে পেল, ফলে সারা বৃটেনের স্বাস্থ্যের উন্নতি হল, শিশুমৃত্যুর হার কমে গেল। এতেই বোঝা গেল বৃটেনের মতো তখনকালের ধনীদেশেও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের বিতরণে ও গ্রহণে কত বৈষম্য ছিল, সে-বৈষম্য মূলত উপার্জনবৈষম্য প্রসূত। ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে। এপ্রিল মাসে জার্মানি নরওয়ে ও ডেনমার্ক দখল করে। বৃটিশ নৌবাহিনী ট্রন্‌ঢাইম বন্দর দখল করতে অপারগ হয়। মে মাসের শুরুতে, নেভিল চেম্বারলেন প্রধানমন্ত্রীপদ ত্যাগ করেন। উইন্‌স্টন চার্চিল ১৩ই মে প্রধানমন্ত্রী হলেন, তাঁর বিখ্যাত 'রক্ত আর আত্মত্যাগ' বক্তৃতা দিলেন। ক্লেমেণ্ট অ্যাটলি হলেন লর্ড প্রিভি সীল। মে মাসে জার্মানি হল্যাণ্ড, লুক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম আক্রমণ করে, ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইন ভেদ করে এমিয়ঁ ও আরাস দখল করে। কিন্তু এসব ঘোর বিপদের কথা পরে হবে ; এখন বছরের প্রথম কয়েকমাস অক্সফোর্ডে কী রকম মজায় কেটেছিল তাই একটু বলি।

মার্চের শেষে ভয়ঙ্কর শীত চলে গিয়ে এল ঝলমলে নবীন বসন্ত। মার্চের বাতাসে সৌন্দর্য আর সৌরভ যেন ঝরে ঝরে পড়ল। অক্সফোর্ডের দুটি নদী চারওয়েল আর আইসিস লগি দিয়ে ঠেলা চ্যাপ্টা পাণ্ট-নৌকোয় ভরে গেল। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মহাফুর্তিতে নৌকোয় বেড়াতে লাগল। চারওয়েল আর আইসিসের মধ্যেকার জমিকে বলে মেসোপটেমিয়া, সেটি মডলেন কলেজের পিছনে। মনে হত যেন নন্দনকানন, ফুলেভর্তি জমি, তার চারপাশে ছেলেমেয়েরা নানারঙের পোশাক পরে, গান গেয়ে নৌকো করে ঘুরছে। তাদের ওঠাপড়া চুল-ভর্তি মাথাগুলি দেখে, ফোয়ারার মতো হাসি শুনে, মনে হতো ঠিক যেন অনেকগুলি

ছোট ছেলেমেয়ে গলায় ঘণ্টা দুলিয়ে ফুটন্ত ক্রোকাস আর ডেজির মধ্যে ছুটছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলেজে পড়া অল্পবয়স্ক ইংরেজ মেয়েদের হাসিতে বেলোয়াড়ি কাঁচের ঠোকাঠুকির মতো যে আওয়াজ বের হতো, আমার কানে অত্যন্ত ভাল লাগত, বিশেষত সেই সঙ্গে যদি হাসিভরা মাথা পিছনদিকে হেলিয়ে হাসত, তাদের সুঠাম বঙ্কিম গলা দেখা যেত। মেসোপটেমিয়ায় ছেলেমেয়েরা স্নানও করত। স্নানের কথা বলতে গিয়ে একটি গল্প মনে পড়ে গেল, জানিনা কতটা সত্যি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ছিলেন নিউডিস্ট, তবে তিনি যেরকম হাড় বের করা রোগা ছিলেন তাতে তাঁর ছেলেমেয়েদের চোখের আর সৌন্দর্যবোধের উপর কতখানি অত্যাচার হতো তাই ভাবি। সে যাই হোক। তিনি একদিন দার্শনিক অ্যালফ্রেড হোয়াইটহেডের সঙ্গে নগ্নবেশে মেসোপটেমিয়ার একটি নির্জন কোণে স্নান করছেন, এমন সময়ে এক নৌকোভর্তি যুবকযুবতী হৈ হৈ করতে করতে জলের বাঁকে একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ল। তখন তাঁরা দুজনে স্নানের পর আরামে গা পুঁছছেন। থতমত খেয়ে হোয়াইটহেড তোয়ালেটি কোমরে জড়ালেন। সমান ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাসেল তাঁর তোয়ালে দিয়ে গলা অবধি সারা মাথা ঢাকলেন। সেই সঙ্গে দুজনে নৌকোর দিকে পিছন করে দাঁড়ালেন। নৌকো চলে গেলে রাসেলকে হোয়াইটহেড বললেন : মাথা ঢাকতে গেলে কিসের জন্যে ? রাসেল বললেন, তার কারণ লোকে তাঁর তলদেশের চেয়ে তাঁর মুখ আর মাথাই বেশী চেনে বলে।

প্যাডি, ডেভিড আর আমি প্রায়ই সাইকেল করে অনেক দূর দূর যেতুম। ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর 'স্কলার জিপ্সী' কবিতায় অক্সফোর্ড আর আশেপাশের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতুম। অক্সফোর্ড শহর একটি উপত্যকার জমিতে গড়া, চারপাশের পাহাড় বা উঁচু জায়গা থেকে তার কলেজ ও গীর্জার চূড়াগুলি, উপরন্তু গীর্জার ঘণ্টাগুলি শুনতে অলৌকিক স্বপ্নের মতো লাগত। মাঝে মাঝে আমরা ট্রাউট ইনে গিয়ে ট্রাউট মাছ খেতুম। প্যাডির একজন মেয়ে বন্ধু হল, নাম আইরিস, পরে লেখিকা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। প্যাডির মায়ের চেহারার সঙ্গে তার সাদৃশ্য ছিল, দূর থেকে দেখলে মনে হতো প্যাডির মা (প্যাডির মা খুব হাল্কা পায়ে হাঁটতেন)। ছেলেবেলায় অনেকে হয়ত এই সাদৃশ্যের পিছনে ছোটে, বড় হলে তবে অন্যধরনের দেহ ও গড়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উপরন্তু আইরিস ছিল আইরিশ। প্যাডি যখন তখন উচ্ছ্বাসভরে আপন মনে বলে উঠত, 'মা আইরিস', ফ্রেঞ্চে 'আমার আইরিস'। আমার কিন্তু আইরিসকে একটু উচ্ কপালে আর আত্মাভিমানী বলে মনে হতো। মজবুত জুতো পরত, ততোধিক ভারিক্কি চালে চলত, ভাবখানা প্রেম ফ্রেম বাজে, মানবসমাজের জন্যে প্রাণোৎসর্গই

হচ্ছে আসল কাজ। বেচারী আইরিস বালক! সে-সময়ে আইরিস কম্যুনিস্ট মতবাদী ছিল, ফলে প্যাডি হয়ে গেল প্যাসিফিস্ট (তখনও জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করেনি)। প্যাডির ভাই মাইকেল তখন ফৌজে ঢুকেছে সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট হয়ে। সেই পোশাকে মাইকেলকে দুর্দান্ত দেখাত। আইরিসের সম্বন্ধে তার বর্ণনা ছিল, হোলি টেরর, অর্থাৎ দেখলে ছেলেরা ভয়ে ঘামতে শুরু করবে। মাইকেলের সঙ্গে একা যখন কথা বলতুম তখন তার সঙ্গে আইরিস সম্বন্ধে আমার একমত হতো। তবে প্যাডির সমুখে ডেভিড আর আমার গ্রীক কোরাস হওয়া ছাড়া আর কিছু সম্ভব ছিল না।

আস্তে আস্তে যখন দিন বেশ লম্বা হল, রাত্রি ৯টা বা তার পরেও দিনের আলো থাকত তখন দু একটি কলেজের মুক্তাঙ্গনে নাটক অভিনয় হতো। শেল্‌ডোনিয়ান থিয়েটারে মাঝে মাঝে চেম্বার কনসার্ট হতো। ফেব্রুয়ারির শেষে, অথবা ইস্টারের ছুটিতে আমার ঠিক মনে নেই, আমরা লণ্ডনে গেলুম টমাস বীচামের পরিচালনায় সিবেলিয়ুসের ট্যাপিওলা, কারেলিয়া ওভারটুর ও স্যুইট এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডিয়া শুনতে। তার ঠিক আগেই জার্মানি তখন দ্রুতবেগে ইওরোপ গ্রাস করতে শুরু করেছে। রাশিয়া ঠিক তার আগে ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ ও জয় করে।

বসন্ত গিয়ে যখন গ্রীষ্ম এল তখন চারদিকে আরো বেশী করে প্রকৃতির সৌন্দর্য খুলল। সঙ্গে সঙ্গে যখন একের পর এক ভয়ঙ্কর পরাজয়ের খবর আসতে শুরু হল, তখন সেই সৌন্দর্য আরো যেন ট্রাজেডির মতো মনপ্রাণ বিঁধতে লাগল। ১৩ই মে হল্যাণ্ড যখন আত্মসমর্পণ করে, সেদিন চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হলেন, এবং তাঁর বিখ্যাত 'রক্ত আর আত্মত্যাগ' বক্তৃতা দিলেন। তারপর সব কিছু যেন ঝড়ের বেগে ঘটতে লাগল। ৩০শে মে দুপুরবেলা হাই স্ট্রীটে কী কাজে বেরিয়ে দেখি সমস্ত কিছু যেন দম বন্ধ করে আছে। সকলের মুখে ভীষণ উদ্বেগের ছাপ। ডেভিড আর প্যাট্রিক ডানকার্ক বল্‌তে বল্‌তে এল। তার আগে জার্মানি বৃটিশ ও ফ্রেঞ্চ সৈন্যদের ডানকার্কের তীর অবধি ঠেলে নিয়ে গেছে। ২৯শে মে থেকে তাদের ত্রাণকার্য শুরু হয়েছে। যেখানে যতরকম ছোটবড় নৌকো ও নৌযান আছে সব যথাসম্ভব জড়ো করে ডানকার্কে পাঠানো শুরু হয়েছে।

এর পরের কয়েকদিন সকলে যেন শ্বাসবন্ধ করে রইল, কী হয় তার আশঙ্কায়। অবশেষে ৪ঠা জুন খবর এল ত্রাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে। যুদ্ধের সমস্ত সাজসরঞ্জাম যদিও নষ্ট হয়েছে, কিন্তু সকলের প্রাণরক্ষা হয়েছে। অক্সফোর্ডের সব গীর্জায় এঞ্জেলাস বাজল। ডানকার্কের বিপদে আমি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে একাত্মবোধ

করলুম। তার আগে একের পর এক জার্মান সাফল্যে আমার অনেক সময়ে বিপরীতভাব আসত। নিজের জন্যে আমার ভয় হল তা নয়, এমন কি ডানকার্কের পরেও নয়। কোনদিন ত যুদ্ধ দেখিনি, সুতরাং যুদ্ধের ভয় আমার ঠিক ছিল না। উপরন্তু ডানকার্কের আগে পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে কোন সাজ সাজ ভাব দেখিনি, সবই যেন নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। আমার ভয় হল আমার বন্ধুদের জন্যে, তাদের মা পিসীদের জন্যে। ১৪ই জুন প্যারিসের পতন হল। ইলিয়া এরেনবুর্গের বইতে তার রোমাঞ্চকর বিবরণ পাওয়া যায়। রাশিয়া ত্বরিত গতিতে বল্টিক সমুদ্রের পাড়ে ল্যাটভিয়া, লিথুয়েনিয়া ও এস্টোনিয়া দখল করে নিল।

গ্রীষ্মের ছুটির আগের রাত্রে দোতলায় প্যাট্রিকের ঘরে খুব মদ্যপান হল। ভোর চারটে পর্যন্ত নানা ধরনের মদ্যপান করে সকলের অবস্থা কাহিল। মাতালদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান থাকে। আমরা সকলে সিঁড়িতে বসে পশ্চাৎদেশ ঘষটাতে ঘষটাতে নিচে নামলুম। সেইদিন বিকেলে যে যার বাড়ি চলে গেলুম।

লণ্ডনে ফিরে অজয়, সঞ্জয়, শান্তি গুজার আর ওয়াগ্রের সঙ্গে খুব আনন্দে কাটল। ওয়াগ্রের সঙ্গে পরে আর দেখা হয়নি। সঞ্জয় ফিরে এসে পরে ইণ্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানির বড় কাজ পায়, এখন যোধপুর পার্কে বাড়ির কাছেই থাকে।

গ্রীষ্মের মাসগুলি হল আশ্চর্য। হ্যাম্পস্টেড হীথে সকালে বেড়াতে গিয়ে দেখতুম ঝকমকে নীল আকাশে জার্মান এরোপ্লেন রোখার উদ্দেশ্যে বহু উঁচুতে গ্যাসভরা বড় বড় রূপোলি রঙের ব্যারাজ বেলুন উড়ছে। আকাশ গভীর নীল, পার্কগুলি, মাঠগুলি পান্নার মতো টলটলে সবুজ, যে সবুজ শুধু ইংল্যাণ্ডের ভিজে আবহাওয়াতেই সম্ভব। সারা জুলাই মাস ধরে ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র জার্মান বিমানের জোর হানা চলল। হানার বহর কত সাংঘাতিক ছিল বোঝা গেল যখন মাত্র এক রাত্রে একশ'র বেশী জার্মান বোমারু বিমান বৃটেনের উপর ধ্বংস হয়। স্বাধীন ফরাসী সরকারের পক্ষে শার্ল দি গ্যালের সঙ্গে বৃটেন ৭ই অগাস্ট চুক্তি স্বাক্ষর করে। তার পূর্বে, ৫ই জুলাই বৃটেনের সঙ্গে ভিশি সরকার সম্পর্ক ছেদ করে।

আমার বিশেষ সৌভাগ্য, জুলাই মাসের কয়েকদিন আমি মার্লবরোতে প্যাট্রিকের বাড়িতে ছিলুম। প্যাট্রিকের সঙ্গে সাইকেল নিয়ে উইলট্শিয়ার ও গ্লস্টারশিয়ারে ঘুরে বেড়ালুম। জীবিতকালে প্যাট্রিকের বাবা ছিলেন মার্লবরো পাব্লিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক (উচ্চারণ ছিল মব্রা)। বাড়ি করেছিলেন বড় আর খুব আরামের। বসার ঘরে কাঁচের ছাত ছিল, যাকে অ্যাট্রিয়াম বলে। প্রতি ঘরে

রুচি আর সংস্কৃতির ছাপ ছিল। প্যাট্রিক বাড়ির কনিষ্ঠ সন্তান, বোন ছিল না। বড় ভাই জন ছিল ফরেন সার্ভিসে। মাইকেল ছিল মেজ ছেলে। মিসেস ও'রিগান ছিলেন লম্বায় পাঁচ ফুট, হয়ত বা তারও কম। সাহস, ধৈর্য এবং আত্মনিবেদনের-পরাকাষ্ঠা বললেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েকবছর হল মারা গেছেন, কিন্তু এখনও তিনি আমার কাছে বৃটিশ ও রাজপুত মাতৃত্ব ও নারীত্বের প্রতীক ; দেশের রক্ষার্থে, হৃদয়কে পাথর করে ছেলেদের হাসিমুখে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। লণ্ডনের রেলওয়ে স্টেশন থেকে যখন সৈন্য বোঝাই করে ট্রেন ছাড়ত, তখন প্রত্যেক মায়ের ও ছেলের মুখে হাসির সঙ্গে খুশি গলায় গ্রেসী ফিল্ড্‌সের গান শোনা যেত :

উইশ মি গুড লাক হোয়েন আই গো
নট এ টিয়ার বাট এ স্মাইল, চিয়ারিও, হিয়ার আই গো।

'যাবার ক্ষণে আমার মঙ্গল কামনা কর, চোখের জলে নয়, মুখে হাসি নিয়ে, আচ্ছা চলি, ফের দেখা হবে।'

মিসেস ও'রিগানের সঙ্গে প্যাট্রিক আর আমি সাইকেল নিয়ে উইল্‌টন, সল্‌স্‌বেরি কেথিড্রাল, ঘুরে স্টোনহেঞ্জে পিকনিক করার কথা এখনও কালকের ঘটনার মতো মনে আছে। মনে আছে মিসেস ও'রিগান আমাকে ভাল করে স্টোনহেঞ্জের গঠন বোঝালেন। মার্লবরো বা মব্রা থেকে সাইকেল নিয়ে প্যাডি আর আমি আবার গেলুম স্ট্রাউড, গ্লস্টার, চেল্‌টনহ্যাম, টিউক্সবেরি, ঈভস্হাম, অবশেষে স্ট্র্যাটফোর্ডে। সেখানে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক দেখে গেলুম ব্যানবেরি, উডস্টক হয়ে অক্সফোর্ডে।

আগস্টের শুরুতে প্যাট্রিক পল্টনে যোগ দেবার আগে দুজনে সোহোতে লাঞ্চ খেলুম। ১১-১৮ অগাস্টের সপ্তাহে 'বৃটেনের যুদ্ধ' তুঙ্গে ওঠে : ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষিপ্রগতি মেসারশ্মিটের বড় বড় ঢেউ আগে আগে চলে, পিছনে পিছনে গুরুগুরু শব্দে আসে হাইঙ্কেল বোমারু বিমান হুড় হুড় করে বোমা ফেলতে ফেলতে। এই সব হানা মনে রেখেই নিশ্চয় টি-এস এলিয়ট তাঁর লিটল্ গিডিং কবিতায় লেখেন :

ভোরের আগে অনিশ্চিত প্রহরে
অনন্ত রাত্রির শেষ প্রান্তে
কালো ডাহুক, জিভে তার আগুনের ফুলকি,
দিকচক্রবালের নিচে যে বাসা থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে
যাবার আগে

কিংবা এই অংশটি :

ডাহুক হাওয়া ভেদ করে নামে
ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত শিখা ছড়িয়ে
জিহ্বাগ্রে তার বাণী
পাপ ও ভ্রমের থেকে মুক্তি

প্রথম 'লণ্ডন ব্লিৎজ' শুরু হয় ২৩শে অগাস্ট ১৯৪০। সেদিন দুপুরে আমরা আই-সি-এস কভেনান্ট সই করি। ব্লিৎজের প্রথম রাত্রি আমার এত ভয়ঙ্কর লেগেছিল যে পরের দিন হোবোর্ন পাতালরেল স্টেশনে সন্ধ্যা হতে না হতেই আশ্রয়ের জন্যে ঢুকে পড়ি। হোবোর্ন পাতালরেল স্টেশন ছিল ভূগর্ভে লণ্ডনের গভীরতম স্টেশনগুলির একটি। ব্লিৎজের সময়ে আশ্রয়প্রার্থীরা আপাদমস্তক কম্বলমুড়ি দিয়ে জড়াজড়ি করে প্ল্যাটফর্মের উপর শুয়ে থাকার অনেক ছবি বিখ্যাত ভাস্কর হেনরি মূর কালি ও পেন্সিলে এঁকেছিলেন। সে সময়ে সারা বৃটেনময় 'অধিক খাদ্য উৎপাদন করা'র উপর সরকার খুব জোর দেন। এ বিষয়ে নানারকম পোস্টার ছাপা হয়। হোবোর্ন স্টেশনের দেয়ালের একটি পোস্টার আমার এখনও মনে আছে, রাতে ঢুলতে ঢুলতে বসে দেখেছিলুম। উপরে নীল আকাশ, নিচে ধু ধু করছে নীল সমুদ্র, দূরে দিকৃচক্রবালে একটি জাহাজ ডুবছে, মাস্তলটি শুধু দেখা যাচ্ছে। একটি মাত্র লোক, রবিসনক্রুসোর মতো, জনমানবহীন ছোট্ট একটি দ্বীপে সাঁতরে উঠেছে। সব কিছুর আশা খুইয়ে তার মুখ থেকে কথা ফুটল : 'আহা, এখন নতুন আলু ওঠার সময়, বাড়িতে নিশ্চয় লোকে নতুন আলু খাচ্ছে!'

দু'দিন হোবোর্নে রাত কাটানোর পর কেমন যেন লজ্জা করল। তৃতীয় রাত্রি গাওয়ার স্ট্রীটের ভারতীয় হস্টেলে গেলুম। সেদিন রাত্রে চারদিকে এমন বোমা পড়ল যে ভয় পেয়ে পরের দিন আবার হোবোর্নে গেলুম। ঠিক সেই রাতেই গাওয়ার স্ট্রীট হস্টেলের উপর সরাসরি বোমা পড়ে বাড়িটির কোন চিহ্ন রইল না। আগের রাতে আমার সঙ্গে সেন বলে একটি ছেলে বসার ঘরে শুয়েছিল, মারা গেল। একেই ইংরেজরা বলত, বোমার গায়ে তোমার নম্বর থাকলে আর রক্ষা নেই। এরকম খরগোশের মতো ত্রাসভরে পালিয়ে বেড়াতে আর ভাল লাগল না। সেদিন থেকে বোমার আগুন আর বাড়ি চাপা পড়া লোক উদ্ধারের দলে নাম লেখালুম। এই কাজে লেগে ভয় অনেকটা কমে গেল। বাড়ির ধ্বংসাবশেষের তলা থেকে মৃত বা জীবন্ত মানুষকে উদ্ধার কাজে লাগলে নিজের সম্বন্ধে ভয় কমে যায়। কতরকম যে অবাক কাণ্ড হতো বলার নয়। যেখানে বোমা পড়েছে, সেখানে হয়ত বাড়িটি ধ্বংস হয়েছে, আর কিছু হয়নি, অথচ তার জের হিসাবে দুতিনটি

রাস্তা পেরিয়ে একটি রাস্তার একদিকে কাঁচ সব চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল। নিচের সিঁড়ির তলায় বা মাটির নিচের তলায় যারা রাত্রি কাটাত তাদের অনেকেই বেঁচে যেত। জীবন্ত মানুষের উদ্ধার কাজে লেগে বুঝতে পারলুম, বৃটিশরা বিপদের সময়ে কত শান্ত, মাথা ঠাণ্ডা করে ধৈর্য ও অধ্যবসায় দেখিয়ে, পরাজয় না মেনে, উপর থেকে যে আদেশ আসে তা বিনা তর্কে বা প্রতিবাদে নিখুঁতভাবে মেনে নিজেদের বীরত্ব দেখায়। বিশেষত শিশু, বালকবালিকা বা নারী যেখানে বিপন্ন সেখান থেকে কিছুতেই পালাবে না, বা নিজের কথা আগে ভাববে না। ১৯৭৯ সালে, প্যাট্রিকের বিধবা স্ত্রী (তাঁর গায়েও আইরিশ রক্ত আছে) একদিন অন্য কথার সূত্রে যখন বললেন, ইংরেজ জাত দ্বিরুক্তি না করে উপরওলার কথার উপর কত বিশ্বাস করে, এবং কতখানি অনুশাসন মেনে চলে, তখন আমি ১৯৪০ সালের ব্লিৎজের কথা স্মরণ করে বুঝলুম, উনি ঠিক কী বলতে চান, এবং তাঁর কথা কত ঠিক। প্রতি রাত্রে সারা রাত ধরে বোমা পড়া বন্ধ হলো ১৫ই সেপ্টেম্বর। এই শেষ দিন রাত্রে জার্মানদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। এক লণ্ডনের আকাশেই একশ'টির বেশী হাইস্কেল বোমারু বিমান ধ্বংস হয়। লণ্ডন ব্লিৎজ কিছুদিনের জন্যে থামা পড়ে। দ্বিতীয় ব্লিৎজ শুরু হয় ১৩ই অক্টোবর, চলে ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত : তখন আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ অফ গুড হোপের (উত্তমাশা অন্তরীপ) মোড় ঘুরে, ভারত মহাসাগরে পড়ার মুখে।

লণ্ডন থেকে ট্রেনে উঠে লিভারপুল গিয়ে আমরা সিটি এণ্ড হল লাইনের সিটি অভ হংকং জাহাজে উঠলুম। সিটি এণ্ড হল লাইনের জাহাজগুলি মোটামুটি ১৪,০০০ টনের ছিল। ইতিমধ্যে পি এণ্ড ও কোম্পানির ২২,০০০ বা তদূর্ধ্ব টনেজের স্ট্র্যাথ সিরিজের জাহাজগুলি সেনা পাঠাবার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। সব বাহুল্য বর্জন করে মাত্র একটি অষ্টিয়ারিটি ক্লাসে সব জাহাজকে পরিণত করা হয়। পি এণ্ড ও কোম্পানির ফার্স্ট ক্লাসে জীবনে আর চড়া হল না।

প্রতিটি জাহাজের বাইরের খোলটি খুব ভাল করে ক্যামুফ্লাজ করা হয়েছিল, যাতে সমুদ্রের জলের রঙের সঙ্গে মিশিয়ে যায়। এই রকম রঙকরা অনেকগুলি জাহাজ একের পর এক সার দিয়ে লাইন করানো হল। প্রতিটি জাহাজের পোর্টহোল সম্পূর্ণভাবে কালো রঙ করা হলো। জাহাজের ভিতর প্রতিটি আলোতে অত্যন্ত টিমটিমে বালব্ লাগানো, প্রতিটি আলো ঘিরে ঘোর কালো ঢাকা, খুব সামান্য আলো যাতে সোজা নিচে মেঝে বা পাটাতনে পড়ে। ডেকে, জাহাজের ব্রিজে, পাটাতনে, নৌচালকদের এবং ক্যাপ্টেনের ঘরগুলিতে সব আলো ঐভাবে

ভাল করে ঢাকা। সুতরাং সারা সমুদ্রযাত্রাকালে সূর্যাস্তের পর কোন রকম কাজ বা খেলা সম্ভব হতো না, অন্ধকারে আস্তে আস্তে চলাফেরা বা গল্প করা ছাড়া। বলা বাহুল্য, খোলা ডেকে বা বাইরে থেকে দেখা যায়, কোনরকম আলো বা দেশলাই জ্বালা একেবারে নিষিদ্ধ. অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারত। ফলে অধিকাংশ যাত্রীরা রাতে খাবার পর যে যার কেবিনে ঢুকে পড়ত। শুধু ব্রিজখেলোয়াড়রা ছিল নিতান্ত অদম্য। লণ্ডনে যা খাবার পাওয়া যেত তার থেকে জাহাজে খাবার ছিল অনেক বেশী সুস্বাদু আর পর্যাপ্ত। তাছাড়া, তামাক, চুরুট, সিগারেট বা 'জল-চিকিৎসা'র কোন অভাব ছিল না। সে সব বিষয়ে আমরা ডাঙার চেয়ে জাহাজে অনেক ভাল অবস্থাতেই ছিলুম। তবে মহাসমুদ্রে দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে কনভয়ে চলার একঘেয়েমির ফলে আমরা যেন সময়ের খেই হারিয়ে ফেললুম। তারিখ, দিন গুলিয়ে যেত। বিশেষত, আমাদের জাহাজের অব্যবহিত আগে বা পরে কোন জাহাজে যখন উত্তেজনামূলক কিছু ঘটেনি। একঘেয়েমি বিশেষ করে বাড়ল যখন আমরা অ্যাটলান্টিক দিয়ে ট্রপিক অভ ক্যান্সার থেকে ট্রপিক অভ ক্যাপ্রিকর্ন পর্যন্ত পাড়ি দিলুম। এই সময়ে আমি কোলরিজের 'এন্‌শেণ্ট ম্যারিনার' কবিতার এই পংক্তিগুলির পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারলুম :

সূর্য আসলেন বাঁ দিক থেকে
উঠলেন সমুদ্র থেকে
উজ্জ্বল কিরণ ঢেলে ডান দিক বেয়ে
নেমে গেলেন সমুদ্রতলে

ফলে লিভারপুল থেকে বম্বে পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রা আমাদের অনন্তকালব্যাপী মনে হয়েছিল, যদিও আসলে আমরা মাত্র সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ দিন সমুদ্রে ছিলুম।

লিভারপুল ছেড়ে, জাহাজের কনভয় লাইন যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হয়. অর্থাৎ প্রায় দু দিন আমাদের জাহাজ, জাহাজের 'রাস্তায়' স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। লাইন যখন তৈরি হল, আর আমরা ডাইনে আয়ারল্যাণ্ড এবং বাঁয়ে ওয়েল্‌স্ রেখে চ্যানেল সেণ্ট জর্জ দিয়ে দ্রুতগতিতে, আমাদের বাঁয়ে বহুদূরে ল্যাণ্ডস্ এণ্ড ছেড়ে, অ্যাটলান্টিকে পড়লুম, তখনই একদিনমাত্র আমরা আমাদের কনভয়ের লাইনটি দিগন্তবিস্তৃত দেখতে পেলুম। সেদিন সমুদ্র অশান্ত, খুব ঢেউ উঠছে, জাহাজগুলি ফাঁক ফাঁক করে যতদূর দেখা যায় অস্পষ্ট পিঁপড়ের সারের মতো দেখাচ্ছে। একেকটি জাহাজ মনে হচ্ছে আল্‌পিনের মাথার মতো, ঢেউএর উপর উঠছে, নামছে। অক্টোবরে আমরা যেদিন বিষুবরেখা পার হচ্ছি সেদিন আমাদের ক্যাপ্টেন

বললেন, আমাদের কনভয়টি বাস্তবিকই খুব লম্বা, সব জাহাজই নিজেদের মধ্যে বেশ দূরত্ব রেখে চলেছে। এত বড় লম্বা যাত্রায় ক্যাপ্টেন মাত্র একদিনই ঐটুকু খবর দিয়েছিলেন, এবং জাহাজটি ঠিক কোথায় তার কথা নিজমুখে বললেন। ১৯৪০এর অগাস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে একদিকে ডাঙায় চলেছে একের পর এক ভয়ঙ্কর ব্লিৎজ, অন্যদিকে জার্মান সাবমেরিন বৃটিশ নৌবাহিনী, বাণিজ্যপণ্য এবং মানুষের প্রাণ বিস্তর ধ্বংস করেছে। পরে জানলুম এক সেপ্টেম্বর মাসেই যতগুলি বাণিজ্যপোত ডুবেছে তার মোট আয়তন হচ্ছে ১৬০,০০০ টন। আমাদের সমুদ্র-যাত্রার দশদিনের মধ্যে শুনলুম জার্মানরা এম্প্রেস অভ ক্যানাডা বলে একটি জাহাজ, যেটি স্কুলের ছেলেমেয়ে বোঝাই করে ক্যানাডা যাচ্ছিল, সেটি ডুবিয়েছে। মাঝে মাঝে আমাদের জাহাজ ঝুটো জাহাজডুবি তৎপরতার মহড়া দিত। তার সঙ্গে, জাহাজে সত্যিকারের ডোবার মতো হলে জাহাজের পাটাতনের উপর কী কী করতে হবে তার রিহার্সাল হতো। ফলে কিছুক্ষণের জন্যে উত্তেজনা আসত, তবে তার সঙ্গে বুক দুরু দুরু করত না তা নয়। কারণ এ ধরনের মহড়া হলেই বুঝতুম আমাদের কনভয়ের কোথাও নিশ্চয় একটি জাহাজ খোয়া গেছে। আমাদের মধ্যে আগের কয়েকজন, যাঁরা ঘনঘন সমুদ্রযাত্রা করেছেন, তাঁরা আমরা পৃথিবীর ঠিক কোনখানে আছি তার আন্দাজ করতেন। আমরা অ্যাটল্যান্টিক বেয়ে, এজোর্‌স্ দ্বীপপুঞ্জ বাঁয়ে রেখে, দক্ষিণে নামলুম। একদিন গুজব উঠল আমরা হয়ত ডাকার বন্দরে থামতে পারি। অ্যাসেন্‌শন্ বা সেণ্ট হেলেনা দ্বীপকে আমরা ডাইনে না বাঁয়ে রেখে পার হই, আমার ঠিক মনে নেই। শুধু মনে আছে কয়েকদিন অন্তর দূরে সমুদ্রের দিগ্‌বলয়ে ধোঁয়ার মতো দুটি ছোট্ট ছাপ দেখেছি।

কেপ অভ গুড হোপে আমরা নামতে পারিনি। পোর্ট এলিজাবেথেও নয়। অবশেষে একদিন ভোরে সমুখে দূরে আমাদের জাহাজের বাঁয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার তটরেখা দেখতে পেলুম। দু দিন আমরা তটরেখা বাঁয়ে রেখে চলে শেষকালে দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় এক বন্দরে জাহাজ লাগল। ১৯৪০ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত আমি ভারতবর্ষের বাইরে যাইনি। ১৯৫৬ সালে আবার দেশ ছেড়ে উড়োজাহাজে টোকিও যাই। টোকিওতে যেরকম উজ্জ্বল আলোর ছড়াছড়ি দেখি, ডারবানে ১৯৪০ সালে যা দেখি তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। মিশকালো রাত্রি দেখে দেখে এত অভ্যাস হয়ে গেছল যে এতদিন পরে বন্দরে আলোর বাহার দেখে আমি ত স্তম্ভিত। ডারবান বন্দরে তখনই অনেক বহুতল বাড়ি হয়েছে, তাছাড়া উঁচু উঁচু স্তম্ভে লাল নীল নিওন আলোয় স্প্রিংবক সিগারেটের বিজ্ঞাপনও অনেক উঠেছে। ফলে চারদিকের আলোয় ডারবান একেবারে ঝলমল, ঠিক যেন উজ্জ্বল আলোর

মালায় আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া একটি সজ্জিত জাহাজ। অক্টোবরের মাঝামাঝি ডারবানে তখন বসন্তকাল গড়িয়ে গ্রীষ্ম আসছে, সুতরাং সময়টা খুব ভাল।

কিন্তু আনন্দের ভাব কাটতে বেশী সময় লাগল না, জাহাজ থেকে ডাঙায় নামার শুধু অপেক্ষা। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে কোন ভারতীয় বাসিন্দা আসেনি। সুতরাং আমরা—মানে আমরা যে কয়জন ভারতীয় ও কালোচামড়া ছিলুম—একা একা নামার ব্যবস্থার কথা ভাবলুম। জাহাজে আমাদের বছরের ইওরোপীয়ান আই-সি-এসরা ততক্ষণে চুপচাপ হাওয়া। বেশ বুঝলুম বৃটিশ কনসালেট আগেভাগে জাহাজ আসার খবর পেয়ে তাদের নামিয়ে, থাকার ব্যবস্থা করেছে। প্রথম রাত্রেই আমরা তাই বিশ্রী ধাক্কা খেলুম। জেটিতে আর রাস্তায় কিছুদূর অন্তর অন্তর পুলিশ মোতায়েন ছিল, তাদের কাজই ছিল কালোদের হুকুমের সুরে বলা এদিকে যেয়ো না, ওদিকে যেয়ো না। কালোদের মধ্যে অবশ্য হিজ বৃটানিক ম্যাজেস্টির ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আমরাও পড়ি। আমরা যখন লণ্ডনের অনুকরণে লাল দোতলা বাসে উঠলুম, তখনও কণ্ডাক্টারের কড়া হুকুম, শুধু সে-সব বেঞ্চিতেই আমাদের অধিকার যাতে লেখা আছে 'শুধু নন-ইওরোপীয়ানদের জন্য'। অবশেষে আমাদের বাস একটি ভারতীয় পাড়ায় বাসের আড্ডায় থামল। আমরা নেমে দু একটি ভারতীয় দোকানে ঢুকলুম। দোকানগুলি সাজানো, ভাল ভাল জিনিসপত্রে ঠাসা, দেখলেই ঢুকতে ইচ্ছা করে। খোলা থাকে প্রায় রাত্রি বারোটা পর্যন্ত। এত সমৃদ্ধ দোকান লণ্ডনের রিজেন্ট স্ট্রীটেও কম দেখা যায়। ভারতীয় দোকানদাররা আমাদের জাহাজের পৌঁছনো খবর পাননি, সেজন্যে খুব মাপ চাইলেন, এবং পরের তিনদিন আমরা কী করব, তাঁরা আমাদের কিভাবে আপ্যায়িত করবেন, তার নানারকম জল্পনা কল্পনা করে সব কিছু ঠিক করলেন। ডারবানের কেন্দ্রস্থলটি লণ্ডনের পিকাডিলির চেয়েও সমৃদ্ধ মনে হল (অবশ্য যুদ্ধের কারণে আমি লণ্ডন বা পিকাডিলির পূর্ণ সমৃদ্ধি ও আলোর ঝলমলানি দেখিনি)। উপরন্তু ডারবানের অধিকাংশ বাড়ি লণ্ডনের বাড়ি থেকে অনেক উঁচু আর ঝকমকে মনে হল। ১৯৬৭ সালে আমি যখন প্রথম সিঙ্গাপুর যাই তার থেকেও যেন ঝকমকে আর বর্ধিষ্ণু। ভারতীয় পাড়াগুলিও বেশ সমৃদ্ধ। যে কয়টি ভারতীয় বাড়িতে গেছি তাদের আসবাবের প্রাচুর্য আর মহার্ঘ্যতা দেখে আমি অবাক হয়েছিলুম। তাছাড়া নানাবিধ চোখধাঁধানো দ্রব্যাদি ত ছিলই। কিন্তু এত বড়লোকীপনা সত্ত্বেও আমি এত যত্ন ও বন্ধুভাব খুব কম দেখেছি। সবসময়ে আমাদের কিসে ভাল লাগবে, সেই নিয়ে যেন তাদের চিন্তা।

ভারতীয় বাসিন্দাদের দয়ায় আমি আর মাসুদ তাঁদের জুলু খরিদার আর

নেটালের সহব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলুম। তাঁরাও যেমন সহৃদয়, তেমনি ভাল তাঁদের ব্যবহার আর আতিথ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় তৈরি মদ যেমন কড়া তেমনি বিশ্রী স্বাদ। দার্জিলিং বা ভুটানে গরমজলে কোদোর বীজ ফেলে যে পানীয় তৈরি হয়, ডারবানেও সে ধরনের টাটকা পানীয় হয়, সেটি বেশ ভাল। খেলে বেশ গল্পগুজব করতে ইচ্ছাও করে। ভাগ্যক্রমে দুটি জুলু গ্রামে গিয়ে জুলু চাষী আর কাঠুরিয়াদের সঙ্গে আলাপ হবার সুযোগ হলো। গ্রাম দুটিতে গিয়ে ধারণা পাকা হল, সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও হাবভাব সর্বত্র একই রকম। সর্বত্রই ভূমিপুত্ররা সমানভাবে নিষ্পেষিত। তফাৎ এই, যে নেটালে এই নিষ্পেষণের রূপ ভারতের থেকে অনেক বেশী ভয়ানক ও নির্দয়, এবং সাদাদের মুখে ঘৃণা এত স্পষ্ট ও অকপট যে আতঙ্ক হয়। কালোদের তারা মানুষের অযোগ্য পশু মনে করে, এ ভাব সাদাদের মুখে যেন স্পষ্ট লেখা আছে। ভারতে অবশ্য এরকম ঘৃণা মুখে ফুটিয়ে তুলতে ইংরেজরা কোন দিন সাহস পায়নি, অন্তত আমি যতদিন, অর্থাৎ ১৯৪০-৪৭ সাল পর্যন্ত, তাদের অধীনে কাজ করেছি। এই যুগে আমাদের দেশে ইংরেজমনে যত না ঘৃণা ছিল তার চেয়ে বোধহয় বেশী ছিল ভীতি আর কিছুটা আতঙ্ক. অবশ্য ঠোঁট চেপে সেই ভাব ঢাকার চেষ্টা করত। কিন্তু নেটালের সাদারা সে বিষয়ে দ্বিধাশূন্য, মুক্ত, উন্নতশির, নিজেদের প্রভুত্ব সম্বন্ধে অটুট আস্থা, বুটের তলায় কালোদের একমাত্র স্থান সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, এই ভাব। এসব চিন্তা আমার মনে আর চোখে যে কালো ছায়া ফেলে তার কৃপায় আমি ডারবানে না পেরেছি ভারতীয়দের সান্নিধ্যে ভাল করে আনন্দ করতে, না পেরেছি ডারবানের ঝলমলে আলোয় ও সৌন্দর্যে তৃপ্তি পেতে। শুধু ভাবতুম কখন আমাদের জাহাজ নোঙর তুলবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে বাঁয়ে আফ্রিকা আর ডাইনে ম্যাডাগাস্কার রেখে মোজাম্বিক প্রণালী দিয়ে আমাদের জাহাজ ভারতের দিকে পাড়ি দেয়, তার কারণ জাহাজ ছাড়ার কয়েকদিন পর থেকে আমরা মাঝে মাঝে ডাইনে, বাঁয়ে দুদিকের তটভূমি দেখেছি। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগ খুব প্রশান্ত, আরাব্যোপসাগরের মতো অস্থির নয়। সবুজনীল রঙের পুকুরের মতো স্থির জলে সর্বদা স্বচ্ছ জেলিফিশ, উড়ন্ত মাছ আর অজস্র ডল্‌ফিন। সূর্যাস্তের পর তারাভরা আশ্চর্য-কালো আকাশ, তার মাঝে বড় বড় কোহিনূর হীরে দিয়ে সাজানো, মহান সম্রাটের মতো, 'সাদার্ন ক্রস' নক্ষত্রপুঞ্জ বিরাজমান। তার তুলনায় আমাদের আকাশের কালপুরুষ ম্রিয়মাণ লাগে। যতক্ষণ না আবার বিষুবরেখা পার হলুম, ততক্ষণ পর্যন্ত সাদার্ন ক্রস যেন আমাদের অভয়বাণী দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। এর মধ্যে আমরা বারকয়েক

কোলরিজ-বর্ণিত অ্যাল্‌ব্যাট্রস পাখি দেখলুম, ধীর মন্থর গতিতে সম্পূর্ণ বিস্তারিত স্থির পাখায় ভর করে শূন্যে বিস্তীর্ণ চক্রাকারে জাহাজের চারদিকে ঘুরছে। ১৯৪০ সালের ৩১শে অক্টোবর আমরা বম্বের গেটওয়ে অভ ইণ্ডিয়ার ঘাটে নামলুম। শান্তি গুজার এসে আমাকে চৌপাটিতে তাদের রতনগর প্যালেস নামের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে দু'দিন থেকে তৃতীয় দিন অর্থাৎ ৩রা নভেম্বর কলকাতার ট্রেনে উঠলুম।

নির্দেশিকা